কিশোর আনন্দ | ৯

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

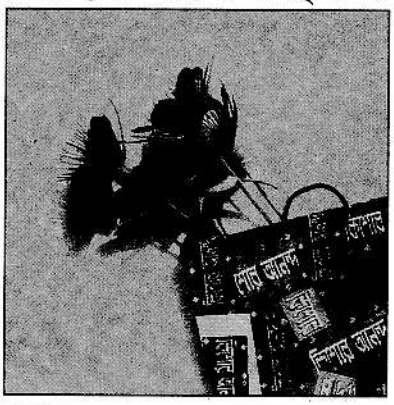

কিশোর আনন্দ | ৯

আলোকিত মানুষ চাই

কিশোর আনন্দ

সম্পাদনা ॥ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

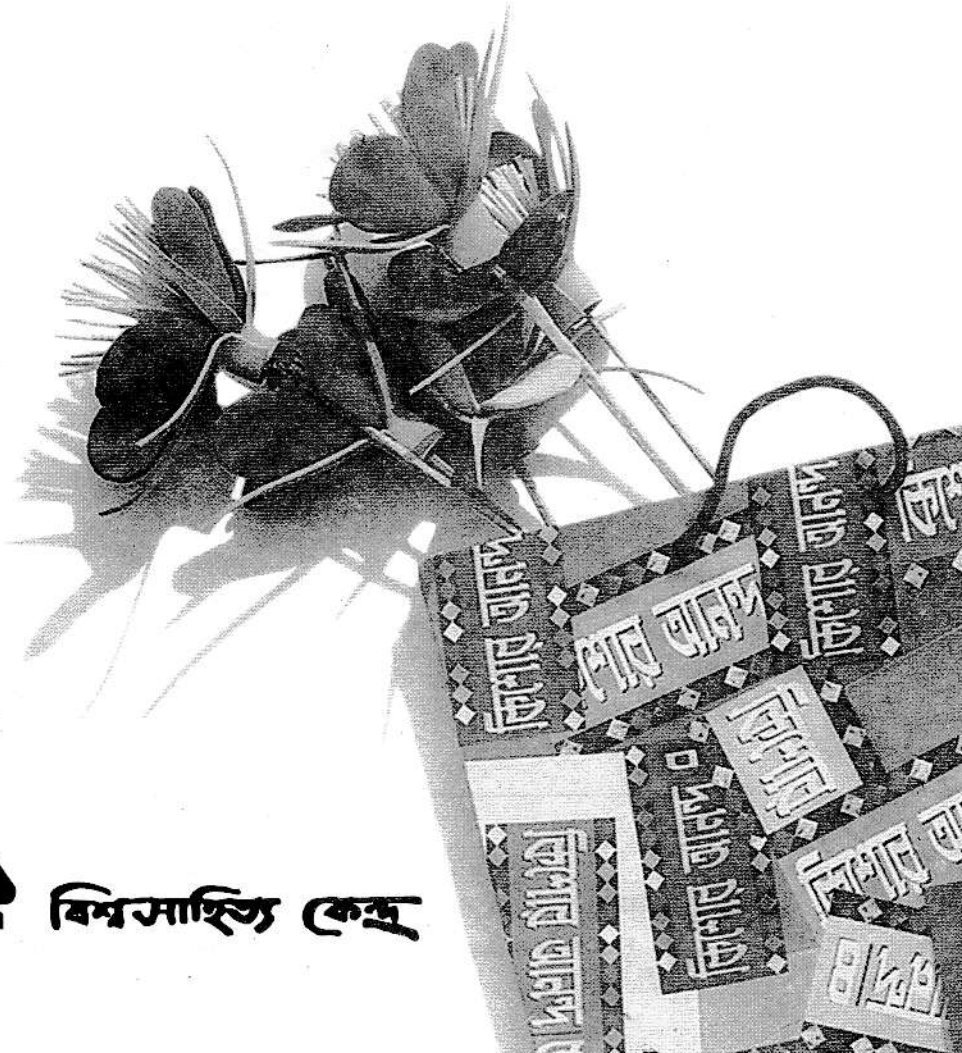

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২২৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলি

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

চতুর্থ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

অলঙ্করণ
শেখ আফজাল

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0228-7

KISHORE ANONDO [Vol. 9]
Children's magazine. Edited by Abdullah Abu Sayeed
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price Tk. 200.00 only

ভূমিকা

তোমরা, আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা, যাতে আলোকিত মানুষ হিশেবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য তোমাদের মন ও বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে সারা দেশে ঐ চেষ্টা করে আসছি। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তোমাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি নানারকম আনন্দময় উপন্যাস, মজাদার ভ্রমণকাহিনী, মহৎ মানুষদের জীবনী, রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও আরও নানা ধরনের বই—এমন সব বই যা পড়লে তোমাদের মন অনুভূতিময় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানের উচ্চতর জগতে প্রবেশের জন্য তোমরা উন্মুখ ও যোগ্য হবে।

কিন্তু এসব বই পড়ার পাশাপাশি মানব-সভ্যতার সেই সব বিষয় ও তথ্যও তো তোমাদের জানতে হবে যেগুলো জানলে তোমরা সুঅবহিত আধুনিক বিশ্ব-নাগরিক হিশেবে গড়ে উঠবে। 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশ করা হল সে জন্যেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'আসন্ন' নামে আমরা তোমাদের জন্য যে উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকাটি বের করি তার লেখাগুলো নিয়েই এই 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন ছেলে বা মেয়ের যা কিছু জেনে বড় হওয়া উচিত তার অধিকাংশ তথ্যই তোমরা পাবে এই কিশোর আনন্দে। বিশ থেকে পঁচিশ খণ্ডে কিশোর আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। এর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবজগতের অসংখ্য তথ্য তো তোমরা পাবেই সেইসঙ্গে পাবে অনেক অনবদ্য গল্প, কবিতা, কুইজ, চুটকি, স্মরণীয় বাণী, এমনি আরও অনেক রমণীয় ও উপভোগ্য লেখা।

আমরা আশা করি যারা এই বইয়ের সবগুলো সংখ্যা মন দিয়ে পড়বে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা একটা মোটামুটি ধারণা পাবে।

এ বইয়ের সব লেখাই অত্যন্ত সুলিখিত ও উপভোগ্য। তোমাদের জন্য ভালো ভালো লেখকদের যেসব অনন্য লেখা তাঁদের বই ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে ঐ সব বই ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাগুলো পড়ে তোমরা আনন্দ পেলে আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কেবল কিশোর-তরুণরা নয়, আমাদের ধারণা সব বয়সের সবরকম মানুষই 'কিশোর আনন্দ' একইভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কিশোর আনন্দ

সূ চি প ত্র

ছড়া / কবিতা

যেমন কর্ম তেমন ফল ॥ মোজাম্মেল হক ৯
হুলোর গান ॥ সুকুমার রায় ৪৩
রাখাল ছেলে ॥ জসীম উদ্‌দীন ১০৪
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নীতি-কবিতা ১১১
তুলনা ॥ হাসান হাফিজ ১২৮

গল্প

বলাই ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
একটি ফুটবল ম্যাচ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯
হুযুর কেবলা ॥ আবুল মনসুর আহমদ ৫৪
রঘু ডাকাত ॥ যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৮৫
প্রেম, ঘড়ি ও খলিফা ॥ ও হেনরি ১০৫
রাজার অসুখ ॥ সুকুমার রায় ১১৮
বালক-গোয়েন্দা ॥ আলফঁস দুদে ১২৩
বিধর্মী ॥ জ্যাক লন্ডন ১৩৫

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ

বৃষ্টি আসুক ঝেঁপে ॥ আলী আসগর ৫০
চাকা ঘোরে জলের টানে ৮১

প্রবন্ধ

কীটপতঙ্গের জাদুঘর ॥ শিরীন বকুল ১৫
তুষারচিতার সন্ধানে ॥ আলী ইমাম ১৮
দেশ-বিদেশের ক্যালেন্ডার ২৪
রত্নদ্বীপ আজও আছে ৩৭
গাছ মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ৪৪
মিহি কাপড় মসলিন ॥ শামসুদ্দোহা চৌধুরী ৪৬
বাঙলা সাহিত্যের নানা কাল ॥ হুমায়ুন আজাদ ৭০
প্যারাশুট আবিষ্কার ৭২
ভূমিকম্প ৭৭
ইতিহাস কথা কও ॥ এ. কে. বজলুল করিম ১২৯

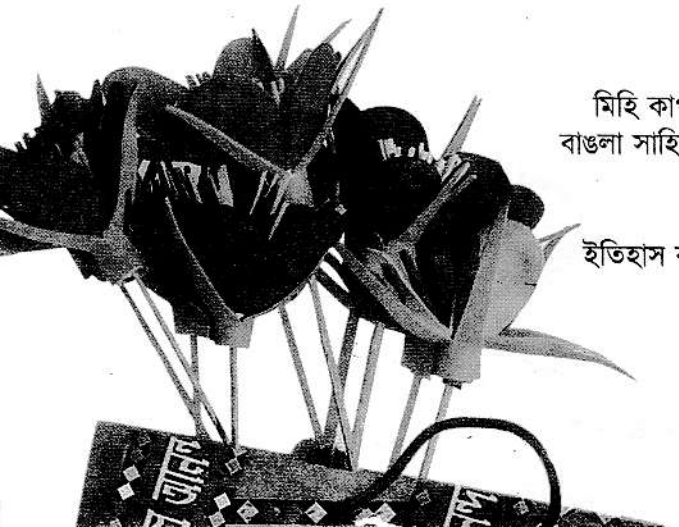

খেলাধুলা

ক্রিকেট খেলার আইনকানুন ৯২

ভ্রমণ/অভিযান

চামড়ার নৌকোয় আটলান্টিক পার ৯৯

জীবনী

গ্যেটে ১১৪
হাসন রাজা ॥ মোবারক হোসেন খান ১৩২

বিবিধ

স্ফিঙ্কস ২৮
মাংস ॥ মো. মোসলেহ উদ্দিন ৩৫
র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন ৪৫
স্মরণীয় বাণী ৫৩
লালশাক একটি পুষ্টিকর খাদ্য ৬৭
বেশি বুদ্ধির রেকর্ড ৬৮
বাদুড় রাতে কেমন করে চলাফেরা করে? ৬৯
লেপ-তোশক রোদে দিই কেন? ৮০
গরম বরফ ৮৪
শ্যামদেশীয় যমজ ৯৭
অ্যাডাকস ॥ খায়রুল আলম সবুজ ৯৮
নয়নতারা ১১০
অনাহারে কেন মৃত্যু হয়? ১১২
তিন-এর খপ্পরে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট ॥ আবেদ খান ১২২
ভিনদেশী এক বীরবল : নাসিরুদ্দীন হোজ্জা ১৩৪

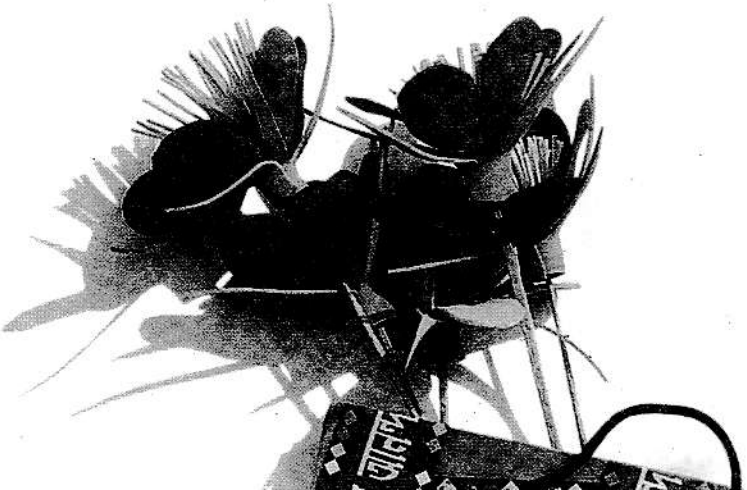

মোজাম্মেল হক

যেমন কর্ম তেমন ফল

দেখি এই চরাচরে, যে যেমন কর্ম করে,
তেমন সে ফল তার পায়।
যে চাষা আলস্যভরে, বীজ না বপন করে,
পক্ব শস্য পাবে সে কোথায়?
যদ্যপি শকতি থাকে, পড়িতে দেখহ যাকে,
হাত ধরে তুল তুল তারে;
নতুবা তুমি যে কালে, পতিত হবে সে হালে
কে তখন তুলিবে তোমারে?
যদি তুমি অহে ধীর, দুঃখিতের অশ্রু-নীর,
নিজ করে না কর মোচন;
তব অশ্রু নিরখিয়া, দুঃখী হবে কার হিয়া,
কে তাহা করিবে নিবারণ?

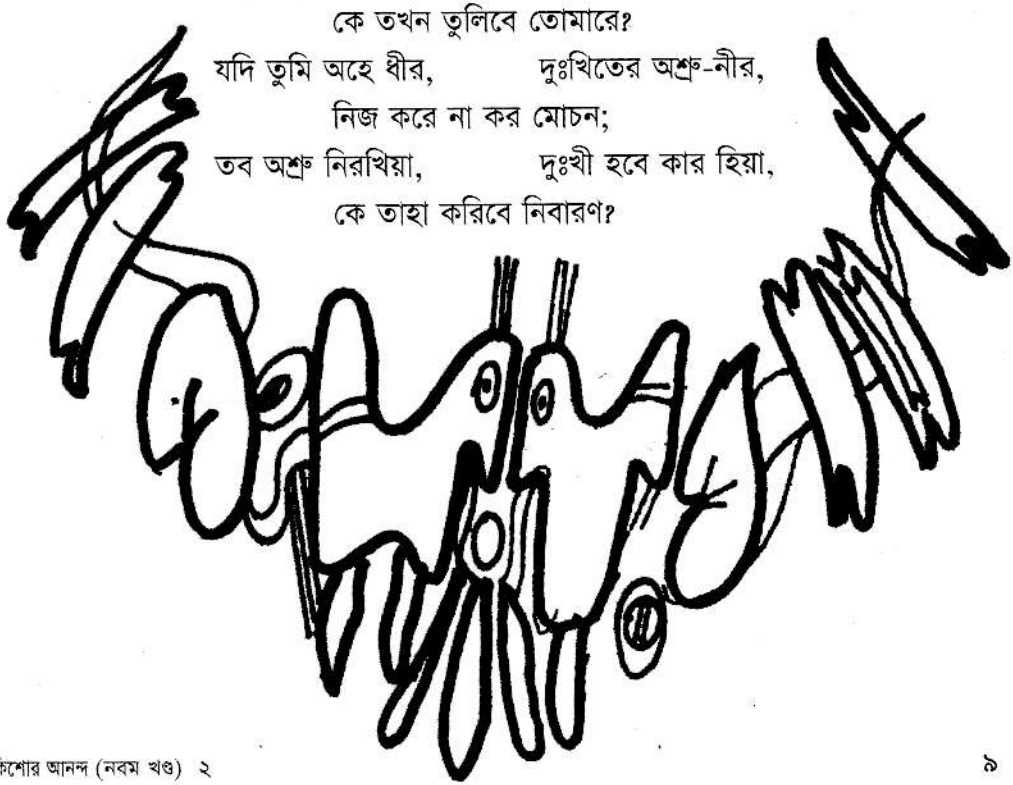

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাই

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্‌দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে, ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন

ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিল খিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারো কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ করে বকুল গাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে

সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে,তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দ্যুলোককে দোহন করে; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা! বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য। তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক পাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির

বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এত দূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন!"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ; তারই প্রাণের দোসর।

শিরীন বকুল

কীটপতঙ্গের জাদুঘর

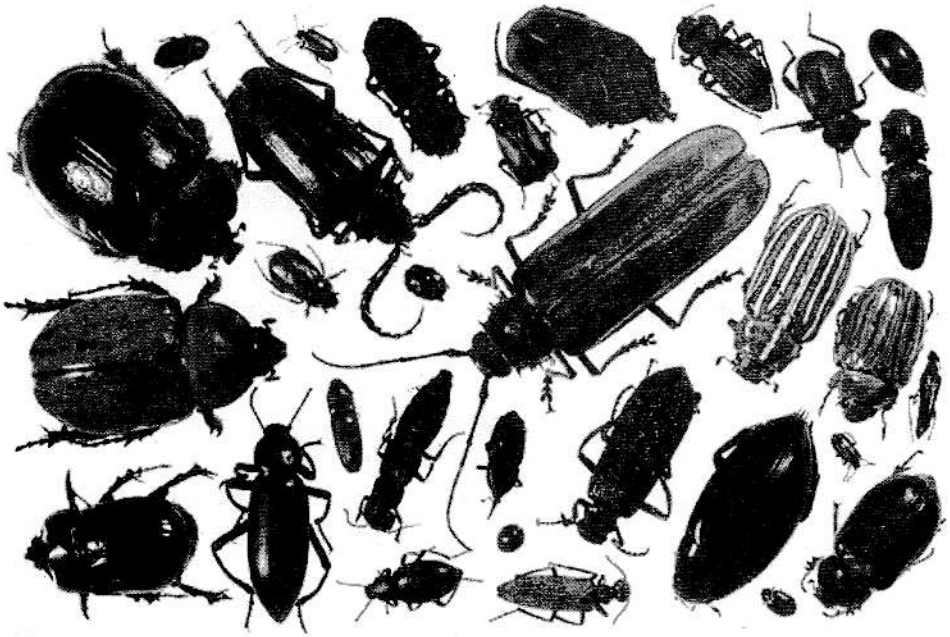

কীটপতঙ্গের চিড়িয়াখানা! নাম শুনেই মনে হচ্ছে, এ আবার কেমন কথা। পশুপাখিদের চিড়িয়াখানা হয়। তাই বলে কীটপতঙ্গের জন্যে চিড়িয়াখানা? অবাক হলেও এ সত্যি। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কত রকমের পোকামাকড় দেখতে পাই। এদের যন্ত্রণায় কখনও বিরক্ত হই। কিন্তু এদের সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো জানার আগ্রহ নেই। বরং এদের ধ্বংস করার জন্য নানা উপায় খুঁজে বের করি।

আমাদের আগ্রহ না থাকলে কী হবে। যাদের দরকার তারা কিন্তু ঠিকই ব্যস্ত রয়েছে কীটপতঙ্গের ভিড়ে। যেমন কীটতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা। শুধু নিজেরা ব্যস্ত থেকেই তৈরি করেছে কীটপতঙ্গের চিড়িয়াখানা। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে তৈরি করা হয়েছে এমনি একটি চিড়িয়াখানা। 'চিড়িয়া' শব্দটির অর্থ পাখি হলেও আমরা কিন্তু চিড়িয়াখানা বলতে পশুশালাই বুঝে থাকি। পশুপাখিদের পাশাপাশি পোকামাকড়ের জন্যেও একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। একটি বড় বাড়ি তৈরি করে তার মধ্যে অনেক পরিচিত এবং দুষ্প্রাপ্য পোকা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। শুধু পোকাদের আকৃতি দেখা নয়, পাশাপাশি এদের জীবনপ্রণালীর খুঁটিনাটি বিষয়ও দর্শকদের দেখার সুযোগ আছে।

সব পোকা একরকম হয় না। কোনো কোনো পোকা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। এইরকম পোকাদের জন্যে একটি কাচের ঘর তৈরি করা হয়।

তারপর এর সবটা শুকনো খটখটে রেখে একটি কোণে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে এক-টুকরো কাঠ রেখে দেয়া হয়। পোকাটি তখন শুকনো জায়গা ছেড়ে ঐ ভিজে কাঠের উপর আশ্রয় নেয়। আড়ালে থাকতে চাইলেও সে তখন আর লুকোতে পারে না। দর্শকদের দেখাতেও কোনো কষ্ট হয় না।

আবার আরেক ধরনের পোকা আছে, যারা বালির ভিতর ঢুকে থাকে। এদের জন্যে ঘরে বালি রাখা হয়। তবে বালির পরিমাণ কম থাকে। অল্প বালিতে এরা সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে না। কেউ কেউ আবার নিজেরা বালিতে না ঢুকে খাবার বা অন্য কোনো টুকটাক জিনিশ বালির নিচে লুকোবার চেষ্টা করে। এদের যদি এ অল্প বালির মধ্যে ছেড়ে দেয়া যায় তবে দেখা যায় খুব মজার দৃশ্য। এসব দৃশ্য খুব উপভোগের হয় দর্শকদের জন্যে।

মাকড়শাদের জাল আমাদের কাছে বিস্ময়কর বিষয়। এদের এই জাল-বোনা দেখা যায় এই চিড়িয়াখানায়। মাকড়শা কী করে শিকারকে ফাঁদে ফেলে তাও এখানে দেখা যায়।

গুটিপোকা দেখে অনেকেই ভীষণ ভয় পায়। দেখতে কেমন অসুন্দর। অথচ এই কুৎসিত গুটিপোকার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে সুন্দর বর্ণালি প্রজাপতি। গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হবার এই ক্রমবিকাশ অনেক দর্শকই দেখতে পায়।

মানুষ, পশুপাখিদের মতো এইসব ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গও নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে অবলম্বন করে নানা কৌশল। কেউ শরীরের পেছন থেকে কামানের মতো ধোঁয়া বা দুর্গন্ধ ছড়ায়। কেউ আবার শরীরটাকে তালগোল পাকিয়ে বিকৃত করে। যোদ্ধা পোকামাকড়ও অনেক আছে। নিজেদের মধ্যে অন্য জাতীয় পোকা দেখতে পেলেই এরা ক্ষিপ্র হয়ে এসে আক্রমণ করে। মোরগ-ষাঁড়ের লড়াই মানুষ যেমন উপভোগ করে, এদের লড়াইও দর্শকদের কাছে সমান আগ্রহের বিষয়। কাচের বাক্সে এদের রেখে তাতে খুব কড়া কৃত্রিম আলো ফেলা হয় যাতে দর্শকরা ক্ষুদ্র লড়াকুদের ভালোভাবে দেখতে পায়। যুদ্ধশেষে একজন জয়ী হয় কিন্তু অপরপক্ষকে দিতে হয় প্রাণ। জয়ী তখন মৃতপোকার শরীরকে খাদ্য হিশেবে গ্রহণ করে। এর জন্যে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে কিছুটা নিষ্ঠুরতা

এবং কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ সবই দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে। কীটপতঙ্গের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবার জন্যে। এরা কেমন দেখতে, কী খেতে ভালোবাসে, কোথায় থাকতে চায়, স্বভাব কেমন—সবকিছু জানা যায় এই চিড়িয়াখানায় এলে।

সব কীটপতঙ্গ যে মানুষের অপকার করে তা সত্য নয়। কোনো-কোনো কীটপতঙ্গ মানুষের অপকার করে। যেমন মশা, মাছি, তেলাপোকা, উইপোকা—রোগের জীবাণু ছড়ায়। কোনো-কোনো পোকামাকড় বই-কাগজ কেটে কত ক্ষতি করে। তেমনি আবার অনেক পোকামাকড় আছে যারা এইসব অপকারী পোকাদের খেয়ে ফেলে আমাদের উপকারই করে। কেঁচো আমাদের চাষাবাদে সাহায্য করে। জমির মাটিকে উর্বর করে। গুটিপোকা থেকে রেশম-সুতা তৈরি হয়। এমন অনেক পোকা আছে, যারা মানুষের উপকারের পাশাপাশি অপকারও করে থাকে। এসবের পরিচয় পাওয়া যায় এই চিড়িয়াখানায়।

একটি পোকার আবার অনেকরকম জাত আছে। আমাদের এ পৃথিবীতে জীবজন্তুর সংখ্যার চেয়ে বেশি আছে কীটপতঙ্গ। এইসব পোকা সংগ্রহ করতে চিড়িয়াখানার লোকদের অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্ট করতে হয়। দূরদূরান্ত থেকে তাঁরা ঝোপে-জঙ্গলে, উঁচুগাছের ডালে, পানিতে-কাদায়, নোংরা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এদেরকে সংগ্রহ করেছেন। বেশিরভাগ পোকাই নোংরা জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। জাল ফেলে, ফাঁদ পেতে, ওষুধ দিয়ে কৌশলে এদেরকে ধরা হয়। তবে খাবারের লোভেই এরা বেশি ধরা পড়ে।

এদের দেখাশোনা, লালনপালনের জন্যেও অনেক খাটাখাটুনি করতে হয়। যে যেমনভাবে থাকতে চায় তাকে সেভাবেই রাখা হয়। কার কী খাদ্য, তা জোগাড় করতে হয়। সবাই তো আর একই খাবার খায় না। কেউ গাছের পাতা, কেউ ফলের রস, কেউ মাটি, কেউ পচা পানি কাদা, কেউবা ফুলের পাপড়ি, কেউ আবার অন্য পোকা অথবা নিজেদের স্বজাতীয় বা বিজাতীয়দের খাবার হিশেবে গ্রহণ করে। স্বাধীন অবস্থায় তো নিজেদের খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করে। কিন্তু যখনই এদেরকে চিড়িয়াখানায় আনা হয় তখন থেকে কর্তৃপক্ষকেই এদের সব খাবার জোগাড় করে দিতে হয়। যে-পোকারা বই-কাগজ আঠা খায় তাদের জন্যে এসবই দিতে হয়। সব ফলের রস হলে হয় না। যে-পোকা যে-ফলের রস খায় তাকে সে-ফল যত দুষ্প্রাপ্যই হোক-না কেন, জোগাড় করে দিতে হয়। কোনো-কোনো পোকা আছে, যারা নিজেদের চেয়ে বড় পোকা না-পেলে খুশি হতে চায় না। কোনো পোকা যদি গোলাপের পাপড়ি খাবার হিশেবে খায় তবে তাকে গোলাপের পাপড়িই এনে দিতে হবে, অন্য কোনো ফুলের পাপড়ি হলে তার চলবে না। এদের এমন বাছ-বিচার মেনে চলতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয়। ব্রেটন এডি পোকামাকড়দের খুব দরদী বন্ধু বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি মনে করেন, অপকার করলেও সব পোকামাকড়ের সৃষ্টির একটা সার্থকতা আছে।

আমরা কেউ জানি না, হয়তো আদিযুগে আরো কত রকমের কীটপতঙ্গ ছিল। এখন আর তারা নেই। ডাইনোসরদের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের ধারাকে ধরে রাখার জন্যেই এদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে এদের জীবনপ্রণালী। আমরা জানি, মশা আমাদের জন্যে কত অপকারী পোকা। অথচ অবাক হবে শুনে, একজাতের মশা আছে যারা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহক এনোফিলিস মশাদের ধরে খেয়ে ফেলে। এরা তো মানুষের উপকারই করছে। অজ্ঞতার কারণে আমরা সব মশাকেই শত্রু মনে করি।

নিউইয়র্কের এই কীটপতঙ্গের চিড়িয়াখানা মানুষের কাছে এক অজানা-অচেনা জগৎকে তুলে ধরছে। মানুষ এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকাদের অদ্ভুত জীবনপ্রণালী সম্পর্কে জানতে পারছে। এটা আমাদের জন্যে এক জ্ঞানের ভাণ্ডার।

আলী ইমাম

তুষারচিতার সন্ধানে

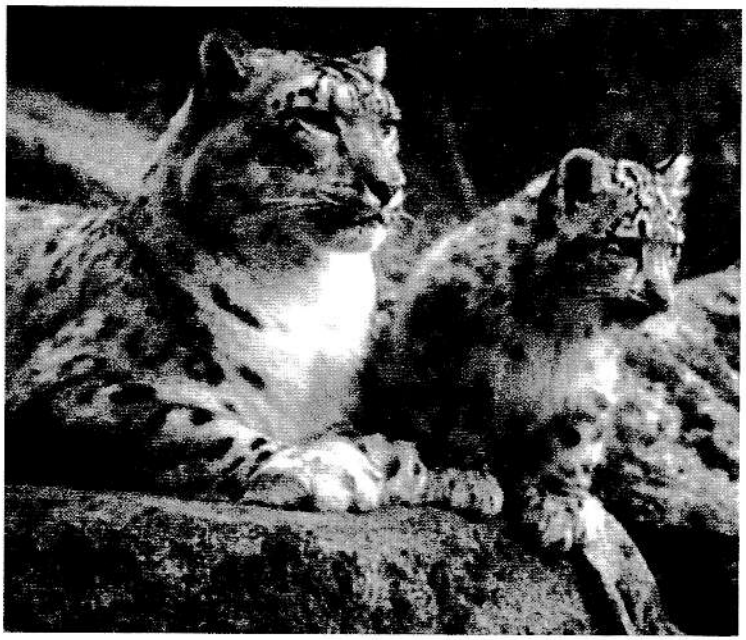

হিমালয়ের এক রহস্যময় প্রাণী হল তুষারচিতা। পাহাড়ি গ্রামগুলোর আতঙ্ক। কখন-যে নিঃশব্দে নেমে আসবে। সহজে দেখা যায় না এদের। নয় হাজার থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে থাকে এই তুষারচিতা। হালকা ধূসর রং। তার উপর রয়েছে ছোট ছোট কালচে দানার নকশা। যখন তীব্র শীতে সবকিছু জমাট বেঁধে যায় তখন এই প্রাণীরা কখনো কখনো নেমে আসে। অনেকে বলে হিমচিতা। ভুটিয়ারা বলে আমচিতা। নেপালের অধিবাসীরা ডাকে সাবু বলে।

তুষারচিতার হিমশীতল দুটো চোখ। যা দেখলে যে-কোনো সাহসী লোকের বুকও কেঁপে ওঠে।

এই দুর্লভ প্রাণীটির ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের রয়েছে খুব কৌতূহল। বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানাগুলো চায় একে সংগ্রহ করতে। কিন্তু তুষারচিতাকে যে ধরাই যায় না। একদম যেন নাগালের বাইরে। সহজে দেখাই যায় না।

হিমালয়ের উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বতে ঘেরা বনে-জঙ্গলে থাকে এরা। নেপালের লাঙ্গু গিরিখাতেও থাকে।

এই দুর্লভ প্রাণীটির খোঁজে বেশকয়েকটি অভিযান চালানো হয়েছে হিমালয়ের দুর্গম এলাকায়। দুষ্প্রাপ্য প্রাণীদের সন্ধান করা অনেকের কাছে তীব্র এক নেশা। তখন তাঁরা পথের কোনো সমস্যার কথা মানতে চান না। পথের প্রতিপদে কত ভয়ঙ্কর বিপদই যে থাকে। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর থাবা নেমে আসতে পারে। তবু তাঁরা ছুটে যাবেন। নতুন কিছু পাওয়ার উত্তেজনায় যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন তাঁরা!

তাই ভয়ঙ্কর, দুর্গম লাদাকে কালো গলার সারসদের খোঁজে হয় অভিযান। বৃদ্ধবয়সেও পাখিবুড়ো সলিম আলী নীলগিরি পাহাড়ে লাল পাখার কোকিল খুঁজতেন।

হিমালয়ের তুষারচিতা এক দুর্লভ জন্তু। ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। অনেক প্রাণীই এখন বিরল তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলে থাকে সোনালি বেড়াল। দেখতে খুব সুন্দর। ঝকঝক করে। এদের নাকের নিচের দুধারে শাদা দাগ। উঁচু পাহাড়ে থাকে। পাখি শিকার করে। কখনো ভেড়ার পালে হামলা চালায়। এখন আর সোনালি বেড়ালকে সহজে দেখাই যায় না।

লাদাকে আর গিলগিটের পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায় লিঙ্কস। এরা বেড়ালগোষ্ঠীর সদস্য। এদের মুখের চারপাশে লম্বা চুলের বাহার। দীঘল ঘাস আর ঘন বেতবনে থাকে।

দুর্লভ জন্তু তুষারচিতা সম্পর্কে সবচাইতে বেশি তথ্য দিয়েছেন রডনি জ্যাকসন। তাঁর অসীম সাহস আর বুদ্ধিমত্তার জন্যে পাওয়া গেছে তুষারচিতার অনেকগুলো ছবি।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অভিযান করেছিলেন জ্যাকসন। জানতেন যে-কোনো মুহূর্তে হিমচিতার থাবার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন, নয়তো গড়িয়ে যাবেন অতল খাদে। কিন্তু কোনোকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁকে।

তুষারচিতার খোঁজে এলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রী রডনি জ্যাকসন। তাঁর উদ্দেশ্য, এই রহস্যময় প্রাণীটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। কোনোমতে একটি তুষারচিতাকে দেখতে পেলে হয়। ঘুমপাড়ানি ইনজেকশান দিয়ে অজ্ঞান করবেন।

অনেক দুর্গম এলাকায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে জ্যাকসনের। ঘরের নিরাপদ পরিবেশ তাঁর কাছে মোটেই ভালো লাগে না। তাঁকে শুধু হাতছানি দেয় দূর পাহাড়ের বন। কোথায় গহিন অরণ্যে ঘুরছে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীগুলো।

কিশোরকাল থেকেই জ্যাকসন সাহসী বন্ধুদের জুটিয়ে প্রায়ই বনে-জঙ্গলে যেতেন। পাখি-দেখার ক্লাব করেছিলেন। হিমালয়ে অভিযানে যাওয়ার নেশা তাঁর তখন থেকেই।

তুষারচিতা নিয়ে প্রচুর রহস্য। এ প্রাণীটির কোনো তথ্যই জোগাড় করা যাচ্ছে না। জীববিজ্ঞানীরা জানতে চান। কিন্তু প্রধান সমস্যা হল প্রাণীটিকে যে দেখাই যাচ্ছে না! পাহাড়ি এলাকায় যেসব গরিব লোক কাঠ-সংগ্রহের জন্যে নিরুপায় হয়ে গহিন অরণ্যে প্রবেশ করে তাদের কেউ কেউ আচমকা দেখেছে এই দুর্লভ জন্তুটিকে।

আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি পত্রিকা এ-ধরনের বিরল প্রাণীদের ছবি ছাপতে আগ্রহী। এজন্যে তাদের চিত্রগ্রাহকদের অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। পত্রিকার কুশলী ফটোগ্রাফার জর্জ বি শালর এলেন নেপালের বনে। অনেক কষ্টে তিনি একটি তুষারচিতার ছবি তুললেন। ১৯৭১ সালের নভেম্বর সংখ্যায় সে-ছবি ছাপা হল। এটাই ছিল তুষারচিতার প্রথম প্রকাশিত ছবি।

সেই ছবিটি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। মানুষের কাছে এতদিন অপরিচিত ছিল প্রাণীটি। যেন রহস্যের মিহি কুয়াশায় ঢাকা। ছাপা হল ছবি। তুষারচিতার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। পত্রিকায় ছবি ছাপা হওয়ার পর স্নো-লেপার্ডের প্রতি মানুষের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করল অনুসন্ধান চালানোর।

নেপালের লাঙ্গু গিরিখাত অত্যন্ত দুর্গম। পৃথিবীতে যে-কটি দুর্গম অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে লাঙ্গু অন্যতম। বিপদসঙ্কুল পাহাড়-পর্বতে ঘেরা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে-জায়গাটির খবর জানা ছিল না। ১৯৬৪ সালে প্রথম একজন দুঃসাহসী ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন টাইসন এলাকাটির মানচিত্র তৈরি করেন।

রডনি জ্যাকসন প্রথমে লাঙ্গুর ভূগোল সম্পর্কে ব্যাপক খোঁজখবর নিলেন। যোগাযোগ করলেন নেপাল-সরকারের সাথে। তারা জ্যাকসনের এই হিমচিতা অনুসন্ধান-প্রকল্পটিকে অনুমোদন করল।

নেপালের জাতীয় উদ্যান ও বন্যজন্তুর সংরক্ষণ বিভাগ এতে আর্থিক সহায়তা করল। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্থা থেকেও জ্যাকসনের এই প্রকল্পে সহযোগিতা আসা শুরু করল। জ্যাকসন অভিযানের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম যোগাড় করলেন।

অভিযাত্রী দলটি প্রথমে বিমানে করে রওনা দিল। কাঠমাণ্ডু থেকে দুশো মাইল উত্তর-পূর্বে ছোট্ট পাহাড়ি শহর জুমলায় নামল। সেখান থেকে নির্ধারিত বেস ক্যাম্প ত্রিশ মাইল দূরে।

এই পথটি ভয়ানক দুর্গম। মালপত্র বহন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল। বেস ক্যাম্প তৈরি হল একটি পাহাড়ি নদীর তীরে। কাছে ছোট গ্রাম ডোলপু। নদীতে নেই সাঁকো। গাছের গুঁড়ির সাহায্যে তারা খরস্রোতা নদীটি পার হল। বনে কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা নেই। বন্যজন্তুরা যেসব পথ ব্যবহার করে তারা সেই পথ দিয়ে এগুতে লাগল। জ্যাকসন ধরেই নিয়েছিলেন এক রোমাঞ্চকর অভিযানে যাচ্ছেন তাঁরা। প্রতি পদে যেখানে উত্তেজনা।

ঘন গাছগাছালির ঠাস বুনোট। ছায়াছায়া অন্ধকার। ভেজামাটি। কনকনে বাতাসের ঝাপটা। দলটি এগিয়ে চলেছে হিমচিতার সন্ধানে। অভিযাত্রী দলে আছেন গ্যারি আলবোর্ন। একদিন জ্বালানি কাঠের জন্যে গিয়েছেন ঘাসবনে। বাতাসে সরসর করে দুলছে ঘাসবন। মাঠে কয়েকটি নীল রঙের ভেড়া চরছিল। হঠাৎ গ্যারি বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন সেই দুর্লভ জন্তুটিকে। একটি তুষারচিতা ছুটে আসছে। চাপা গর্জন করে একটি ভেড়ার উপর লাফ দিল। ভেড়াটি ছুটে পালিয়ে যায়। চিতাটি দেখতে পায় গ্যারিকে। গ্যারি তখন যেন কেমন সম্মোহিত। হিমচিতাটি প্রায় পাঁচমিনিট তুষার সবুজ চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। চিতাটি সম্ভবত এর আগে কোনো মানুষ দেখেনি। তারপর চিতাটি কানদুটো খাড়া করে ঝুঁকে নিজেকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর ছুটে পালাল চিতাটি।

গ্যারির বিমূঢ়ভাব ততক্ষণে কেটে গেছে। ছুটতে ছুটতে আসেন শিবিরে। রুদ্ধশ্বাসে বলেন চিতা দেখার কথা। জ্যাকসন উৎফুল্ল হন। ঠিক জায়গায় এসেছেন তাঁরা।

পরদিন জ্যাকসন আর তাঁর দল বনের ভেতরে খানিকটা এগুতেই দেখতে পেলেন একটি তুষারচিতাকে। সাথে সাথে নিপুণভাবে জাল ছুড়ে বন্দি করলেন। শেরপাসঙ্গী লোপসাং জালের একদিক ধরে রেখেছে। জ্যাকসন ছুটে যান। জালবন্দি তুষারচিতা গরগর করছে। জ্যাকসনের হাতে চারহাত লম্বা স্টিক। তুষারচিতার শরীরে ক্ষিপ্রহাতে ইনজেকশনের সুচ বিঁধিয়ে দিলেন। ওষুধের প্রভাবে চিতাটি অচেতন হল। এরকম ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণীটি থাকবে প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর ওষুধের প্রভাব যাবে কেটে।

জ্যাকসন আর তার দলের সদস্যরা মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইলেন তুষারচিতাটির দিকে। সোনালি রোদে ঝলমল করছে। সৌন্দর্য যেন ছিটকে আসছে।

অপূর্ব।—মৃদুকণ্ঠে বললেন জ্যাকসন। তারপর ব্যাগ থেকে একটি রেডিও-কলার বের করে চিতাটির গলায় বেঁধে দিলেন। এই ছোট বেতারযন্ত্রটি চিতার গতিবিধির খবর জানিয়ে দেবে পরবর্তী সময়ে।

এরপর জ্যাকসন বিভিন্ন কোণ থেকে চিতাটির অনেকগুলো ছবি তুললেন। খয়েরি শরীর। কালো কালো চোখ। লম্বা লেজ।

কিছুক্ষণ পরে চিতাটির ঘুম ভাঙল। গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জ্যাকসন আর তাঁর সঙ্গীরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যান। প্রাণীটি একসময় জঙ্গলে মিলিয়ে যায়।

ক্যাম্পে এসে জ্যাকসন টেলিমিটার রিসিভার সচল করলেন। তুষারচিতাটির চলাফেলার সমস্ত খবর পেতে থাকলেন। চিতার আশেপাশের সবরকম শব্দ রেডিও-তরঙ্গের মাধ্যমে জ্যাকসন পেলেন। পৃথিবীর প্রথম রেডিও-কলারযুক্ত তুষারচিতার জীবনের নানা খবর পাওয়া শুরু হল। জ্যাকসনের স্বপ্ন সার্থক হল।

বেতারযন্ত্র নিয়মিতভাবে তুষারচিতাটির গতিবিধির সঠিক সন্ধান দিতে লাগল। সেই নির্দেশ অনুসরণ করে জ্যাকসন দূরবিন দিয়ে তুষারচিতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে লাগলেন। প্রাণীটির স্বভাব হল একাকী চলাফেরা করা।

জ্যাকসনের তোলা চিতার বিভিন্ন আকর্ষণীয় ছবি তখন ছাপা হয়েছে। দুর্লভ এই রাজকীয় প্রাণীর ছবিগুলো রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

এতদিন কত রহস্যময় গল্প ছিল এই প্রাণীটি নিয়ে—শেরপা-কুলিরা যাদের কথা বলত আতঙ্ক-মেশানো কণ্ঠে। অনেকে ভাবত দুর্গম পাহাড়-চুড়োতে বাস করে অপদেবতা।

জ্যাকসন সেই অভিযানে আরো চারটি তুষারচিতার সন্ধান পেলেন।

লাঙ্গু অঞ্চলটি ছিল খুবই দুর্গম। অনেকদূর পর্যন্ত কোনো লোকালয় নেই। তাঁরা ১৪,৪৭৫ ফুট উঁচুতে একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন ত্রিশলা কেভ।

একটি চিতাকে ইনজেকশন দেয়ার সময় আহত হয়েছিলেন জ্যাকসন। চিতার থাবার আঘাতে তাঁর হাতের এক জায়গার মাংস উড়ে যায়। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে আট দিন হেঁটে জুমলায় পৌঁছতে হয়।

দুঃসাহসী রডনি জ্যাকসনের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্যে মানুষ জানতে পেল তুষারচিতার নানা মজার খবর।

'ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর বহু দুর্গমস্থানে অভিযানকারী দল পাঠিয়েছেন বিরল কোনো প্রাণী বা রহস্যময় কোনো জায়গার তথ্য সংগ্রহের জন্যে। তাঁরা ঠিক করলেন হিমালয়ের তুষারচিতার খোঁজে একটা বড় আকারের অভিযান চালাবেন। পত্রিকায় তুষারচিতার ছবি ছাপা হওয়ার পর প্রচুর চিঠি এসেছে। অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেছে। তারা এই লাজুক এবং বিরল প্রাণীটি সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী।

পত্রিকা থেকে পাঠানো হল জর্জ শ্যালরকে। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন অভিযাত্রী। শ্যালর তাঁর রোমাঞ্চ-কাহিনী লিখলেন। নাম দিলেন 'নীরবতার প্রস্তর'। তার কিছুটা অংশ :

"ডিসেম্বরের তুষারস্নাত দিনে শ্রীনগর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল। লোকালয় পার হয়ে জিপ পৌঁছে গেল হিমালয়ের অরণ্য-অঞ্চলে। আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি তার আশেপাশেই আছে পৃথিবীর বিরল প্রাণী তুষারচিতার আস্তানা! এরা রাতের অন্ধকারে শিকার করে। হরিণ, খরগোশ, বুনো ভেড়া আর ছাগল এদের প্রিয় খাদ্য। এরা সাধারণ চিতার মতোই বড়। একা একা থাকতে ভালোবাসে। কখনো কখনো জোট বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। বরফের উপর বাঁকা নখের সাহায্যে চিহ্ন করে নিজেদের জায়গা আগলে রাখে। এদের গায়ে আছে অদ্ভুত গন্ধ যা ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের ডালে।

পনেরো দিন অবিরাম অনুসন্ধানের পর হঠাৎ এক পড়ন্ত শেষ বিকেলে শুভ্র হিমালয়ের পটভূমিতে তার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল।

প্রতিদিনের মতো ক্যাম্পে ফিরছিলাম। প্রথম জানুয়ারির হাড়-কাঁপানো শীতে রক্ত বুঝি জমাট বরফ। আরও একটি দিন বৃথাই অতিবাহিত হল। হতাশায়, ক্ষোভে ভেঙে পড়েছি ভীষণ। এত উদ্যম ব্যর্থ হবে? আমি কি আমার ঈপ্সিত তুষারচিতার সন্ধান পাব না?

ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। হঠাৎ সজাগ কানে সচকিত নখের আওয়াজ। চমক ভাঙতেই দেখি পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে নখ দিয়ে বরফের বুকে দাগ টানছে বিশ্ববিধাতার আশ্চর্য এই সন্তান। নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত কী এক তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে যায়। এতই অভিভূত হয়ে পড়েছি যে ক্যামেরার বোতাম টিপতে ভুলে গেছি। যখন চমক ভাঙল তখন দেখি চারপাশে শুধু প্রাণহীন বরফের সীমাহীন বিস্তার। ক্ষণিকের অবসানে কোথায় হারিয়ে গেছে পরমাকাঙ্ক্ষিত তুষারচিতা।

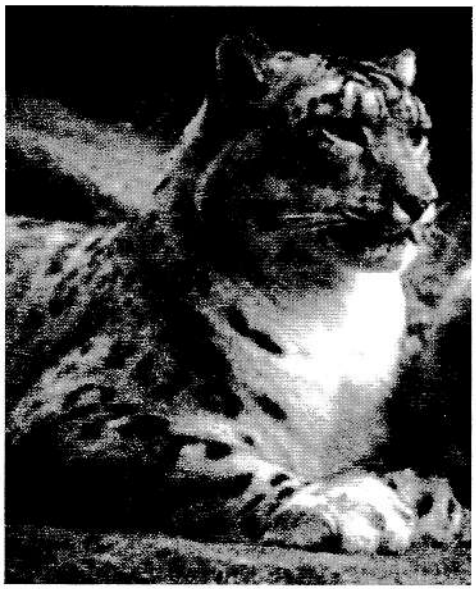

এরপর কেটে গেল আরও সাতটি দিন। পাগলের মতো খোঁজ করলাম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পা রাখলাম দুর্গম অরণ্যের বুকে। কিন্তু তুষারচিতার দেখা পেলাম না।

হঠাৎ পনেরোই জানুয়ারির সকালে স্থানীয় এক পাহাড়ি রাজকুমারের দূত ছুটে এল আমার কাছে। তুষারচিতার দেখা মিলেছে। রক্তে বেজে উঠল মত্ত মাদল। সব কাজ ফেলে দৌড়ে গেলাম রাজকুমারের কাছে।

কোথায় তুষারচিতা?

আমার অশ্রুসজল চোখের সামনে পড়ে আছে রক্তাক্ত গায়ের চামড়া, কী নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এই নিরীহ প্রাণীটিকে। বিস্ফারিত চোখের দুটি মণিতে লেখা আছে জীবনের একান্ত আকুতি। হাসতে হাসতে রাজকুমার বললেন—আপনার আসতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। জন্তুটা আমার বুনো ছাগলগুলোকে মারছিল। তাই গতকাল রাতে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলাম।

হায় ঈশ্বর! এরা জানে না অহঙ্কারের বন্দুক থেকে দম্ভের ট্রিগার টেপা সীসার বুলেট কেমনভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে অমূল্য প্রাণীর জীবন!

এই ঘটনার পর বিষণ্নতায় ভরে যায় মন। আগের সেই উৎসাহ অনেক কমে গেল। স্থির করলাম, গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে যাব। প্রকৃতির বিচিত্র শাস্তিতে পৃথিবীর বুক থেকে যদি শেষতম তুষারচিতাটি হারিয়ে যায়, তার জন্যে আমি কী করতে পারি?

অবশেষে একদিন প্রথম প্রভাতবেলায় তার সাথে আমার শেষবারের মতো দেখা হল। এবারের মিলন ছিল কয়েক মুহূর্তের। তারই মধ্যে অপসৃয়মাণ চিতার চোখদুটি আমি দেখেছিলাম। সেখানে তখনও ঝরছে বেঁচে থাকার আশ্চর্য অভিলাষ। কে জানে এটাই হয়তো পৃথিবীর শেষ তুষারচিতা।"

হাস্যকৌতুক

১. 'নাসীরুদ্দীন একটা মণিহারি দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করল : 'এখানে পেরেক পাওয়া যায়?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললে দোকানদার।
'আর চামড়া?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।'
'আর সুতো?'
'যায়, আজ্ঞে।'
'আর রঙ?'
'তাও যায়।'
'তাহলে তুমি বসে না থেকে একটা জুতো তৈরি করে ফ্যালো না বাপু!'

২. মাযহারকে হাঁফাতে-হাঁফাতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেখে বাবা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'ব্যাপার কী?'
'বাসের পাশে পাশে দৌড়ে এসেছি।'
'কেন?'
'দু'টাকা ভাড়া বাঁচালাম।'
'ট্যাকসির সঙ্গে দৌড়ানো উচিত ছিল', বাবা গম্ভীরভাবে বললেন : 'অন্তত পঞ্চাশ টাকা বাঁচত।

দেশ-বিদেশের ক্যালেন্ডার

তোমরা সকলেই জানো, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালিত হয় ২৫ বৈশাখ। ঈদের দিন কিংবা তোমার জন্মদিন এগুলোও বিশেষ বিশেষ দিনে পালিত হয়। শুধু এইসব নিয়েই নয়, প্রত্যেকদিনেই তোমাদের দেখতে হয় আজ কী বার এবং স্কুলের রুটিনে কোন্ পিরিয়ডে কী পড়ানো হবে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ যে, বার, তারিখ, মাস ও বছর নিয়ে তোমাদের অনবরতই চিন্তা করতে হচ্ছে। এটাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ২৫ বৈশাখ হল বাংলা তারিখ, ১ জানুয়ারি হল ইংরেজি তারিখ, আর তোমাদের স্কুল-কলেজের কার্যসূচি চলে ইংরেজি বছর ও তারিখ অনুযায়ী। তাহলে তোমাদের জানবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই কখনো কখনো হয়, এই তারিখ, মাস ও বছর এল কেমন করে? আজ তোমাদের সেই সম্পর্কেই কিছু বলব।

পৃথিবী সৃষ্টির পরে অনন্তকাল ধরে সময় শুধু চলেছে আর চলেছে, কিন্তু তাকে মাপব কেমন করে? সেটা একটা বিরাট সমস্যা। এই ব্যাপারে একেবারে সৃষ্টির প্রথমে আদিম মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল :

১. দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন হচ্ছে।
২. চাঁদ আকাশে ক্ষয় হতে হতে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার মানে অমাবস্যা; আবার চাঁদের সরু ফালিটা একটু একটু বাড়তে বাড়তে পুরো একটা আলোকিত থালার আকার নেয়, তার মানে হল পূর্ণিমা।

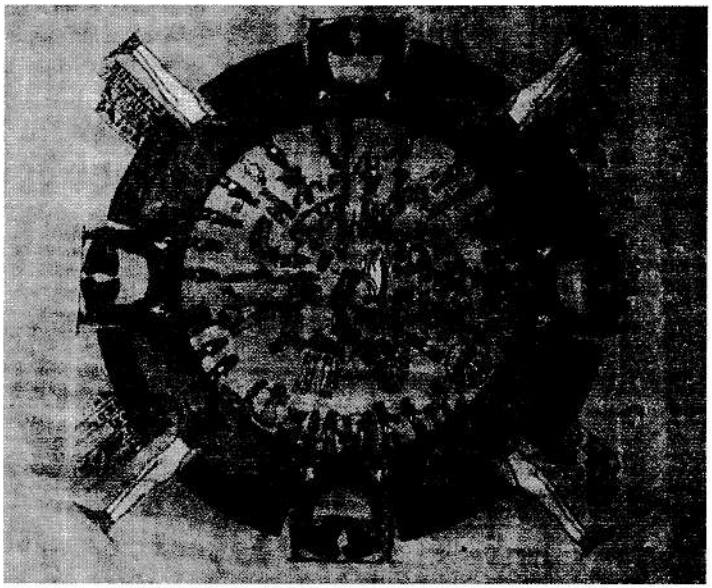

৩. দিনের বেলাকার আকাশে সূর্যের বিভিন্ন রকমের গতিপথ, আর তার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের ঋতু যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীতের আবির্ভাব।

আকাশে দৃশ্যমান এই সূর্য ও চাঁদের চলাফেরা থেকেই মানুষ কিন্তু সময় মাপবার কয়েকটা মাপকাঠি পেয়েছিল। সূর্যের ভোরবেলায় পুব-আকাশে উদয়, সারাদিন পরে পশ্চিম-আকাশে অস্ত যাওয়া, তারপর রাতের আবির্ভাব, আবার রাতের পরে সূর্যের উদয়—এই হল একটা দিনের পরিমাপ। এর মানে হল পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে, তোমরা জানো, ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়—এইটাই হল একটা দিন। আবার রাতের আকাশে চাঁদকে দেখা যায়। তোমরা জানো যে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে তাকেই বলি আমরা এক চান্দ্রমাস। এ সময়টুকুকেই মাস হিশেবে ধরা হয়—এর গড় মান হল প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন। তোমরা এও জানো যে সূর্যের চারপাশে আমাদের পৃথিবীটা অবিশ্রাম ঘুরে চলেছে নিজের অক্ষে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর যে-সময় লাগে তাকেই আমরা বলি একটা বছর। এর গড় মান হল ৩৬৫ দিন।

আকাশে যে-তিনটি মূল ব্যাপার লক্ষ্য করার কথা বলা হল তারই ওপর ভিত্তি করে আগের কালের দেশ-বিদেশের জ্যোতির্বিদরা নানারকম সময় মাপবার ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিলেন। ক্যালেন্ডার মানেই হল সময় মাপবার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা। ক্যালেন্ডার শব্দটি ইংরেজি হলেও এর সঙ্গে তোমরা খুব পরিচিত। কারণ আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি অফিসে, ব্যাংকে, স্কুল ও কলেজে এখনো পর্যন্ত ইংরেজি ক্যালেন্ডারই চালু আছে। তবে ক্যালেন্ডারের বাংলা করলে সেটা হবে পঞ্জিকা, কিন্তু প্রচলিত পঞ্জিকা বলতে তোমরা যা বোঝো তার দ্বারা ঠিক ইংরেজি ক্যালেন্ডার শব্দটা বোঝায় না। তোমরা যে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে চলেছ তার নাম হল গ্রেগরীয়

ক্যালেন্ডার। কিন্তু তোমরা জানো কি এই ক্যালেন্ডারটা কীভাবে প্রচলিত হয়েছিল? সেই কথা এবং দেশ-বিদেশে আরও কতরকম ক্যালেন্ডার প্রচলিত সে-সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলব।

এ-ব্যাপারে একটা কথা তোমাদের জানার ইচ্ছে হতে পারে যে, এই সপ্তাহের ধারণাটা পৃথিবীতে চালু হল কেমন করে? আর বারের নাম এমন কেমন করে হল? ঠিক কীভাবে এবং কেমন করে এটা এল সে-ব্যাপারে একটু সংশয় আছে। তবে যতদূর মনে হয় ব্যাবিলনের মানুষেরা সাত সংখ্যাটিকে খুব পবিত্র বলে মনে করতেন। ইহুদিরা আবার এই পবিত্র সাত সংখ্যাটির সঙ্গে সাতটি জ্যোতিষ্কের সম্পর্কের কথা চিন্তা করতেন; যেমন সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। আর কীভাবে নামগুলো এল তা তোমরা নিচে দেখে বুঝতে পারবে।

Sun	Sun's Day	Sunday
Moon	Moon's Day	Monday
Mars	Tiw's Day	Tuesday
Mercury	Weden's Day	Wednesday
Venus	Frigg's Day	Friday
Saturn	Saturn's Day	Saturday

মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৪২০০ বছর আগে মিশরদেশে ক্যালেন্ডার প্রথম তৈরি হয়েছিল। ৩৬৫ দিনে বছর ধরা হল, আর ৩০ দিনে মাস এবং বারো মাসে বছর—এই একটা সোজা হিসেব তাঁরা করেছিলেন। এতে ৫টা দিন যে কম পড়ল সেটাকে মাসের মধ্যে না বলে তাকে আমোদ-আহ্লাদের দিন বলে আলাদা করে রাখলেন। অতি উজ্জ্বল তারা লুব্ধককে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে তাঁরা দেখলেন যে সূর্য আকাশপথে নির্দিষ্ট কক্ষপথ সম্পূর্ণ করে ৩৬৫ দিনে নয়, আরও ৬ ঘণ্টা দেরিতে।

রোমদেশে যে ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল, তা এক জগাখিচুড়ি। জুলিয়স সিজর মিশরে গিয়ে দেখলেন যে সেদেশের ক্যালেন্ডার অনেক উন্নত ধরনের। তিনি ফিরে এসে নিজের দেশে ঐ মিশরীয় ক্যালেন্ডার চালু করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সোজা হল না।

রোমকরা বিজেতা আর মিশরীয়েরা বিজিত, বিজিতদের সবকিছু নিলে বিজেতার সম্মানহানি ঘটবে যে! অতএব গোঁজামিল দেওয়া চলল। জুলিয়স সিজরের নাম অনুসারে একটা মাসের নতুন নামকরণ হল জুলাই। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, তাঁর নামের মাস সবচেয়ে বড় হওয়া চাই, অতএব জুলাই মাস হল ৩১ দিনে, আগে তা ছিল ৩০ দিনে। সিজরের পর এলেন অগাস্টস, তিনি হুকুম দিলেন : আমার নামেও একটা মাস থাকতে হবে, আর আমি কি সিজরের চেয়ে ছোট, সে-মাসটাও হবে ৩১ দিনে। তাই হল—সে-মাসটাও আগে ছিল ৩০ দিনে। সম্রাট দুজনের খেয়াল চরিতার্থে দুটো দিন যখন বাড়াতে হল, তখন সেই দুটো দিন তো কোথাও থেকে ছাঁটাই করতে হয়। কোন্ মাসের গায়ে আঘাতটা হানা যায়? বেচারা ফেব্রুয়ারি—কোনো দেবতার সঙ্গে এই মাসটাকে উৎসর্গ করা হয়নি। কাটো তার থেকে দুটো দিন। তাই হল। ফেব্রুয়ারি জবাই হল। রোমকরা বছরের হিসেবটা নিলেন মিশরীয়দের কাছ থেকে, তার মধ্যে গুঁজে দিলেন নিজেদের তৈরি মাসগুলো। এর আগে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বছরের আরম্ভ দিন ১ মার্চ থেকে ১ জানুয়ারিতে এসে গেছে।

এইরকম চলতে লাগল। কয়েক শতাব্দী ধরে চলল। এর মধ্যে দেখা গেল, সৌরবছর ঠিক ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় নয়—৩৬৫.২৪২২ দিনে। বছর ভুল হতে লাগল .০০৭৮ দিনে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রোম দেশের জ্যোতির্বিদদের এ বিষয়ে টনক নড়ল। তখন ভুলটা একটু একটু করে জমে কয়েকটা দিনে

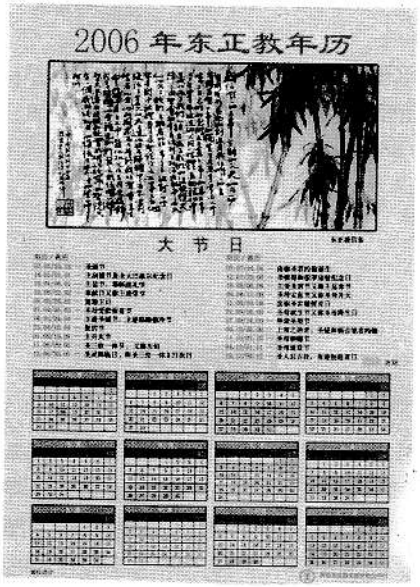

গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা পোপ গ্রেগরিকে ধরে বললেন, এর একটা বিহিত করতে হবে। এই পোপ ছিলেন বেশ একজন জবরদস্ত ব্যক্তি। তিনি এক হুকুমনামা জারি করলেন : ঐ বছরের ৫ অক্টোবরকে ধরতে হবে ১৫ অক্টোবর। এতে প্রথম প্রথম কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। যে ছেলে ৩ অক্টোবরে জন্মাল, ২ দিন পরে তার বয়স গিয়ে দাঁড়াল ১২ দিন। কিছুদিনের মধ্যে এসব গা-সওয়া হয়ে গেল। এতে অধিবর্ষ-এর হিসাবটা একটু বদলে গেল। এখন ঠিক করা হল, আর শুধু চার বছরে একটা দিন বাড়ালে চলবে না—যে শতাব্দীর শেষ সংখ্যায় ০০ থাকবে, তাকে যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, তবে সেটাকে অধিবর্ষ ধরা হবে, না মিললে তাকে অধিবর্ষ ধরা হবে না। অর্থাৎ ১৮০০, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অধিবর্ষ থাকবে না, কিন্তু ২০০০ খ্রিস্টাব্দে থাকবে। এতেও খুব সামান্য ভুল থেকে যাবে, সেটা দাঁড়াবে একটা দিনে ৩৩০০ বছর পরে। সে-কথা এখন না-ভাবলেও চলবে।

আগের ক্যালেন্ডারের নাম ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। এই নতুন ক্যালেন্ডারকে বলা হয় গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার। আজ এই গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত রয়েছে। ইংরেজরা ভারতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও রাজকার্যে এই ক্যালেন্ডারের চলন হয়েছে এবং আজও চালু আছে। তোমরা যে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছ তা হল এই গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার।

এটা এখন ১৪১৪ বাংলা সাল। ১৪১৪ বছর আগে ভারতের বা বাংলাদেশের কোনো নৃপতি কি এই সালটা চালু করে গিয়েছিলেন? মোটেই তা নয়। এর ইতিহাসটা বড় মজার। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই হযরত মহম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন। সেই দিনটাকে ধরে মুসলমানেরা একটা বছর আরম্ভ করলেন, তার নাম হল হিজরি। সেটা চান্দ্রবছর, অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে, আর তাই সৌরবছরের সঙ্গে তা মাপ হল না; বছর প্রায় ১১ দিন করে পিছু হঠতে থাকল। মুসলমানরা এদেশে এলেন, তাঁদের রাজকার্যে হিজরি সালই চলতে লাগল। সম্রাট আকবর বললেন : এতে বড়ই অসুবিধা হচ্ছে, ফসল কাটার পরই প্রজারা খাজনা দেয়; তার সঙ্গে বছরের কোনো যোগসূত্র থাকছে না,

অতএব বছরের সঙ্গে অধিক মাস বা মল মাসের হিসেবটাও নেওয়া প্রয়োজন। হিজরি যেমন চলছিল তেমনি চলল, মল মাস যোগ করে যেটা দাঁড়াল সেটাই বাংলায় গৃহীত হল; আর সেইটাই হল আজকের বাংলা সাল।

একটা কথা তোমাদের এখানে বলি : পোপ গ্রেগরি ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন, ইউরোপের অনেক দেশ সেটা গ্রহণ করে, কিন্তু ইংল্যান্ডে এই গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার চালু হয়েছিল এর ১৭০ বছর পরে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে।

স্ফিঙ্কস

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ও সংস্কৃতি-স্থাপত্যের পীঠস্থান মিসরের স্ফিঙ্কস এক অনন্য কীর্তি। মানবীয় মাথা ও সিংহীর দেহবিশিষ্ট বিরাটকায় স্ফিঙ্কস প্রাচীন মিসরীয়দের মরু ও মৃতের দেবতা। প্রাচীন মিসরীয়রা বিশ্বাস করত যে, কবরস্থান এই দেবতার হেফাজতে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের রূপকথায় আছে, সে পর্যটকদের ধাঁধা ধরত, উত্তর দিতে না পারলে তাদের মেরে ফেলত।

৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বে মিসরের উত্তরাঞ্চলে কায়রোর অদূরে সিজে নামক স্থানে তার একটি বিশাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাথর কেটে কেটে তৈরি স্ফিঙ্কস পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি। উচ্চতায় ছেষট্টি ফুট ও দৈর্ঘ্যে একশ উননব্বই ফুট। কেফরেনের পিরামিডের প্রবেশপথে এই মূর্তি স্থাপিত। সিংহের শরীর ও মানুষের মস্তক এই সঙ্কর মূর্তি কেফরেন তাঁরই জ্ঞান ও শক্তির প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন। কেফরেনের তৈরি স্ফিঙ্কস কয়েকশ বছর পর বালিঝড়ের কবলে পড়ে বালির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে মানুষ তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। অবশেষে এক রাজকুমার (টুথমোসিস) স্ফিঙ্কসকে উদ্ধার করেন। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। একদিন এক রাজকুমার পথ দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে একটি বালির স্তূপের ছায়ায় বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল গম্ভীর গলায় কে যেন তাঁকে বলছে, শোনো রাজকুমার, আমি স্ফিঙ্কস বলছি, ওঠো, দ্যাখো, কীরকম বালির নিচে চাপা পড়ে আছি, তুমি যদি আমায় উদ্ধার করো তাহলে তুমি রাজা হবে। অবাক রাজকুমার, চোখ মেলে দেখলেন তাঁর পাশে কেউ নেই। বেশ খানিকটা বালি সরিয়ে দেখলেন, যাকে তিনি বালির স্তূপ মনে করেছিলেন সেখানে পাথর দেখা যাচ্ছে। সেই রাজকুমারই, চতুর্থ টুথমোসিস স্ফিঙ্কসকে মুক্ত করেছিলেন, আর এই কাহিনীটি একটি পাথরের উপর খোদাই করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

একটি ফুটবল ম্যাচ

গোলটা আমিই দিয়েছি। এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওদের—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্‌হিপ্‌ হুররে! এখন আমাকে ঘাড়ে করে নাচা উচিত ছিল সকলের। পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভীমনাগের দোকানে কিংবা দিলখোস রেস্তোরাঁয়। কিন্তু তার বদলে একদল পিনপিনে বিতিকিচ্ছি মশার কামড় খাচ্ছি আমি। চটাস করে মশা মারতে গিয়ে নিজের নাকেই লেগে গেল একটা রাম থাপ্পড়। একটু উঁ অঁ করে কাঁদব তারও উপায় নেই। প্যাঁচপেঁচে কাদার ভেতরে কচুবনের আড়ালে মূর্তিমান কানাই সেজে বসে আছি, আর আমার চারিদিকে মশার বাঁশি বাজছে।

থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম। আবার চিৎকার শোনা গেল। একটা মশা পটাস করে হুল ফোটাল ডান গালে। ধাঁ করে চাঁটি হাঁকালুম—নিজের চড়ে নিজেরই মাথা ঘুরে গেল। অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবুও কখনো এমন চড় হাঁকড়েছেন বলে মনে পড়ল না।

গেছি গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপ-বাপ করে সামলে নিলুম। দমদমার এই কচুবনে আপাতত আরো ঘণ্টাখানেক আমার মৌনতার সাধনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই আমার।

চিৎকারটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে : থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ—হিপ হুররে!

আমি পটলডাঙ্গার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসক পাতার রস খাই। কিন্তু পটলডাঙা ছেড়ে শেষে এই দমদমার কচুবনে আমার পটল তোলবার জো হবে—এ কথা কে জানত!

আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ফুটবল ক্লাবের আমি একজন উৎসাহী সদস্য। নিজে কখনো খেলি

না, তবে সব সময়েই খেলোয়াড়দের প্রেরণা দিয়ে থাকি। আমাদের ক্লাব কোনো খেলায় গোল দিলে সাত দিন আমার গলাভাঙা সারে না। হঠাৎ যদি কোনো খেলায় জিতে যায়—যা প্রায় কোনো দিনই হয় না—তাহলে আনন্দের চোটে আমার কম্প দিয়ে পালাজ্বর আসে।

সদস্য হয়েই ছিলুম ভালো। গোলমাল বাঁধল খেলোয়াড় হতে গিয়ে।

দমদমার ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ। তিনদিন আগে থেকে ছোটদির ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে আমি ধ্রুপদ গাইতে চেষ্টা করছি। গান গাইবার জন্যে নয়—খেলার মাঠে যাতে সারাক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে যেতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘর থেকে মেজদা যখন বড় একটা ডাক্তারির বই নিয়ে তেড়ে এল, তারপরেই বন্ধ করতে হল গানটা।

কিন্তু দমদমে পৌঁছেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনা গেল।

আমাদের দুই জাঁদরেল খেলোয়াড় ভন্টু আর ঘন্টু দুই ভাই। দুজনেই মুগুর ভাঁজে আর দমাদ্দম ব্যাকে খেলে। বলের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় অন্য দলের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে। আজ পর্যন্ত দুজনে যে কত লোকের ঠ্যাং ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবেরই ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাংই একসঙ্গে।

কাশীতে ওদের কুট্টিমামা থাকে। তা থাক—কাশি সর্দি পালাজ্বর—যেখান খুশি থাক। কিন্তু কুট্টিমামা কি আর বিয়ে করার দিন পেল না? ঠিক আজ দুপুরেই টেলিগ্রামটা এসে হাজির। আর বিশ্বাসঘাতক ভন্টু আর ঘন্টু সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে থান্ডার ক্লাবকে যেন দুটো আন্ডারকাট ঘুসি মেরে চিৎ করে ফেলে দিয়ে গেল!

দলের ক্যাপ্টেন পটলডাঙার টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে উঠল।—মামার বিয়ের খ্যাট গেলবার লোভ সামলাতে পারলে না। ছোঃ! নরাধম—লোভী—কাপুরুষ। ছোঃ!

গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবের সদস্যেরা তখন বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে সবাই। ভন্টু ঘন্টু নেই—এখন কে বাঁচাবে ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের হাত থেকে? ওদের দুঁদে ফরোয়ার্ড ন্যাড়া মিত্তির দারুণ ট্যারা। আমাদের গোলকিপার গোবরা আবার ট্যারা দেখলে বেজায় ভেবড়ে যায়—কোন দিক থেকে যে বল আসবে ঠাহর করতে পারে না। ওই ট্যারা ন্যাড়াই হয়ত একগণ্ডা গোল ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে।

এখন উপায়?

টেনিদার ছোকরা চাকর ভজুয়া গিয়েছিল সঙ্গে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা—মারামারি বাধলে কাজে লাগবে মনে করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিদা কটমট করে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ভজুয়া—ব্যাকে খেলতে পারবি?

ভজুয়া খৈনি টিপছিল। টপ করে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে নিয়ে বললে, সেটা ফির কি আছেন ছোটবাবু?

পায়ের কাছে বল আসবে—ধাই করে মেরে দিবি। পারবি না?

হাঁ। খুব পারবে। বল ভি মারিয়ে দিবে—আদমি ভি মারিয়ে দিবে।—ভজুয়ার চোখে মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ।

না না, আদমিকে মারিয়ে দিতে হবে না। শুধু বল মারলেই হবে। পারবি তো ঠিক?

কেনো পারবে না? কাল রাস্তামে একঠো কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আইল তো মারিয়ে দিলাম একঠো জোরসে লাথি। একঠা লরি যাইতেছিল—লাথ্ খাইয়ে একদম উস্‌কো উপর চড়িয়ে গেল। বাস্—সিধা হাওড়া টিশন।

থাম থাম—মেলা বকিস নি—টেনিদা একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : একটা ব্যাক তো পাওয়া গেল!

আর একটা—আর একটা—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ওপরে ;—ঠিক হয়েছে। প্যালাই খেলবে।

আমি!

একটা চীনেবাদাম চিবুতে যাচ্ছিলাম, সেটা গিয়ে গলায় আটকালো।

কেন—তুই তো বলেছিলি, শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে কাদের নাকি তিনটে গোল দিয়েছিলি একাই? সে সব বুঝি স্রেফ গুলপট্টি?

গুলপট্টি তো নির্ঘাৎ। চাটুজ্জেদের রকে বসে তেলে-ভাজা খেতে খেতে সবাই দুটো-চারটে গুল দেয়, আমিও ঝেড়েছিলুম একটা। কিন্তু যে টেনিদা দুবার ম্যাট্রিকে গাড্ডা খেয়েছে, তার মেমোরি এত ভালো কে জানত?

বাদামটা গিলে ফেলে আমি বললুম, না না, গুলপট্টি হবে কেন! পালাজ্বরে কাহিল করে দিয়েছে—নইলে এতদিনে আমি মোহনবাগানে খেলতুম, তা জানো? এখন দৌড়োতে গেলে পিলেটা একটু নড়ে—এই যা অসুবিধে।

পিলেই তো নড়াবি। পিলে নড়লে তোর পালাজ্বরও সরে পড়বে—এই বলে দিলুম। নে—নেমে পড়—

ফুর্—র্—র্—র্—

রেফারির বাঁশির আওয়াজ। আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই এক ধাক্কায় টেনিদা আমাকে ছিটকে দিলে মাঠের ভেতরে। পড়তে পড়তে সামলে নিলুম। ভেবে দেখলুম, গোলমাল বেশি বাড়ানোর চাইতে দু-একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করাই ভালো।

যা থাকে কপালে! আজ প্যালারামেরই একদিন কি পালাজ্বরেরই একদিন!

খেলা শুরু হল।

ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলুম ভজুয়া একাই ম্যানেজ করবে—কিন্তু দেখা গেল, মুখ ছাড়া আর

কোনো পুঁজিই ওর নেই। একটা বল পায়ের কাছে আসতেই রাম শট হাঁকড়ে দিলে। কিন্তু বলে পা লাগল না—উলটে ধড়াস করে শুকনো মাঠে একটা আছাড় খেল ভজুয়া। ভাগ্যিস গোলকিপার গোবরা তক্কে তক্কে ছিল—নইলে ঢুকেছিল আর কি একখানা!

হাই কিক্ দিয়ে গোবরা বলটাকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিলে। রাইট আউট হাবুল সেন বলটা নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটল—ফাঁড়া কাটল এ যাত্রা।

কিন্তু ফুটবল মাঠে সুখ আর কতক্ষণ কপালে থাকে! পরক্ষণেই দেখি বল দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসছে আমাদের দিকে—আর নিয়ে আসছে ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির।

ভজুয়া বোঁ বোঁ করে ছুটল—কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে ছুঁতেও পারল না। খুট করে ন্যাড়া পাশ কাটিয়ে নিলে, ভজুয়া একেবারে লাইন টপকে গিয়ে পড়ল লাইনস্‌ম্যান ক্যাবলার ঘাড়ে।

কিন্তু ভজুয়ার যা খুশি হোক—আমার তো শিরে সংক্রান্তি। এখন আমি ছাড়া ন্যাড়া মিত্তির আর গোলকিপার গোবরার ভেতরে আর কেউ নেই! আর গোবরাকে তো জানি। ন্যাড়ার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—কোন দিক দিয়ে বল যে গোলে ঢুকছে টেরও পাবে না।

চার্জ! চার্জ!—সেন্টার হাফ টেনিদার চিৎকার : প্যালা, চার্জ—

জয় মা কালী! এমনিও গেছি—অমনিও গেছি! দিলুম পা ছুড়ে! কিমাশ্চর্যম্! ন্যাড়া মিত্তির বোকার মতো দাঁড়িয়ে—বলটা সোজা ছুটে চলে গেছে হাবুল সেনের কাছে।

ব্রেভো, ব্রেভো প্যালা!—চারদিক থেকে চিৎকার উঠল : ওয়েল সেভ্‌ড!

তাহলে সত্যিই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি! আমি পটলডাঙার প্যালারাম, ছেলেবেলায় টেনিস বল ছাড়া যে কখনো পা দিয়ে ফুটবল ছোঁয়নি—সেই আমি ঠেকিয়েছি দুর্ধর্ষ ন্যাড়া মিত্তিরকে! আমার চব্বিশ ইঞ্চি বুক গর্বে ফুলে উঠল। মনে হল, ফুটবল খেলাটা কিছুই নয়। ইচ্ছে করে এতদিন খেলি নি বলেই মোহনবাগানে চান্স পাই নি।

কিন্তু আবার যে ন্যাড়া মিত্তির আসছে! ওর পায়ে কি চুম্বক আছে! সব বল কি ওর পায়ে গিয়ে লাগবে?

দুবার অপদস্থ হয়ে ভজুয়া ক্ষেপে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে চার্জ করল। কিন্তু রুখতে পারল না। তবু এবারেও গোল বাঁচল। তবে গোবরা নয়—একরাশ গোবর। ঠিক সময়মতো তাতে পা পিছলে পড়ে গেল ন্যাড়া মিত্তির, আর আমি ধাই করে শট মেরে ক্লিয়ার করে দিলুম। ওদের লেফট্ আউটের পায়ে লেগে থ্রো হয়ে গেল সেটা।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাবের চিৎকার সমানে শুনছি : ব্রেভো প্যালা—সাবাস! আরে, আবার যে বল আসে! আমাদের ফরোয়ার্ডগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? গেল গেল করতে করতে ওদের বেঁটে রাইট ইনটা শট করলে—আমার পায়ের তলা দিয়ে বল উড়ে গেল গোলের দিকে।

গো—ও—ও—

ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের চিৎকার। কিন্তু 'ওল' আর নয়, স্রেফ কচু। অর্থাৎ বল তখন পোস্ট ঘেঁসে কচুবনে অন্তর্ধান করেছে।

গোল কিক্।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা কাণ্ড করেছে ভজুয়া। বলকে তাড়া করে গিয়ে শট করে দিয়েছে গোলপোস্টের গায়ে। আর তার পরেই আঁই আঁই করতে করতে বসে পড়েছে পা চেপে ধরে।

ভজুয়া ইনজিওর্ড! ধরাধরি করে দু তিনজন তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আপদ গেল! যা খেলছিল—পারলে আমিই ওকে ল্যাং মেরে দিতুম। গোলপোস্টটাই আমার হয়ে কাজ

সেরে দিয়েছে। কিন্তু এখন যে আমি একেবারে একা! 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়—!' এলোপাথাড়ি কাটল কিছুক্ষণ। ভগবান ভরসা—আমাকে আর বল ছুঁতে হল না। গোটাদুই গোবরা এগিয়ে এসে লুফে নিলে, গোটাতিনেক সামলে নিলে হাফ-ব্যাকেরা। তারপর হাফটাইমের বাঁশি বাজল।

আঃ—কোনোমতে ফাঁড়া কাটল এ পর্যন্ত। বাকি সময়টুকু সামলে নিতে পারলে হয়!

পেটের পিলেটা একটু টনটন করছে—বুকের ভেতরও খানিকটা ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছি। কিন্তু চারদিক থেকে তখন থান্ডার ক্লাবের অভ্যর্থনা : বেড়ে খেলছিস প্যালা, সাবাস! এমন কি ক্যাপ্টেন টেনিদা পর্যন্ত আমার পিঠ থাবড়ে দিলে :

তুই দেখছি রেগুলার ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার! নাঃ—এবার থেকে তোকে চান্স দিতেই হবে দু একবার!

এতে আর কার পিলেটিলের কথা মনে থাকে? বিজয়গর্বে দু গ্লাস লেবুর সরবৎ খেয়ে নিলুম। শুধু ভজুয়া কিছু খেল না—পায়ে একটা ফেটি বেঁধে বসে রইল গোঁজ হয়ে। টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, শুধু এক-নম্বরের বাক্যি-নরেশ! এক লাথ্‌সে কুত্তাকো লরিমে চড়া দিয়া! তবু একটা বল ছুঁতে পারলে না—ছোঃ—ছোঃ?

ভজুয়া দুচোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার খেলা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভজুয়া আবার নামল মাঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, দেখিয়ে প্যালা বাবু—ইস্ দফে হাম মার ডালেঙ্গে!

ভজুয়ার চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সর্বনাশ—আমাকে নয় তো?

সে কী রে! কাকে?

দেখিয়ে না—

কিন্তু আবার সে আসছে! 'ওই আসে—ওই অতি ভৈরব হরষে'! আর কে? সেই ন্যাড়া মিত্তির! ট্যারা চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! এবার গোল না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না!

ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল ভজুয়া। তারপরই 'বাপ' বলে এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! বল ছেড়ে

ন্যাড়া মিত্তিরের পাঁজরায় লাথি মেরেছে ভজুয়া, আর ন্যাড়া মিত্তির ঝেড়েছে ভজুয়ার মুখে এক বোম্বাই ঘুসি। তারপর দুজনেই ফ্ল্যাট এবং দুজনেই অজ্ঞান। ভজুয়া প্রতিশোধ নিয়েছে বটে, কিন্তু এটা জানত না যে ন্যাড়া মিত্তির নিয়মিত বক্সিং লড়ে।

মিনিট তিনেক খেলা বন্ধ। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাব আর দমদম ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের মধ্যে একটা মাঝারি ঝগড়া প্রায় বেধে উঠেছিল—দু চারজন ভদ্রলোক মাঝখানে নেমে পড়ে থামিয়ে দিলেন। ফের খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ভজুয়া আর ফিরল না—ন্যাড়া মিত্তিরও না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ন্যাড়া বেরিয়ে যাওয়াতে দলের কোমর ভেঙে গেছে ওদের। তবু হাল ছাড়ে না ভ্যাগাবন্ড ক্লাব। বারবার তেড়ে আসছে। আর, কী হতচ্ছাড়া ওই বেঁটে রাইট-ইনটা!

অফ সাইড। রেফারির হুইসল। আর একটা ফাঁড়া কাটল।

পটলডাঙা ক্লাবের হাফ-ব্যাকেরা এতক্ষণে যেন একটু দাঁড়াতে পেরেছে। আমার পা পর্যন্ত আর বল আসছে না। খেলার প্রায় মিনিট তিনেক বাকি। এইটুকু কোনোমতে কাটাতে পারলেই মানে মানে বেঁচে যাই—পটলডাঙার প্যালারাম বীরদর্পে ফিরতে পারে পটলডাঙায়।

এই রে! আবার সেই বেঁটেটা! কখন চলে এসেছে কে জানে! এ যে ন্যাড়া মিত্তিরের ওপরেও এককাঠি! নেংটি ইঁদুরের মতো বল মুখে করে দৌড়াতে থাকে! আমি কাছে এগোবার আগেই বেঁটে কিক করেছে। ডাইভ করে বলটা ধরতে পারলে না গোবরা—তবু এবারেও বল পোস্ট ঘেঁসে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে যে গোবরটা কাত করেছিল—সেটা এবার আমায় চিৎ করল। একখানা পেল্লায় আছাড় খেয়ে যখন উঠে পড়লুম তখন পেটের পিলেটায় সাইক্লোন হচ্ছে। মাথার ভেতরে যেন একটা নাগরদোলা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। মনে হচ্ছে, কম্প দিয়ে পালাজ্বর এল বুঝি!

আর এক মিনিট। আর এক মিনিট খেলা বাকি। রেফারি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ড্র যাবে নির্ঘাৎ। যা খুশি হোক—আমি এখন মাঠ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি! আমার এখন নাভিশ্বাস! গোবরে আছাড় খেলে মাথা এমন বোঁ বোঁ করে ঘোরে কে জানত!

গোল-কিক।

আবছাভাবে গোবরার গলা শুনতে পেলুম : কিক কর, প্যালা—

শেষের বাঁশি প্রায় বাজল। চোখে ধোঁয়া দেখছি আমি। এইবার প্রাণ খুলে কিক করব আমি! মোক্ষম কিক! জয় মা কালী—

প্রাণপণে কিক্ করলুম। গো—ও-ওল—গো—ও-ও-ল—! চিৎকারে আকাশ ফাটার উপক্রম! প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এত জোরে কি শট মেরেছি যে আমাদের গোললাইন থেকেই ওদের গোলকিপারকে ঘায়েল করে দিয়েছি?

কিন্তু সত্যদর্শন হল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। গোবরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোলের নেটের ভেতরেই বলটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন আমার কীর্তি দেখে বলটাও হতভম্ব হয়ে গেছে। তারপর?

তারপর খেলার মাঠ থেকে এক মাইল দূরের এই কচুবনে কানাই হয়ে বসে আছি। দূর থেকে এখনো ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের চিৎকার আসছে :

থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—

হিপ হিপ হুররে!

আবু জাফর মো. মোসলেহ উদ্দিন

মাংস

পৃথিবীতে যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটে তখন তারা শুধুমাত্র ফলমূল বা উদ্ভিদজাত খাবার খেয়েই জীবনধারণ করত। কারণ অতি সহজেই বন-জঙ্গল থেকে এসব সংগ্রহ করা যেত। একই সঙ্গে তাদের আগ্রহ ছিল বনের পশুপাখির দিকেও। তারা এসব শিকার করে তাদের মাংস খেয়ে জীবন বাঁচাত, তাই একই সঙ্গে তারা হয়ে উঠেছিল মাংসভোজী।

বনের হিংস্র পশু শিকার করা সহজ কাজ নয়। তাই এ-কাজকে কিছুটা সহজ করতে সচেষ্ট হল তারা। শিখল নানান অস্ত্র তৈরি করতে। বড়-বড় জীবজন্তু একা-একা শিকার করা সম্ভব নয়। তাই অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে তা শিকার করত। আর এভাবেই মাংসভোজী হতে গিয়ে মানুষ শিখল মিলেমিশে বাস করতে—যার ফলে গড়ে উঠল 'সমাজ'।

পরবর্তীকালে মানুষ কিছু-কিছু জীবজন্তু পোষ মানাতে শুরু করে। সর্বপ্রথম পোষ মানে কুকুর। কুকুর দিয়ে বিভিন্ন প্রাণী শিকার করা যায়। এরপরে একে-একে ঘোড়া, শূকর, গরু, ভেড়া প্রভৃতি মানুষের পোষাপ্রাণীর তালিকায় এসে যায়। এসব প্রাণীর মাংস তখন তারা আহার করত। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ কাঁচা মাংসই খেত কিন্তু আগুন আবিষ্কার হবার পর তারা আগুনে ঝলসানো মাংস খাওয়া শুরু করল। এভাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটে।

এরপর মানুষ কৃষিকাজের দিকে মনোযোগ দেয়, কারণ তাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পর্যাপ্ত মাংস

পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কৃষি থেকে খাদ্যের প্রধান অংশ এলেও মানুষের খাদ্য-তালিকায় একটা উল্লেখযোগ্য অবস্থান আছে এই মাংসের।

এতক্ষণ যা বললাম তা হল মাংসের ঐতিহাসিক অবস্থান। বর্তমান যুগেও আমরা বেশ মজা করে মাংস খেয়ে থাকি। সুস্বাদু, রুচিকর, আকর্ষণীয় গন্ধযুক্ত এবং সহজে সেদ্ধ বা রান্না হওয়ার কারণে ছেলে-বুড়ো সকলেরই প্রিয় খাবার এই মাংস।

মাংসের মধ্যে কী কী খাদ্য-উপাদান আছে, দেখা যাক এবারে। চর্বিহীন মাংসে (Lean meat) থাকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পানি আর বিশভাগ প্রোটিন। বুঝতেই পারছ মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ কত বেশি। আসলে প্রোটিনের উৎসগুলোর মধ্যে মাংসের স্থানই শীর্ষে। শুধু-যে পরিমাণে বেশি তা-ই নয়, গুণের দিক থেকেও মাংসের প্রোটিন খুবই উন্নতমানের। তোমরা হয়তো জানো, বিভিন্ন অ্যামাইনো এসিড দ্বারা প্রোটিন গঠিত। মানুষের জন্য যেসব অ্যামাইনো এসিড অত্যাবশ্যক, তার সবগুলোই এই মাংসে বিদ্যমান। এছাড়াও সেসব অ্যামাইনো এসিড মাংসে পাওয়া যায় যেগুলো উদ্ভিদজাত প্রোটিনে (যেমন ডালজাতীয় খাবার) হয় নেই কিংবা খুবই কম পরিমাণে থাকে। চার আউন্স মাংসে প্রায় বিশ গ্রাম প্রোটিন আছে—যা পেতে হলে দরকার তিনটে বড়-বড় ডিম কিংবা আড়াই কাপ দুধ। সাধারণ রান্নায় মাংসের প্রোটিন নষ্ট হয় না।

খনিজ লবণের মধ্যে লোহা ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। কপারের পরিমাণও খুব একটা কম নয়। অবশ্য মাংসের চেয়ে কলিজায় লোহা ও কপারের পরিমাণ খুব বেশি। অন্যান্য খনিজ লবণও কিছু-কিছু থাকে তবে পরিমাণে অল্প। মাংসে কোনো ক্যালশিয়াম থাকে না, কারণ ক্যালশিয়াম থাকে হাড়ে। অবশ্য নরম হাড় চিবুলে আমরা ক্যালশিয়াম পাব।

চর্বির পরিমাণ মাংসে শতকরা দশ থেকে চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। চর্বি মাংসের স্বাদ বাড়ায়। এছাড়া দেহের জন্য অত্যাবশ্যক ফ্যাটি এসিডও যোগান দেয়। তবে বেশি চর্বি হলে অনেক সময় অনেকের হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। মাংসে শর্করার পরিমাণও খুবই কম। অবশ্য কলিজায় শর্করা 'গ্লাইকোজেন'রূপে সঞ্চিত থাকে।

মাংসে বি-ভিটামিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে। থায়ামিন, বিরোফ্লাভিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিজায় ও কিডনিতে এসবের পরিমাণ আরও বেশি। অবশ্য বি-ভিটামিন ছাড়াও ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' পাওয়া যায় প্রচুর। চার আউন্স মাংসে প্রায় তিন পাউন্ড বাটারের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মোটামুটি চার আউন্স মাংস নিয়মিত খাওয়াই যথেষ্ট। তবে তার মানে এই নয় এটুকুই তার ক্ষুধা দূর করবে। বরং যেহেতু মাংস খুব দামি তাই কারুর টাকা না-থাকলে অন্য কোনো উৎস থেকেও প্রোটিন সংগ্রহ করতে পারে। চার আউন্সের বেশি মাংস খেলে তার কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই যদি তার চর্বির পরিমাণ হজমে ব্যাঘাত না ঘটায়। তবে সুষম খাবারে শুধুমাত্র মাংস থাকা উচিত নয়।

রত্নদ্বীপ আজও আছে

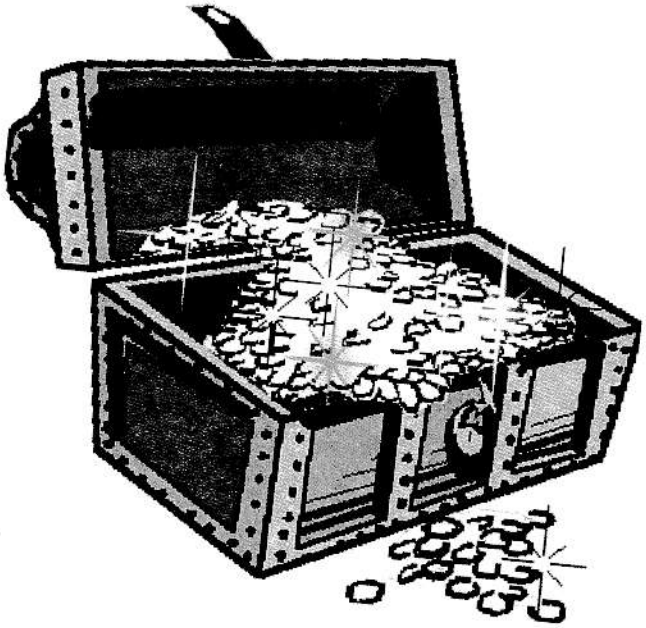

পৃথিবীতে গুপ্তধন সম্বন্ধে যত রসালো কাহিনী চালু আছে, তার মধ্যে এক কোকোস আয়ল্যান্ডকে নিয়েই গড়ে উঠেছে রোমাঞ্চকর সব ঘটনা। গবেষকদের মতে ওটা হল গুপ্তধনের খনি—আসলে ওটাকে বলা উচিত রত্নদ্বীপ। এর একমাত্র কারণ হল, কুখ্যাত সব জলদস্যু কোনো-না-কোনো সময়ে ওই দ্বীপে এসে তাদের লুট-করা ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। সারা পৃথিবীতে ওই দ্বীপের গুপ্তধন সম্বন্ধে কত-যে মূল-নকশা ছড়িয়ে আছে, তার হিসেব নেই।

ওই দ্বীপটা কোস্টারিকা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, মূল ভূখণ্ড থেকে সাড়ে চারশো মাইল দূরে। ওখানকার আবহাওয়া উষ্ণ, গুপ্তধনের সন্ধান করাটাও সেখানে রীতিমতো ব্যয়বহুল। গুপ্তধনের খোঁজ করতে গেলে প্রথমেই দরকার কোস্টারিকা সরকারের অনুমতিপত্র। প্রত্যেক অভিযানে ভাড়া করতে হবে কোস্টারিকার সেনাবাহিনীর লোক, তাদের সংখ্যা নির্ভর করে অভিযাত্রীদলের লোকসংখ্যার ওপর। দলে-দলে এত মানুষ গুপ্তধনের খোঁজে ওখানে আসে যে, শুধুমাত্র অনুমতিপত্র থেকেই যা আদায় হয় তা দিয়েই কোস্টারিকা সরকারের রাজস্বখাতের অনেকটা চাহিদা মেটে।

কোকোস দ্বীপে অনেক জলদস্যুই যে অবতরণ করেছিল এ-বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তারা একটামাত্র কারণেই বেছে নিয়েছিল ওই দ্বীপটাকে। সমুদ্রে সাধারণত যেসব খাঁড়ি দেখা যায়, এখানকার খাঁড়িগুলো তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, অনেকটা ভেতরে। ফলে টহলদারি-কোনো যুদ্ধজাহাজের নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। ওই খাঁড়ির ভেতরে জাহাজ ঢুকিয়ে লুণ্ঠিত দৌলত মাটির তলায় লুকিয়ে রাখার চমৎকার সুযোগ। যে-সময়কার কথা বলা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ছিল জলদস্যুদের স্বর্ণযুগ।

ওই দ্বীপের আরও বৈশিষ্ট্য হল গভীর জঙ্গল, পাহাড়, শত শত গুহা—জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখার পক্ষে যুৎসই। জোয়ারের সময় কঙ্করময় উপকূলের অনেকটা ডুবে যায়। শোনা যায়, কিছু জলদস্যু তাদের লুটের মাল ভাটার সময় মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, ফলে সমুদ্র তাদের গুপ্তধন লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। জোয়ার আর ভাটা, এই সময়টুকুর মধ্যেই গুপ্তধন-সন্ধানীদের খুঁজে বার করতে হবে নির্দিষ্ট স্থান, তারপর খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপার। এদিকে জায়গা খুঁজে বার করলেও জোয়ারের সময় তা ভেসে যায়, ভাটার সময় তার কোনো চিহ্নই থাকে না, ফলে আবার নতুন করে শুরু করতে হয় কাজ। চতুর জলদস্যুরা মতলবটা এঁটেছিল চমৎকার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কেউ গুপ্তধনের সন্ধান পেল তো ভালো, নতুবা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে খোঁজা আর খোঁড়া।

ইতিহাস বলে, ব্রিটিশ জাহাজ নিকোলাসের কাপ্তান জন ইটন, প্রথমদিকের যেসব জলদস্যু ওই দ্বীপে এসেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৬৮৫ সালে জাহাজের লগবুকে তার লেখা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি আর নারকেল বীথিকার কথা জানা যায়।

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর লে. জে. কলনেট ১৭৯৩ সালে পরিদর্শন করেছিলেন ওই দ্বীপ। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায় ওখানে সবচেয়ে অসুবিধে হল প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঘনঘন বজ্রপাত। বৃষ্টি এত প্রবল যে, মাত্র কয়েক হাত দূরের বস্তু পর্যন্ত দেখা যায় না। বড়-বড় ইঁদুরে দ্বীপ ভরতি, তারা নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। বছরের ন'মাস ওখানে বৃষ্টি। রাতারাতি গাছপালা বেড়ে দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা বদলে দেয়। অগভীর পানিতে পর্যন্ত নৌকো অনুসরণ করে হিংস্র হাঙরের দল।

কোকোস দ্বীপ হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যেত যদি-না পেরুর মুক্তিযুদ্ধের নেতা বলিভার (মতান্তরে জোসে ডিসান মার্টিন) ভেনেজুয়েলাতে স্পেনের আধিপত্য চূর্ণ করতেন। ১৮১৯ সালে বিদ্রোহীরা তাদের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠনের পর যাত্রা করল লিমা অভিমুখে। বিদ্রোহীরা শহরের কাছাকাছি পৌঁছলে, ধনী পেরুবাসীরা এবং ক্যাথলিক পুরোহিতসম্প্রদায় তাদের অগাধ ঐশ্বর্য সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করলেন। তাদের সম্মিলিত সোনা, জহরত এবং গির্জার ধনসম্পদের তখনকার মূল্য ছিল কয়েকশো কোটি ডলার। লিমাকে তখন বলা হত 'দ্য গোল্ডেন জুয়েল অভ দ্য ওয়েস্ট'। ওই শহরটা রাতারাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী শহরে পরিণত হল। নিরাপত্তার আশায় সবাই ওখানকার দুর্গে জমা দিল তাদের ধনসম্পদ। দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের সময় চিলির নৌবাহিনীর কমান্ডার লর্ড ডানডোনাল্ড বলেছিলেন, ১৮২১ সালের ১৯ আগস্ট লিমা এবং তার আশেপাশের সমস্ত ধনরত্ন জমা পড়েছিল ওই দুর্গে।

বলিভার কিংবা জোসে মুক্তিবাহিনী নিয়ে আরও এগিয়ে এলে রুপানিয়ার্ডরা বুঝতে পারল এমন সর্বাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করা দুর্গরক্ষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সঞ্চিত ধনসম্পদের অনেকটাই শহরের বাইরে নিয়ে পাহাড়ে গভীর গর্ত করে লুকিয়ে রাখা হল। এদিকে প্রায় ৩০ কোটি ডলার মূল্যের ধনসম্পদ স্পেনে নিয়ে যাবার জন্য ভাড়া করা হল একটি ব্রিটিশ জাহাজ। ওটার নাম 'মেরি ডিয়ার'। জাহাজের কাপ্তান টমসনের সততার খ্যাতি ছিল।

বন্দর ছাড়বার পরেই টমসন এবং তার নাবিকেরা বোম্বেটে বনে গেল। স্পেনের যে-কজন সশস্ত্র প্রহরী ওই জাহাজে ছিল, তাদের হত্যা করে জাহাজ নিয়ে তারা পালিয়ে গেল উত্তরে, কোকোস দ্বীপে। ওখানে ওয়েফার উপসাগরে জাহাজ থামিয়ে টমসন লুটের মাল দ্বীপের কোনো-এক জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখল।

স্পানিয়ার্ডরা পরে মেরি ডিয়ার জাহাজকে বন্দি করেছিল। টমসন আর ফার্স্ট মেট ছাড়া বাকি সবার ভাগ্যে জুটল ফাঁসির দড়ি। ওরা দুজন কথা দিয়েছিল লুকোনো সম্পদের সন্ধান দেবে, তাই

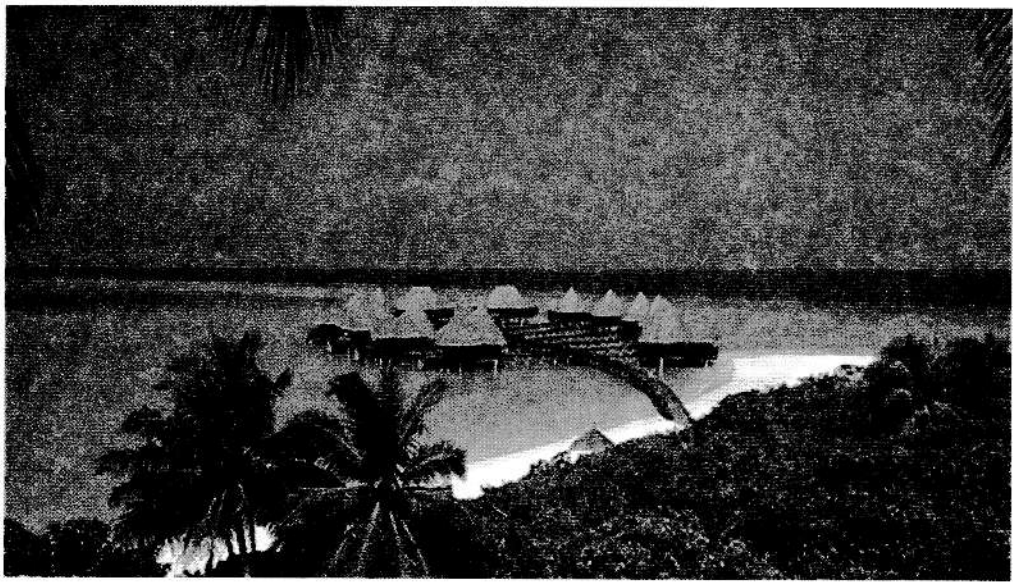

বাঁচিয়ে রাখা হল ওদের। জাহাজ কোকোস দ্বীপে নোঙর করা মাত্র ওরা ঝাঁপ দিল সমুদ্রে, তারপর সাঁতরে এগিয়ে চলল তীরের দিকে। জাহাজ থেকে ছোড়া বন্দুকের গুলি আর হাঙরের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে আশ্চর্যরকমভাবে ওরা পৌঁছে গেল দ্বীপে, গা-ঢাকা দিল গভীর জঙ্গলে। স্পানিয়ার্ডরা জাহাজ থেকে নেমে ওদের এবং গুপ্তধনের সন্ধানে তন্নতন্ন তল্লাশ চালাল, কিন্তু কোনোটারই খোঁজ পেল না তারা।

শোনা যায়, টমসন ফার্স্ট মেটকে খুন করে ওই দ্বীপ থেকে নোভা স্কটিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় সে নাকি তার নিকটতম আত্মীয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল গুপ্তধনের একটা নকশা। পরবর্তীকালে তার এক বংশধর জেমস এ. ফরবস কোকোস দ্বীপে লিমার সেই লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধারের আশায় কয়েকবারই অভিযান চালিয়েছিল। শেষের বার মেটাল ডিটেকটার এবং মাটি সরাবার ভারী যন্ত্রপাতি সে নিয়ে গিয়েছিল।

দুমাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর খালিহাতে ফিরতে হয়েছিল তাদের। ওই অভিযানে নকশার চিহ্নমতো কূল ঘেঁষে মেটাল ডিটেকটার ধাতব বস্তুর ইঙ্গিত পেয়েছিল বলে তারা দাবি করে। কিন্তু খননকাজে মস্ত বাধা হয়েছিল বালি আর সমুদ্রের পানি—ওগুলো সরিয়ে রাখা ভয়ানক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফরবস বিশ্বাস করেছিল নকশার চিহ্নমতো স্থান সে খুঁজে পেয়েছে। ক্যাপ্টেন টমসনের লুট-করা ত্রিশকোটি ডলার মূল্যের ধনসম্পদ ওই দ্বীপে আছে—এটা আজও অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস।

বেনিটো বনিটো হল আরেকজন কুখ্যাত জলদস্যু। ১৮১৪ সালে সে ছিল স্পেনদেশীয় একটা প্রাইভেটিয়ার জাহাজের ক্যাপ্টেন। পরে সে বোম্বেটেগিরির জীবন বেছে নিয়েছিল। রিও থেকে নিউ-ইয়র্ক যাতায়াতকারী বাণিজ্যতরী ছিল তার শিকার। একবার কোকোস দ্বীপে আত্মগোপন করে এক ব্রিটিশ রণতরীর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছিল। পরে পেরুর উপকূলবর্তী সব শহরে সে হানা দিতে

শুরু করে। বাণিজ্যজাহাজ নাগালের মধ্যে এলেই সে তা লুট করে ডুবিয়ে দিত। ওর শিকারের তালিকায় ছিল একটা বড় স্পেনদেশীয় তরণী। ওটা পেরুর সৈন্যদের জন্য সোনা ও টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছিল। লুটের মালে জাহাজ ভরে উঠলেই বেনিটো কোকোস দ্বীপে ওগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য চলে আসত। গবেষকদের মতে, ওর সেই লুকোনো সম্পদের মূল্য ২৫ কোটি ডলারের বেশি বই কম হবে না। ১৮৮৬ সালে স্পেনের সম্রাট তৃতীয় চার্লসের নামাঙ্কিত মোহর কোকোস দ্বীপে পাওয়া গিয়েছিল। মোহরে চার্লসের মুখের ছাপ ছিল, আর যে-সালটা খোদাই করা ছিল তা হল ১৭৮৮। ওগুলো বেনিটো বনিটোর লুটের মাল বলে মনে করা হয়। অন্তত ওই দ্বীপে জলদস্যুরা যে ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল তার সপক্ষে ওটা একটা জোরালো যুক্তি।

কোনো-না-কোনো সময় কোকোস দ্বীপে কুখ্যাত বোম্বেটেদের পদার্পণ ঘটেছিল। এদের মধ্যে একজনের নাম এডোয়ার্ড ডেভিস। ১৬৮৩ থেকে ১৭০২—এই সুদীর্ঘ উনিশ বছর সমুদ্রে তার ছিল অগাধ প্রতিপত্তি। ওই নির্জন দ্বীপে প্রায়ই তার আগমন ঘটত। তবে তার লুণ্ঠিত ধনসম্পদের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি, হয়তো ওই দ্বীপের কোথাও আজও তা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। জলদস্যু অথচ লেখক ওয়েকার তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ডেভিস সাতটি নৌকোবোঝাই ধনরত্ন ওই দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন জন কুক ছিলেন একজন দুঃসাহসিক নাবিক, কিন্তু তাঁর রক্তেও ছিল বোম্বেটেদের ছোঁয়া। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সামুদ্রিক খাঁড়িগুলোয় তিনি দস্যুবৃত্তি চালিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত ইংরেজরাই তাঁকে বিতাড়িত করেছিল ওখান থেকে। তিনি এক-জাহাজ লুটের মাল নিয়ে কোকোস দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন।

আরেকজন বিখ্যাত নাবিক স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক, যিনি জলদস্যুতায় বিমুখ ছিলেন না, যদিও প্রাইভেটিয়ার নাবিক হিশেবেই তিনি পরিচিত। তিনিও কোকোস দ্বীপে গিয়েছিলেন।

একজন প্রাক্তন গুপ্তধন-সন্ধানীর নাম অগাস্ট গিসলার, জার্মানদেশের লোক। কোস্টারিকা সরকারের সঙ্গে তিনি একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ওই নির্জন দ্বীপে তিনি বসবাস করবেন, গুপ্তধনের সন্ধান যদি তিনি পান তবে তার একটা অংশ প্রাপ্য হবে তাঁর। রবিনসন ক্রুশোর মতোই তিনি ওখানে দীর্ঘকাল নির্জনবাস করেছিলেন। তাঁকে বলা হত ওই দ্বীপের গভর্নর।

গিসলারের মতে, বেনিটো এগারোটি নৌকোবোঝাই ধনরত্ন সমুদ্রের যে-দিকটা কঙ্করময় বেলাভূমি সেখানে জড়ো করেছিল। ভাটার সময় একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ার পাদদেশে ওগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দস্যুরা প্রায় অভেদ্য সেই দুর্গম জঙ্গল কেটে পথ করেছিল চুড়োয় পৌঁছবার। বড়-বড় কাঠের খণ্ড আর জাহাজের দড়িদড়ার সাহায্যে ধনরত্ন তোলা হয়েছিল ওই চুড়োয়, তারপর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গভীর ফাটলে। গিসলারের বক্তব্য, একটা ধস নামায় চুড়োর সেই দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে। ওই গুপ্তধন উদ্ধার করতে হলে পাহাড়ের ওই চুড়োয় ভারী যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

আজ পর্যন্ত কয়েকশো জাহাজ জলদস্যুদের লুকোনো গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় ওই দ্বীপে অভিযান করলেও সরকারিভাবে কোনো সাফল্যের কথা শোনা যায়নি। দু-একটা মরচে-পড়া তলোয়ার, দু-একটা স্বর্ণমুদ্রা, নরকঙ্কাল ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত কিছু-কিছু জিনিস সাক্ষ্য বহন করছে যে, ওই দ্বীপে জলদস্যুদের গুপ্তধন আছে। গিসলার কিছু নরকঙ্কাল সম্বন্ধে বলেছেন, ওগুলো বেনিটোর বিদ্রোহী নাবিকদের কঙ্কাল। অনেক বছর ওই দ্বীপে সমীক্ষা করে গিসলার বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, শুধু একাধিক নয়, অন্তত বারোজন জলদস্যু ওই দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছে তাদের ধনসম্পদ।

গুপ্তধনের সন্ধানে সম্ভাব্য স্থানগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার ফলে ওই দ্বীপের অবস্থা এখন শোচনীয়। মাটি সরাবার ভারী যন্ত্রপাতি ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে দ্বীপের সর্বাঙ্গ। প্রচণ্ড গরম আর

বাতাসের আর্দ্রতা ওখানে কাজের সময় ন্যূনতম সীমারেখায় বেঁধে দিয়েছে। যাঁরা একবার অভিযানে গিয়েছেন, বর্ষার পর দ্বিতীয়বার গিয়ে তাঁরা দেখেছেন তাঁদের প্রথমবারের প্রচেষ্টা রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা জঙ্গলে হারিয়ে গেছে, বৃষ্টি ধুয়েমুছে দিয়েছে সব চিহ্ন। প্রত্যেকবার আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে কাজ। এসব কারণেই ওই দ্বীপটাকে পুরোপুরি খুঁজে দেখা আজও সম্ভব হয়নি।

টমসনের মূল নকশা নিয়ে আরও অনেকেই ওই দ্বীপে অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে লর্ড ফিজ উইলিয়ামস এবং তাঁর দলবল ওখানে গিয়েছিলেন। ওই একই উদ্দেশ্যে সেই সময় আরও একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী হাজির হয়েছিল সেখানে। তাদের নেতা ছিলেন আর্নল্ড গ্রে। দু-দলের কাছেই টমসনের মূল নকশার অনুলিপি ছিল। অনুসন্ধানের ব্যাপারে দু-দলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত রফা হল, গুপ্তধনের সন্ধান পেলে তাঁরা ভাগ করে নেবেন। দু-দলকেই খালিহাতে ফিরতে হয়েছিল।

১৯২৫ সালে এক বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান, ক্যাপ্টেন ম্যালকম ক্যাম্বেল, কোকোস দ্বীপে এসেছিলেন। মোটর-দৌড়ে তিনি ছিলেন বিশ্ববিজয়ী। কোকোস আইল্যান্ডের ধনরত্নের কাহিনী তাঁকেও হাতছানি দিয়েছিল। জীবনের মূল্যবান একটি বছর তাঁর নষ্ট হয়েছিল ওই দ্বীপে।

টমসনের মূল নকশার কত অনুলিপি যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার সংখ্যা জানা যায় না। ওই দ্বীপ থেকে পালিয়ে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন সে-বিষয়েও নির্ভুল তথ্য অজ্ঞাত। কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। কেউ-কেউ বিশ্বাস করেন তিনি নোভাস্কটিয়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন। আবার অনেকের মতে স্প্যানিশরা তাঁকে বন্দি করে পেরু নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ফাঁসি হয়েছিল তাঁর। এমন কথাও শোনা যায় যে, ফার্স্ট মেট নয়, তিনিই ওই দ্বীপে মারা গিয়েছিলেন এবং ফার্স্ট মেট তাঁর পরিচয়ে ফিরে এসেছিল। যা-ই হোক, তাঁর মূল নকশার অনুলিপি পঁচিশ হাজার ডলারে পর্যন্ত বিকিয়েছিল।

এ-প্রসঙ্গে জন কিটিং-এর কথা উল্লেখ না করলে এ-কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শোনা যায়, টমসনের সঙ্গে নাকি তার হৃদ্যতা হয়েছিল এবং টমসন তাঁর গোপনকথা বন্ধুকে বলে তাকে গুপ্তধনের একটা নকশা দিয়েছিলেন। কিটিং একাধিকবার কোকোস আইল্যান্ডে গিয়েছিল। একবার দুই-মাস্তুলঅলা পোত প্রজকুমে চেপে ওখানে যাবার সময় তার সঙ্গে ছিল বোগ নামে একটি লোক। দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চ্যাথাম উপসাগরে জাহাজ নোঙর করবার পর কিটিং আর বোগ আর-কাউকে না নিয়ে দ্বীপের ভেতরদিকে গিয়েছিল। ওরা যখন ফিরে এসেছিল তখন ওদের দুজনের পকেটে সোনা উপচে পড়ছে। জাহাজের সবাই ওদের চেপে ধরায় ওরা কথা দেয়, যে-গুপ্তধন ওরা আবিষ্কার করেছে তা সবাই ভাগ করে নেবে। রাত্রির অন্ধকারে কিটিং আর বোগ সবার চোখে ধুলো দিয়ে দ্বীপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ক্রুদ্ধ নাবিকের দল ওদের খুঁজে না-পেয়ে জাহাজ নিয়ে ফিরে যায়, কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে সবাই মারা পড়ে।

পরে অন্য একটা জাহাজ কিটিংকে উদ্ধার করেছিল, ও একাই ফিরে গিয়েছিল নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডে। ওর কাছে নাকি অনেক সোনাদানা ছিল যার মূল্য সাত হাজার ডলারও হতে পারে কিংবা একলক্ষও হতে পারে। কিটিং বলেছিল ওগুলো নাকি একটা গুহার ভেতর পেয়েছিল ও।

আর বোগ? সে নাকি নৌকোয় উঠতে গিয়ে সোনার ভারে উলটে পানিতে পড়ে গিয়েছিল, আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ-কেউ মনে করেন কিটিংই গুহার ভেতরে তাকে খুন করেছিল এবং বোগের কঙ্কাল আজও কোকোস আইল্যান্ডের কোনো গুহায় আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে।

কিটিং মারা যায় ১৮৮২ সালে। বুড়োবয়সে দ্বিতীয়বার সে বিয়ে করেছিল।

জানালার পরদার ফাঁক দিয়ে কিটিংকে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা গুনতে দেখেই নাকি ওই মহিলা তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

বহু ইংরেজ এবং আমেরিকান ওই দ্বীপের গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। সবচেয়ে বিখ্যাত যিনি ওই দ্বীপ পরিদর্শন করেছিলেন, তিনি হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। তিনি আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ হাউস্টনে চেপে ওখানে গিয়েছিলেন। জাহাজের নাবিকদের গুপ্তধন খুঁজে নিজেদের ভাগ্য ফেরাবার জন্য 'শোরলিভ' দেয়া হয়েছিল।

মেরি ডিয়ার জাহাজ লিমা থেকে যেসব ধনসম্পদ নিয়ে রওনা দিয়েছিল তার একটি আংশিক তালিকা : একটি খাঁটি সোনার ম্যাডোনার পূর্ণাকৃতি মূর্তি। বারোটি খাঁটি সোনার যিশুর দ্বাদশ শিষ্যের পূর্ণাকৃতি মূর্তি। একশোটি খাঁটি সোনার অন্যান্য সাধুসন্তের মূর্তি। দুশো সিন্দুকভরতি রত্ন (হীরে, চুনি, নীলা এবং মুক্তো)। তিনশো পঞ্চাশটি রত্নখচিত তলোয়ার। দেড়শো রত্নখচিত পানপাত্র। তিনশো সোনার বাট। ছশো রুপোর বাট।

তালিকাটি আংশিক মাত্র। তা ছাড়া, এটা হল একটা জাহাজের হিসেব। বেনিটো বনিটো এবং আরও কতজন জলদস্যু যে ওই দ্বীপে তাদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিল আজও তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

ওই দ্বীপকে রত্নদ্বীপ বললে বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

সুকুমার রায়

হুলোর গান

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।
জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে,
ধক ধক জোনাকির চকমকি জ্বলে,
চুপচাপ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চিৎকার করে,
কোন্ গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে—
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা;
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিলকুল সব দেখি ভেলকির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নির মুখ যেন চিমনির কালি।
মন-ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

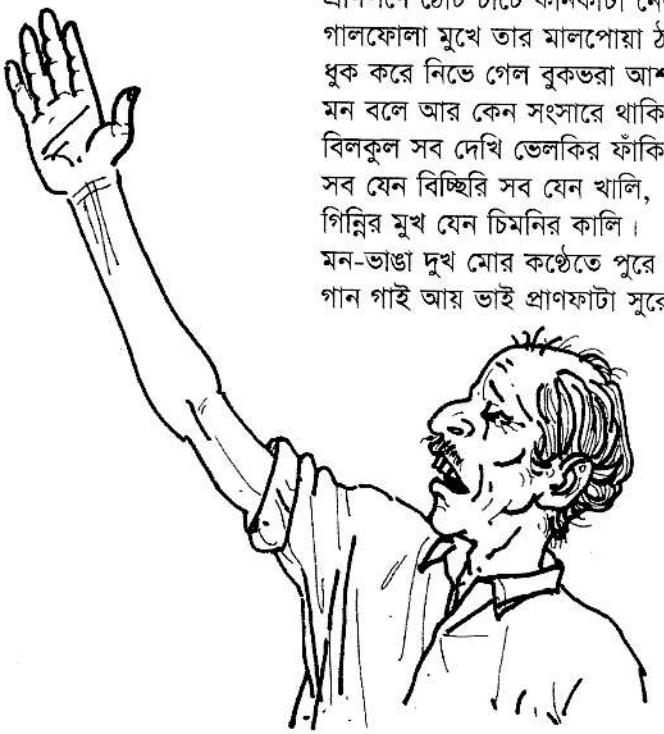

গাছ মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু

পৃথিবীতে দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সেই পরিমাণ গাছপালা বাড়ছে না। ফলে প্রকৃতির মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা বিপর্যয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, গাছ না বাড়লে ক্ষতি কী?

হ্যাঁ, ক্ষতি আছে। ভয়াবহ দুঃখকষ্ট আছে।

কী ক্ষতি?

উত্তর দিতে হলে একটু পেছনের দিকে যেতে হবে।

কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সূর্য থেকে।

দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল সোয়া লক্ষ।

তিন লক্ষ বছর আগে ছিল ১০ লক্ষ।

দশ হাজার বছর আগে ছিল ৫৩ লক্ষ মানুষ।

দুহাজার বছর আগে ছিল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ।

তিনশো বছর আগে ছিল ৫৫ কোটি।

আশি বছর আগে ছিল ১৬০ কোটি মানুষ।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছ'শ কোটিতে।

আদিকালে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু খাবার সংগ্রহ করত প্রকৃতি থেকে। প্রধানত গাছপালা ও ফলমূল থেকে প্রাণিজগৎ বাঁচত। গাছপালা জন্মানো নির্ভর করে মিঠাজলের ওপর। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি সরস হয়, গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে রস সংগ্রহ করে, বড় হয়। তাছাড়া কার্বনডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি নানা কিছুর প্রয়োজন তো রয়েছেই। আর গাছপালা থেকে আমরা পাই প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন।

কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে গাছপালার সংখ্যা কমছে। বন কেটে মানুষ কৃষিভূমি তৈরি করছে। গাছপালা ব্যবহার করছে জ্বালানি হিশেবে। তাছাড়া আসবাবপত্র তৈরিতে গাছ লাগে, কাপড়চোপড়ে লাগে তুলো, এমনকি রাসায়নিক তন্তু

তৈরিতেও লাগে বাঁশগাছ ইত্যাদি। আর খাদ্যের জন্য তো উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু উদ্ভিদ মানুষকে দিতে পারে না ছায়া, স্থায়ী অরণ্যের জন্য দরকার বৃক্ষরাজি। অরণ্য ও গাছপালা দরকার বৃষ্টির জন্য, জমির ক্ষয়রোধের জন্য। গাছপালা না থাকলে প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, পরিবেশ হয় দূষিত। যেমন নিমগাছ বায়ুকে শোধন করে, নিমের বাতাস উপকারী বলে সবাই জানি। বাড়ির আশেপাশে গাছপালা না থাকলে ঝড়-তুফান ঘরের চালা সহজে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টির পানি যাতে সহজে মাটি ধুয়ে নিতে না পারে তার জন্য গাছের শেকড় গোপনে কাজ করে যায়। গাছের পাতা, শেওলা ইত্যাদি পচে প্রকৃতির সার তৈরি হয়। খনিজ কয়লা তৈরি হয় গাছ থেকে।

বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ৫০৬১ বর্গমাইল। দেশের মোট আয়তনের মাত্র ৯.৩ ভাগ এই বনভূমির পরিমাণ। অথচ একটি দেশের মোট জমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। এই কম বনভূমি থাকার ফলে বৃক্ষজাত নানা জিনিশের দাম বেড়ে যাচ্ছে, পশুপাখি হ্রাস পাচ্ছে, আবহাওয়ায় গড়মিল দেখা দিচ্ছে, ভূমিক্ষয় বেড়ে গেছে। সমুদ্র-উপকূলে বাঁধ দিয়ে গাছপালা রোপণ করা হয়। স্থলভাগকে নোনাপানির আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁশ-বেতের অরণ্য তৈরি করা হয়। আর ফলমূল তো একমাত্র বৃক্ষরাজিই দিতে পারে।

গাছ অক্সিজেন ছাড়ে দিনে। সূর্যের আলো ও বাতাস থেকে গাছের পাতা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন জীবজগতের কাছে বিলিয়ে দেয়। আমরা তা গ্রহণ করি। একটি গাছ যে-পরিমাণ অক্সিজেন একদিনে ছাড়ে তা আমরা চোখে দেখি না বলে গাছকে এত অবহেলা করি। প্রাচীনকালে 'বৃক্ষদেবতা' বলে একটি কথা প্রচলিত ছিল। এখনও গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা যত্ন করে গাছ রোপণ করে রাস্তার ধারে ভিটেয় আর বাগানে। তার কারণ আমাদের পূর্বপুরুষরা বুঝতে পেরেছিল গাছের প্রয়োজনীয়তার কথা। আর সব দেশের সরকার বছরের একটি সময় আইন করে, উৎসব করে গাছ রোপণ করে।

বৃক্ষ রোপণ করা মানুষের কল্যাণেই প্রয়োজন। জীবজন্তুরা গাছপালা উদ্ভিদ খেয়ে মানুষের জন্য দুধ, ডিম, মাংস সরবরাহ করে। মানুষ মাংস দুধ ডিম খেয়ে ক্ষুধা দূর করে, শক্তি বাড়ায়। আবার মানুষ ও জীবজন্তু মরে গিয়ে মাটিতে মিশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, পটাশ, ফসফরাস সরবরাহ করে। এভাবে চক্রাকারে প্রকৃতি থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিশ গ্রহণ করে ও প্রকৃতিকে ঋণশোধ করে। এজন্য মানুষের প্রয়োজনে মানুষের উচিত গাছপালার বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করা, বৃক্ষের পরিচর্যা করা। একটি গাছ রোপণ না করে অন্য একটি গাছ কাটা উচিত নয়।

একটি গাছ রোপণ করে দিনে দিনে বড় হওয়া লক্ষ্য করার মধ্যেও আনন্দ আছে। প্রতিদিন তিলতিল বড় হয়ে ছোট গাছ হয় মহীরুহ। ফল দেয়, ফুল দেয়, শীতল ছায়া দেয়, মিষ্টি খাবার দেয়—হিসাব করলে একটি গাছের উপকারিতার শেষ নেই। আবার বৃক্ষ মানুষকে স্থৈর্যের শিক্ষা দেয়, সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে শেখায়। বৃক্ষ মানবজীবনের এজন্যই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন

বিখ্যাত দার্শনিক ও প্রবন্ধকার র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় আস্থাবান ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্যটি অতি চমৎকার। "তুমি কিছুতেই চাইবে না যে, আর কেউ ঠিক তোমারই মতো হোক। তুমি জানো এবং ঈশ্বরও জানেন, একজন তুমিই যথেষ্ট, দুজন বা তিনজন তুমির দরকার নেই।"

সামসুদ্দোহা চৌধুরী

মিহি কাপড় মসলিন

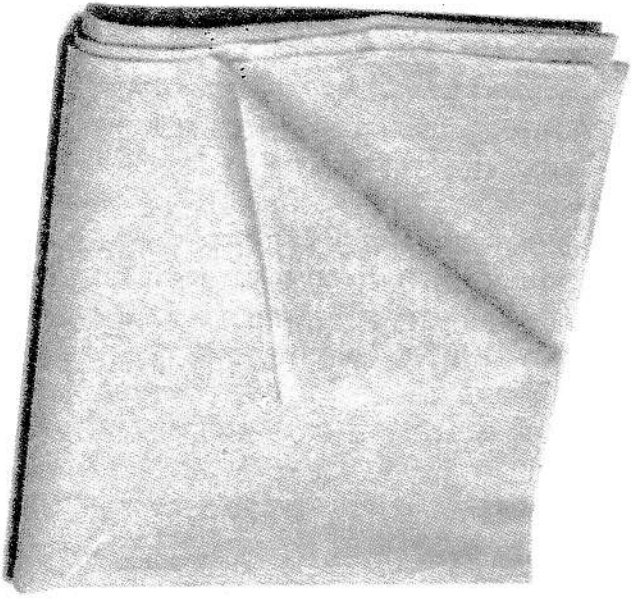

একসময় বাংলার মসলিন সারা পৃথিবীতে রপ্তানি হত, তার বিনিময়ে বাংলায় আসত তাল তাল সোনার মোহর।

আশ্চর্যের ব্যাপার প্রাচীন ফারাওদের সমাধিতেও মসলিন কাপড় পাওয়া গেছে। ফারাওদের ইতিহাস প্রায় কয়েক হাজার বছরের। গ্রিক, আর্মেনিয়ান, আরবীয় বণিকরা মসলিনের ব্যবসা করত। মসলিনের চালান যেত গ্রিসে। সেখানকার পাথরের দেবীদের মসলিন কাপড় পরানো হত।

প্রাচীনকালে অভিজাতদের প্রিয় কাপড় ছিল মসলিন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং আবুল ফজলও মসলিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রাচীন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীদের জন্যে বিশেষ ধরনের মসলিন কাপড় তৈরি হত, সে-মসলিনের নাম ছিল 'মলবুস খাস'। 'পাছাদার কুস্তিদ' নামেরও মসলিন কাপড় তৈরি হত। বিদেশী বণিকরা এখানে বাণিজ্যজাহাজ নিয়ে আসত প্রাচীন নদীবন্দর সোনারগাঁয়ে। একসময় আন্তর্জাতিক নদীবন্দর হিশেবে সোনারগাঁয়ের পরিচয় সারা পৃথিবীতে ছিল। এ বন্দর হতেই লক্ষ লক্ষ টাকার মসলিন বিদেশে যেত।

মসলিন ছিল ধনীদের কাপড়। একমাত্র বিত্তশালীদের ঘরেই মসলিন শোভা পেত।

আকবরের সভাসদ কবি আবুল ফজল সোনারগাঁয়ের মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি সোনারগাঁকে আদর করে ডাকতেন 'হযরত জাল্লান সোনারগাঁও'। তাছাড়া বিদেশী পর্যটকরা পূর্ববঙ্গ

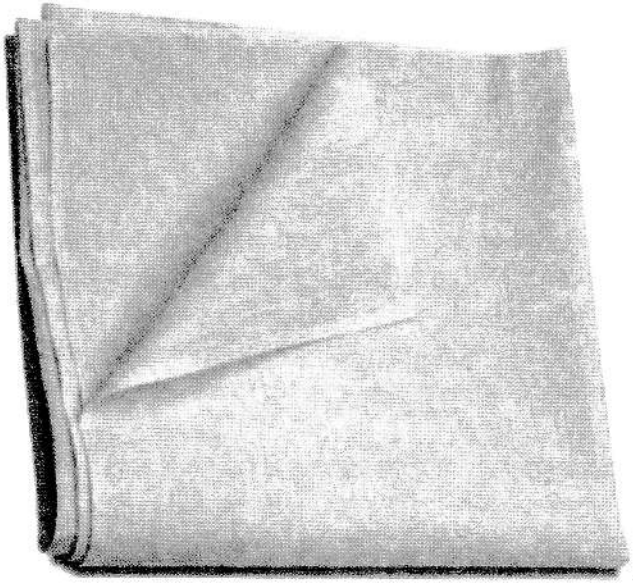

সফরে এলেই মসলিন কাপড় দিয়ে তাদের বরণ করা হত। মসলিন দেখে বিদেশী অতিথিরা যারপরনাই খুশি হতেন। করতেন মসলিনের গুণগাথা।

প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় মসলিন কাপড়ের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। পুরাকালে মসলিনের নাম ছিল 'গঙ্গাবস্ত্র', 'গঙ্গাপট্টহি' ইত্যাদি। তখন বাংলাদেশে একধরনের উন্নত কার্পাস তুলা উৎপাদিত হত। সে-কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরি হত মসলিনের সুতো।

মসলিনের জন্যে কারিগরদের কদরও ছিল খুব। সাধারণত চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘরের বেশি তাঁতি ছিল না। জেমস টেলর ছিলেন তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর। তিনি একটি বই লিখেছেন 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা'। সেখানে তিনি লিখেছেন, সে-সময়ে সোনারগাঁয়ের মসলিন অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের ছিল। তিনি পানাম নগরকে মসলিন ব্যবসার কেন্দ্র হিশেবে বলেন। এবং তৎকালীন সময়ে 'খাসনগর' দিঘির তীরে মসলিন তাঁতিরা সুতো কাটতেন।

১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস টেলর ঢাকাই মসলিনের রপ্তানি সংক্রান্ত যে হিশেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ঢাকা জেলার আড়ত থেকে বৎসরে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকার মসলিন বিদেশে রপ্তানি হত। তন্মধ্যে সোনারগাঁও আড়ত থেকেই উৎপাদিত হত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মসলিন।

মসলিনের ব্যবসায়ীরা ছিল সমিতিবদ্ধ। মসলিন ব্যবসায়ীরা দালালের মাধ্যমে মসলিন ক্রয় করতেন। জেমস টেলরের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকার মসলিন মোগল-দরবারে প্রেরণ করা হত।

সোনারগাঁ আড়ত থেকে পাঠানো হত ১৫ হাজার টাকার মসলিন। নিপুণ কারিগররা এ মসলিন তৈরি করত। এ মসলিন কাপড় তৈরি করতে তাদের অনেক দিন লাগত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে' জানা যায় সুবাদার ইসলাম খান সোনারগাঁয়ে তৈরি বিশেষ মসলিন কাপড় বাদশাহের দরবারে পাঠিয়েছিলেন।

মসলিনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে মোগল আমলেই। মোগল আমলে সোনারগাঁয়ের মসলিনের খ্যাতি এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময় সোনারগাঁয়ের রাজা ছিলেন ঈশা খাঁ।

ঈশা খাঁর সময় ইংরেজ পর্যটক রালফিচ সোনারগাঁও প্রথম ভ্রমণ করেন। তিনি সোনারগাঁওকে একটি আন্তর্জাতিক নৌবন্দর হিশেবে উল্লেখ করেন। তিনি এখান থেকে মসলিন, চাল, ঝিনুকের দ্রব্যাদি রপ্তানি হতে দেখেন।

১৩৪৭ সালের দিকে ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণে আসেন, তিনি এখান হতে মসলিন কাপড়ে সজ্জিত এক ক্রীতদাসকে নিয়ে যান। সে-সময় কিন্তু মানুষের কেনাবেচা চলত। ইবনে বতুতাও বাংলার মসলিনের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি সোনারগাঁ বন্দর থেকে জাভাগামী জাহাজে মসলিন পাঠাতে দেখেন। সে-সময় মসলিনের চাহিদা বেড়ে যায়। দেশী ব্যবসায়ীরা ঢাকা এবং সোনারগাঁয়ে এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করে। এবং তারাই মসলিন কাপড়কে পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে নিয়ে যায়।

মসলিনের জন্যে আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন। সোনারগাঁয়ের চারিদিকে তিনটি নদী সাপের মতো ঘিরে ছিল। নদী থেকে উঠত বাষ্প এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া, এবং এ আবহাওয়া মসলিন কাপড় শুকাতে যথেষ্ট সাহায্য করত।

পানাম নগরের খাসনগরের দিঘির তীরে মসলিন-তাঁতিরা বাস করত। দিঘির চারপাশে উষ্ণ-ঠাণ্ডা আবহাওয়া মসলিন সুতো শুকানোর জন্যে বেশ কাজে লাগত।

মসলিন-তাঁতিদের সংখ্যাও খুব-একটা বেশি ছিল না। জেমস টেলর খাসনগর দিঘি দেখেছেন। সে-সময় পানাম নগরী মসলিনশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র হিশেবে গড়ে ওঠে। বিদেশী বণিকরা পানাম নগরে এসে ভিড় জমাত মসলিন কাপড় কেনার আশায়। কথিত আছে ঝিনুকের খোলের ভেতর শত শত গজ মসলিন কাপড় নিয়ে যাওয়া হত। একশত পঁচাত্তর গজ লম্বা মসলিন কাপড় একত্রিত করলে একটা কবুতরের ডিমের মতো হত। ভেবে আশ্চর্য হতে হয় কীভাবে কারিগররা এ-কাপড় তৈরি করত!

কাপড় তৈরি করতেও কম কষ্ট নয়। সাধারণত একখানা মসলিন কাপড় বিশ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া ছিল। ভেজা জলবায়ুতে মসলিনের সুতো কাটতে হত। শুকনো বায়ুতে মসলিন সুতো কাটা সম্ভব ছিল না।

খাসনগর দিঘির তীরে মসলিন কাপড়ের সুতার টানা দেয়া হত। সুতা কোনো সময় ১৭৫ হাত লম্বা হত। জেমস্ টেলরের বর্ণনায় দেখা যায় এক পাউন্ড (প্রায় আধসের) ওজনের এক নল সুতোর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২৫০ মাইল।

পরিবারের মেয়েরা সুতো কাটায় নিয়োজিত থাকত। একজন মেয়ে সারা সকাল টাকুতে কাজ করে এক মাসে মসলিনের জন্যে মাত্র আধাতোলা সুতো কাটতে পারত। ১৮০০ সালে জেম্স টেলর বলেছেন, সোনারগাঁয়ে সে-সময় নিপুণ সুতোকাটুনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬/৭ জন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে বলেছেন যে, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এগারোসিন্ধু নামক স্থানের পানি মসলিন ধোয়ার জন্যে উৎকৃষ্ট ছিল। এখানকার ধোপারা ধোয়া ও রংকরণ কাজের জন্যে পারদর্শী। নবাব যে মোগল-দরবারে মসলিন পাঠাতেন তাতে 'খাসনগর' কথাটি লেখা থাকত।

সোনারগাঁয়ের একটি মসলিন কাপড়ের দাম ছিল প্রায় দুশো টাকা। একশোটির দাম ছিল বিশ হাজার টাকা। এই মাপের একটি কাপড় বুনতে একজন তাঁতি এবং তার দুজন সহকারীর প্রায় এক বছর সময় লাগত।

তারপর এল বেনিয়া ইংরেজরা। ইংরেজ কুঠিয়ালরা বাংলার দক্ষ কারিগরদের ধ্বংস করতে শুরু করল। তারা জোর করে নীলের চাষ করাত। মসলিনের ন্যায্য দাম দিত না, ফলে মসলিন-তাঁতিরা এখানে-সেখানে পালিয়ে যায়। তাছাড়া শস্তা দামের কাপড় এসে বাজার গ্রাস করতে আরম্ভ করল।

ফলে মসলিনশিল্প ধ্বংস হল। কথিত আছে, মসলিন-তাঁতিদের ধরে হাতের আঙুল কেটে দেয়া হয়। এভাবে লুপ্ত হয়ে যায় গৌরবময় মসলিনশিল্প। কয়েক শতাব্দি যাবৎ যে মসলিন পৃথিবীময় আলোড়ন তুলেছিল তা হারিয়ে যায়। মসলিনের কথাকাহিনী স্থান নেয় ইতিহাসের অধ্যায়ে।

প্রাচীনকালের একটি মসলিন কাপড় এখনও ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

হাস্যকৌতুক

নাসীরুদ্দীনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন : 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা?'

'অভ্যেসটা ভালো', বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে তো আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা।'

'সেটা কথা নয়। আর তাছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি, তখন কোনো মোহরের থলে ছিল না।'

'তাহলে ভোরে উঠে লাভ কী বাবা?' বলল নাসীরুদ্দীন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

* * *

একদিন বাড়িতে দুজন লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসীরুদ্দীন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোকদুটো ছিল চোর। তারা বাক্স-প্যাঁটরা সবই খুলেছে, সেইসঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছে। 'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়', বলল নাসীরুদ্দীন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই, তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

আলী আসগর

বৃষ্টি আসুক ঝেঁপে

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে একটা বড় ধরনের খরা চলল। বৃষ্টির জন্য সারা দেশের অগণিত মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়েছিল তৃষিত চাতকের মতো। অনেকেরই হয়তো এই সময় মনে হয়েছে যে, বিজ্ঞানের এমন কোনো ব্যবস্থা কি রয়েছে যার দ্বারা আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে এই খরার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে?

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায় কিনা এই প্রবন্ধটি পড়লে তোমরা জানতে পারবে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে—ধান দিব মেপে। এমন গান গেয়ে যদি বৃষ্টি আনা যেত, কী মজাই না হত।

গান গেয়ে না হোক, অন্য কোনো ভাবেও যদি আকাশের মেঘকে ইচ্ছামতো ঝরাতে পারতাম আমরা বৃষ্টিরূপে, অনেক সমস্যা যেত মিটে। চৈত্রের বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়াকে বদলানো যেত। অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়া অনেক শস্যক্ষেত ভরে উঠত সবুজ ফসলে। ইচ্ছামতো বৃষ্টি ঝরাবার এই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে নানাভাবে কাজ করেছে। কখনও তা প্রতিফলিত হয়েছে মিথ্যা সংস্কারে, দেবতার নামে সে দিয়েছে পূজা। ব্যাঙ মেরেছে, পশু হত্যা করেছে এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দিয়েছে। বৃষ্টির জন্যে রচিত হয়েছে কবিতা, গান। দল বেঁধে নৃত্য করেছে মেয়েরা। বিশেষ ধরনের নলে আকাশের দিকে পানি নিক্ষেপ করেছে— এমনি আরো অনেক কিছু।

আরো পরে, মানুষ যখন বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কারণ অনেকটা জানতে পারল, তখন নতুন পরীক্ষা শুরু হল। ঘাসের ডগায় ও ধূলিকণায় শিশিরবিন্দু জমে— এই অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে ক্ষুদ্র অবলম্বন খুব

সহায়ক। ছোট্ট ধূলিকণা, ঘাসের ডগা, ধোঁয়ার কণিকা এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের মতো কাজ করে। এসব ক্ষুদ্র বসার জায়গাকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প সহজে জমতে পারে। এই তথ্যকে ভিত্তি করে মানুষ গুলি নিক্ষেপ করেছে মেঘের দিকে, নানা রাসায়নিক দ্রব্য পুড়িয়ে ধোঁয়া উড়িয়েছে আকাশে। কিন্তু এসবই ব্যর্থ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কখনো কখনো ডিনামাইট ফাটিয়ে বৃষ্টি ঝরাবার দাবি কেউ কেউ করে থাকলেও, নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি যে ধোঁয়া সৃষ্টি করে বা ডিনামাইট ফাটিয়ে বৃষ্টি ঝরানো যাবে।

আসলে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি ঝরাবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং সেটা কিছুটা আকস্মিকভাবে। বৃষ্টির পানি কোথা থেকে আসে আমরা সবাই জানি। সাগর, হ্রদ, নদী, নালা— এমনকি গাছপালার পাতা থেকে পানি বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায় এবং উপরে গিয়ে তা ঠাণ্ডা হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাকে আশ্রয় করে এই ঠাণ্ডা জলীয় বাষ্প যখন অসংখ্য অত্যন্ত ছোট ছোট জলবিন্দুর সৃষ্টি করে এবং একসঙ্গে উড়ে বেড়ায় তখন তাকে মেঘের মতো আমরা দেখতে পাই। যেসব কণিকাকে আশ্রয় করে এই অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সৃষ্টি হয় তা ধূলিকণা হতে পারে, সমুদ্র থেকে ওপরে উড়ে আসা লবণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা হতে পারে, ধোঁয়া হতে পারে অথবা বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে উৎপাদিত যৌগিক অণু হতে পারে কখনো-বা অতি ক্ষুদ্র বরফের কুচি হতে পারে। এগুলো কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃষ্টির ফোঁটার তুলনায় অনেক অনেক ছোট—কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আর এজন্যেই পৃথিবীর টানে এরা নিচের দিকে ধাবিত না হয়ে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

ব্যাপারটি আরো একটু বুঝিয়ে বলি। মেঘের জলবিন্দুগুলো এত ছোট যে নিচের দিকে পড়তে গেলে বাষ্পকণার অণুর সঙ্গে ধাক্কা খায় মাঝে মাঝে। অতি ক্ষুদ্র বলে, বাতাসের অণুর উপর দিকের ধাক্কাই একে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যাই হোক, মেঘের জলকণার ব্যাস অন্ততপক্ষে এক

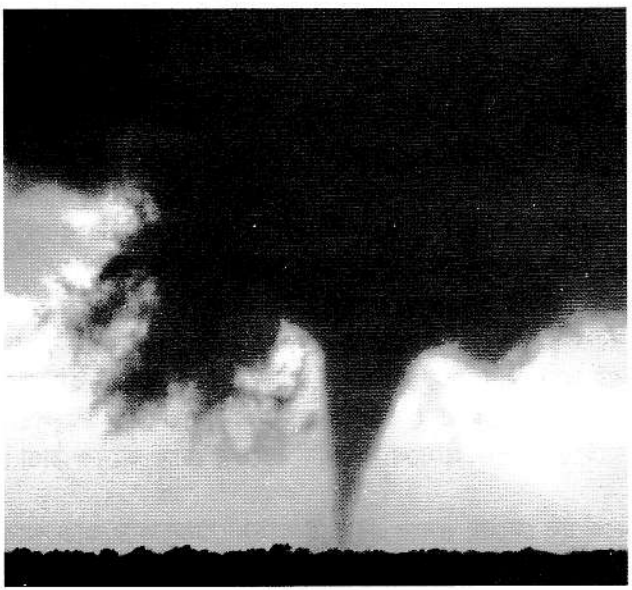

সেন্টিমিটারের ৫০ ভাগের এক ভাগ না হওয়া পর্যন্ত তা বৃষ্টিকণা হয়ে নেমে আসে না মেঘ থেকে। কিন্তু এর পরেও বাধা আছে। আবহাওয়া যদি শুষ্ক এবং উত্তপ্ত থাকে তাহলে নামার পথেই এই ক্ষুদ্র জলকণাগুলো বাষ্প হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টিপাত সম্পর্কে এই জ্ঞানটুকু পাওয়ার পরই প্রথম চেষ্টা চলল কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটাবার। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা নানা রকম জিনিস প্লেনের সাহায্যে নিক্ষেপ করতে থাকলেন আকাশে। কখনো ধূলিকণা, কখনো লবণের জল, কখনো এসিড। এতে ভোগান্তি হল অনেক কিন্তু ফল হলেন না বিশেষ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি এরোপ্লেনের পাখায় বরফ জমার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ডক্টর আয়ার ভিং ল্যাঙ্গমুরকে নিয়োগ করল। আর তাঁর সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত হল জোসেফ সেফার।

বরফ কেমন করে জমে তা পরীক্ষা করার জন্যে দুজন উঠে গেলেন উঁচু পাহাড়ে, সেখানে প্রচণ্ড শীত আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালালেন। একটি জিনিস তাঁদের বিস্মিত করল এবং তা হল—পাহাড়ের ওপর অনেক সময় তাপমাত্রা অত্যন্ত কমে যাওয়া সত্ত্বেও বরফ জমতো না পাহাড়ে। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে পানি হয়ে যায় তার চেয়ে কম তাপমাত্রায় গেলে জলকণা বরফের কুচি সৃষ্টি করবে, এটাই আশা করা হয় স্বাভাবিকভাবে! এই সময়ে অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিলেন যে বরফের খুব ক্ষুদ্র কুচিকে আশ্রয় করেই আকাশে জলীয় বাষ্প জমে, বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি করে। এবং যেখানে এই অবলম্বন নেই, সেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হয়েও মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না। সেফার ভীষণ উৎসাহিত হলেন সমস্যাটি সমাধানের জন্য। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের দানা, যেমনটি তুলার মতো ফ্রিজের মধ্যে দেখা যায়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

যুদ্ধের কাজ তখন তাঁর শেষ হয়ে গেছে। একটি ঠাণ্ডা করার যন্ত্র তিনি বাড়িতে বানালেন, যার মধ্যে জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে বরফে রূপান্তরিত করা যায়। তিনি যন্ত্রটাকে চালু করে একাধারে জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করতে থাকলেন এবং উপর থেকে নানা রকম জিনিসের গুঁড়া ছিটাতে লাগলেন। মাসের পর মাস সব রকম বস্তুর কণা দিয়েই পরীক্ষা চালালেন, কোনোই ফল হল না। প্রায় ধৈর্য হারাবার মতো অবস্থা যখন, এমন এক সময় হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সেফার দুপুরে খেতে গিয়েছিলেন বন্ধুর সঙ্গে, এসে দেখেন তাঁর ঠাণ্ডা করার যন্ত্র অর্থাৎ ফ্রিজারের মুখ খোলা থাকায়, তার ভেতরটা অনেকটা গরম হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় বরফ হবার কথা তার চেয়ে বেশিতে উঠে গেছে। আসলে তখন গরম পড়ে আসছিল, ফলে বাইরের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সেফার ভাবলেন, তাঁকে আরো সাবধানে চালাতে হবে পরীক্ষা। কিন্তু আপাতত তাড়াতাড়ি তাঁর ফ্রিজারকে ঠাণ্ডা করার জন্যে তিনি কার্বন ডাইঅক্সাইডের বরফ, অর্থাৎ জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইডের গুঁড়া ধীরে ধীরে তাঁর ফ্রিজারের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আকস্মিক ঘটনাটি এখানেই ঘটল। সেফার বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা বাতাসে যে জলীয় বাষ্প তা বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুচিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটা তিনি বুঝতে পারলেন, কারণ আলোর রশ্মি এসে এই অতি ক্ষুদ্র বরফ কুচিতে পড়ছিল। ঠিক যেমনটি হয়, যখন বিকালের রোদ বেড়ার ছিদ্র দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাকে উজ্জ্বলভাবে আমরা দেখতে পাই। কার্বন ডাইঅক্সাইডের বরফ আসলে সাধারণ বরফের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। ইংরেজিতে একে ড্রাই আইস বলে।

সেফারের এখন কাজ হল মেঘের ওপরে এই ড্রাই আইস কেমন করে কাজ করে তা পরীক্ষা করা। নভেম্বরের এক শীতের দিনে আকাশে মেঘ দেখে সেফার প্লেনে করে উড়ে গেলেন আকাশে। সঙ্গে

নিলেন ড্রাই আইস এবং তা মেঘের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়ার যন্ত্র। সেফার প্লেন চালককে বললেন প্লেনটাকে মেঘের ঠিক ওপরে নিয়ে যেতে, তারপর ছড়াতে লাগলেন ড্রাই আইস, ঠিক মেঘের ওপরে। মাত্র কয়েক কেজি ড্রাই আইসের গুঁড়া তিনি ছড়িয়েছেন, এর মধ্যে ভীষণ ঠাণ্ডায় তাঁকে সরে যেতে হল প্লেন নিয়ে। বাকি বরফগুলো অবশ্য তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন মেঘের মধ্যে। নিচে ছিলেন ল্যাঙ্গমুর। ভীষণ উত্তেজনার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন বৃষ্টি হয়ে ঝরছে সব মেঘ। খবরটা ছড়িয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এবং এরপর অনেকেই প্লেন থেকে ড্রাই আইস ছড়িয়ে বৃষ্টি ঝরাবার পরীক্ষাটি করতে লাগলেন। একবার ল্যাঙ্গমুর সমুদ্রপারের একটি বিরাট মেঘের ওপর এই পরীক্ষাটি করতে গেলেন। উদ্দেশ্য মুষলধারায় বৃষ্টি সাগরের ওপরেই ঘটানো। কিন্তু মেঘটা ইতিমধ্যে সরে গেল ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আর প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভেসে গেল নিকটবর্তী স্থলভাগ।

কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরাবার এই সাফল্যে সেফার ভাবলেন, বাতাসকে ড্রাই আইসের সাহায্যে ঠাণ্ডা করেই বৃষ্টি আনা সম্ভব। ফলে, বৃষ্টির জন্যে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিশেষ বস্তুকণা মেঘের মধ্যে ছড়াবার প্রয়োজন নেই। বার্নার্ড ফনগাট কিন্তু এখানেই থামতে রাজি হলেন না। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানিতে চাকরিরত এই তরুণ বিজ্ঞানী খুঁজতে শুরু করলেন এমন বস্তুকণা, যার গঠন বরফের কণিকার মতো।

লবণের যেমন দানা আছে, বরফের তেমন দানা আছে। দানার এই বিশেষ গঠনপ্রকৃতিকে কেলাস গড়ন বলে। কঠিন বস্তুর প্রত্যেক কেলাসের জন্যে একটি বিশেষ গড়ন আছে। বার্নার্ড ফনগাট লক্ষ্য করলেন যে, সিলভার আয়োডাইড নামক বিশেষ যৌগিকের কেলাসের গড়ন বরফের কেলাসের গড়নের মতো। অর্থাৎ এর ছয়টা দিক আছে। সুতরাং এই সিলভার আয়োডাইডের অতি ক্ষুদ্র কণাগুলো ঠাণ্ডা বাতাসে ছড়িয়ে তিনি বৃষ্টি পাবেন বলে আশা করলেন।

বেশ অনেকবার ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়লেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এল। কারণ, প্রথম দিকে বিশুদ্ধ সিলভার আয়োডাইড ব্যবহার না করার ফলেই অসুবিধা হচ্ছিল। সিলভার আয়োডাইড বেশ দামি পদার্থ হলেও খুব অল্প পরিমাণের এই পদার্থ দিয়েই প্রচুর জায়গা জুড়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত খরচ খুব বেশি পড়ে না।

মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। গানের সুর ছড়িয়ে হোক, সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়া অথবা ড্রাই আইস ছড়িয়ে বৃষ্টি ঝরানো এখন আমাদের আয়ত্তাধীন।

স্মরণীয় বাণী

১। কারও সমালোচনা করো না, তাহলে নিজেই সমালোচিত হবে।– আব্রাহাম লিংকন

২। একজন মহান ব্যক্তিকে বোঝা যায় ছোটদের সাথে তার সার্বক্ষণিক ব্যবহার দেখে।– কার্লাইল

৩। প্রতিবাদ, তর্ক ইত্যাদি করলে মাঝে মাঝে জয় হয় বটে, তবে সে জয় বিরাট শূন্যতায় ভরা, তাতে অপরের হৃদয় পাওয়া যায় না কখনো।–বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

৪। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। জ্ঞানের অমৃত হয় আকণ্ঠ পান করো, নাহয় করো না।

– আলেকজান্ডার পোপ।

আবুল মনসুর আহমদ

হুযুর কেবলা

এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্প্‌শুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশমা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর, স্টেপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর-বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রিম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরো খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া-চুল-কাটা মাথায় গোল নেকড়ার মত টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশ্‌তা, ওহী, হযরতের মেয়ারাজ লইয়া সর্বদা হাসিঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোম্‌তের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামায পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাযে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গাল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজ হাতে একছড়া তস্‌বিহ্ তৈরি করিল। সেই তস্‌বির উপর দিয়া অষ্টপ্রহর অঙ্গুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এমদাদ টলিল না। সে নিজের নধর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল : হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে! কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তস্‌বিহ্ চালাইতে লাগিল।

২

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এমদাদ একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে আর তেমন নিষ্ঠা আনিতে পরিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জতের নামায তরক্ করিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

অগত্যা সে নামাযে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়াচোখের পানি কোনোমতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকালে-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা-মওলবী সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারতাক্রমণের কতদিন বাকী আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয়লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও যর্‌দা এবং সময়-সময় নাশ্‌তা খাইতেন।

ইহাদের একজনের সুফী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এল্‌হু' 'এল্‌হু' করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এস্‌তেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সুফী সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজি-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন : হকিকতান্ যদি আপনি রুহের তরক্কী হাসেল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা, মাস্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এমদাদ অপ্রতিভভাবে বলিল : আমি তো কারও মুরিদ হই নাই।

সুফী সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন : হ-ম্, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসেল করিতে পারে? হাদিস শরীফে আসিয়াছে : (এইখানে সুফী সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবি আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে-মতলব বয়ান করিয়া অবশেষে বাঙলায় বলিলেন) : জয্‌বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এইরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজ্‌যুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ যমিরের রওশনী ও রুহের তরক্কী হাসেল করিতে পারে না।

হাদিসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল।

সে ধরা-গলায় বলিল : কী হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?

সুফী সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন : ঘাবড়াইবার কোনো কারণ নাই। কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এমদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফী সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : কোথায় পাইব কামেল পীর? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফী সাহেব সুর করিয়া একটি ফারসি বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন : জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে? হাযার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফী সাহেবের হাত তখনও এমদাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল : আমাকে লইয়া যাইবেন না সেখানে?

সুফী সাহেব বলিলেন : কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (আরবি ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আসতে চায়,তার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফী সাহেবের সঙ্গে পীর-যিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

এমদাদ দেখিল : পীর সাহেবের একতলা পাকা বাড়ি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব কখানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফী সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল : ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদী-রঞ্জিত দাড়িবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধলোক তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন।

এমদাদ বুঝিল : ইনিই পীর সাহেব।

'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া সুফী সাহেব সোজা পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পীর সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফী সাহেব সেই পায়ে হাত ঘষিয়া নিজের চোখ-মুখ ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পীর সাহেব তাঁর হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফী সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছু দূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পীর সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন : কী রে বেটা, খবর কী? তুই কি এরই মধ্যে দায়েরায়ে হকিকতে মহব্বত ও জযবায়ে-যাতী-বনাম হোব্বে এশ্‌ক্ হাসেল করিয়া ফেলিলি নাকি?

পীর সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন : হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন।

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন : তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসলে কেন? কই তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে!

এই বলিয়া পীর সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিটকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন : সে এই ঘরেই হাযের আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহেদী-রঞ্জিত দাড়িগোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এমদাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদম-বুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব "বস বেটা, তোর ভালো হইবে। আহা, বড় গরীব!" বলিয়া আলবোলার নলে দম কষিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : হযরত, এর অবস্থা তত গরীব নয়। বেশ ভালো তালুক সম্পত্তি—

পীর সাহেব নলে খুব লম্বা টান কষিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন : বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলত দিয়া ধনী-গরীব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরীব কথায় দুনিয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এন্‌সানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াস, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটান কি সহজ কথা? তোদের

আমি দোষ দিই না। তোদের অনেকেই এখনও যেকেরের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। যেক্‌রে জলী ও যেক্‌রে-খফী—এই দুই দরজার যেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। ফেকের হইতে যহুর এবং যহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফযলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি—অনেক—

—বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন : কুদরতে-ইয্‌দানী, কুদরতে-ইয্‌দানী।

মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন : আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?

জনৈক মুরিদ বলিলেন : হযরত, বৎসর কোথায়? এই না কয়েক ঘণ্টা হইল।

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন : অনেক দেরি—অনেক দেরি। আহা বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন : হুযুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন : অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন : না কেবলা, আমাদিগকে

বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন :

পীর সাহেব বলিলেন : ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন। এই যে সাদুল্লাহ (সুফী সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কী করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেস্‌বতে-বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেস্‌বত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আল্‌গরয ইহাও খোদার এক শানে-আযিম। সাদুল্লাহ যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নযর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ সাদুল্লার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাদুল্লার রুহ্ আর-একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহ আযিমুশ্‌শান্।

বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

মুরিদ হুক্কার মাথা হইতে চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পীর সাহেব বলিলেন : তোমরা আমার নিজের নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোমাদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোমরা সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লী তাতে ঢালিয়া দিলে তাতে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এল্‌মে-লাদুন্নি হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মহফুযে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে-হকিকতে-লাতাআইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-নাযাবীর ফয়েয তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে-ইয্‌দানী দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জেস্‌মের মধ্যে আমার রুহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবলা—তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ—লওহে মহফুজ হইতে আমার রুহ্ আনিয়া আমার জেস্‌মের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহ করেন। কাজেই দেখিতেছিস্, কাবেলিয়ত হাসেল না করিয়া কোনও কাজে হাত দিতে নাই। খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি? শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলি। কিন্তু এর মধ্যে যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরও তাজ্জব হইয়া যাইবি। সে জন্যই সে-কথা বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তোরা শিখবি কোথা হইতে? তাই সে কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাযার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেস্‌মে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সাত হাযার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেস্‌মার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফ এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পীর হাসেব নল হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে টানিতে লাগিলেন। সভা নিস্তব্ধ রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এমদাদ পীর সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইহার মুরিদ হইবে।

৪

পীর সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন : বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাসাউওয়াফ বড় কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এমদাদ তাওয়াজ্জোহ লইল।

পীর সাহেব নিজের লতিফায় যেকের জারি করিয়া সেই যেকের এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

এমদাদ প্রথম লতিফা জেক্‌রে-জলী আরম্ভ করিল।

সে দিবানিশি দুই চোখ বুজিয়া পীর সাহেবের নির্দেশমতো 'এল্‌হু' 'এল্‌হু' করিতে লাগিল।

পীর সাহেব বলিয়াছিলেন : খেলওয়াৎ-দর-আঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিলে তার কলবে যাতে আহাদিয়তের ফয়েজ হাসেল হইবে এবং তার রুহ্ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কাঁদিতে থাকিবে।

কিন্তু এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পীর সাহেবের মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি ও তাঁর রূপা-বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ফলে তার কলবে যাতে-আহাদিয়তের ফয়েয হাসেল হইয়া তার রুহ্‌কে ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁপাইবার পরিবর্তে ফুফু-আম্মার স্মৃতি বাড়ি যাইবার জন্য তার মনকে উচাটন করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল।

অনাহারে ও অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দুটি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল : এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে তার রুহ্ বস্তুতই জেস্‌ম হইতে আযাদ হইয়া আল্‌মে-আমরে চলিয়া যাইবে।

সে স্থির করিল : পীর সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া সে একদিন বিদায় হইবে।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না।

একটা নূতন ঘটনায় সে বিদায়ের কথাটা আপাতত চাপিয়া গেল।

দূরবর্তী একস্থানে মুরিদগণ পীর সাহেবকে দাওয়াত করিল।

প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগী, সাতসের অম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ লইয়া পীর সাহেব 'মুরিদানে' রওয়ানা হইলেন।

পীর সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংরাজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে লওয়া হইল। নদীর সৌন্দর্য, নদী-পারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এমদাদের কাছে বেশ লাগিল।

পীর সাহেব গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুরিদগণের নিকট যে-অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহা দেখিলে অনেক রাজা-বাদশাহ রাজত্ব ছাড়িয়া মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসিতেন।

পীর সাহেব গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা করিলেন।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট বিরাট ভোজ চলিতে লাগিল।

পীর সাহেবের একটু দূরে বসিয়া গুরুভোজন করিয়া এমদাদ এতদিনের কৃচ্ছ্র প্রতিশোধ লইতে লাগিল। ইহাতে প্রথম-প্রথম তার একটু পেটের পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই সে সামলাইয়া উঠিল এবং

তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও চেহারা বেশ চিক্‌নাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

পীর সাহেবের ভাত ভাঙিবার কসরত দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে এমদাদের হয় নাই। এইবার সেই ভাগ্যলাভ করিয়া এমদাদ বুঝিল : পীর সাহেবের রুহানীশক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন, তাঁর হযমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিস বসিত।

রাত্রে এশার নামাযের পর অন্দরমহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হইত। কারণ অন্য সময় মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকথা বুঝাইতে একটু দেরী হইত। কারণ মেয়েলোকেরা বুদ্ধি-সুদ্ধি বড় কম—তারা নাকেস-আকেল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে পীর সাহেবের ধারণা ছিল অন্য রকম। মেয়ে-মজলিসে ওয়ায করিবার সময় তিনি ইহারই দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন।

তিনি অনেক সময় বলিতেন : তাসাউওয়াফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভালো করিয়া তাওয়াজ্জোহ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এশার নামাযের পর দাড়িতে চিরুণী ও কাপড়ে আতর লাগান সুন্নত এবং পীর সাহেব সুন্নতের একজন বড় মোতেকাদ ছিলেন।

ওয়াজ করিবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জয্‌বা আসিত।

সে জয্‌বাকে মুরিদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত।

এই 'ফানাফিল্লা'র সময় পীর সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। এই সময় পীর সাহেবের রুহ আলমে-খাল্‌ক হইতে আল্‌মে-আমরে পৌঁছিয়া রুহে ইয্‌দানির সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে ইয্‌দানি তাঁর চোখের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু সে নূরের জল্‌ওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরূপ চিৎকার করিতেন।

তাই জয্‌বার সময় একখণ্ড কালো মখমল দিয়া পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল!

এইরূপ জয্‌বা পীর সাহেবের প্রায়ই হইত।

—এবং মেয়েদের সামনে ওয়ায করিবার সময়েই একটু বেশি হইত।

এই সব ব্যাপারে এমদাদের মনে একটু খট্‌কার সৃষ্টি হইল। কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে চেষ্টায় সফল হইবার আগেই কিন্তু ও-পথে বাধা পড়িল। প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পীর সাহেবকে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া এমদাদের মনে খট্‌কা বাড়িয়া গেল। তার মনে পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় পীর সাহেব অত্যন্ত অকস্মাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন : তিনি আর দু-এক দিনের বেশি সে-অঞ্চলে তশ্‌রিফ রাখিবেন না।

এই গভীর শোকসংবাদে শাগরেদ-মুরিদগণের সকলেই নিতান্ত গম্‌গিন হইয়া পড়িল।

জনৈক শাগরেদ সুফী সাহেবের ইশারায় বলিলেন : হুযুর কেবলা, আপনি একদিন বলিয়াছিলেন, এবার এ-অঞ্চলের মুরিদগণকে কেয়ামতে নেসবতে বায়নান্নাস দেখাইবেন। তা না দেখাইয়াই কি হুযুর এখান হইতে তশরিফ লইয়া যাইবেন? এখানকার মুরিদগণের অনেকেই বলিতেছেন : হুযুর মাঝে-মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মী মুরিদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছে।

মওলানা লকবধারী ঐ ভণ্ডটা ও-পাড়ার অনেক মুরিদকে ভাগাইয়া নিতেছে; সে নাকি বৎসর-বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যায়।

পীর সাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন : (আরবি ও উর্দু) আল্লাই কেরামতের একমাত্র মালেক, মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়? ও-সব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না। তবে হ্যাঁ, মোরাকেবায়ে-নেস্‌বতে-বায়নান্নাস-এর তরকিব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার আর সময় কোথায়?

সমস্ত সাগরেদ ও মুরিদগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন : না হুযুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না দেখিয়া ছাড়িব না।

অগত্যা পীর সাহেব রাযী হইলেন।

স্থির হইল, সেই রাত্রেই মোরাকেবা বসিবে।

সারাদিন আয়োজন চলিল।

রাত্রে মৌলুদের মহফেল বসিল। হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক-অনেক মোওয়াজেযাত বর্ণিত হইল।

মৌলুদ শেষে খাওয়া-দাওয়া হইল এবং তৎপর মোরাকেবার বৈঠক বসিল।

৫

পীর সাহেব বলিলেন : আজ তোমাদের আমি যে মোরাকেবার তরকিব দেখাইব, ইহা দ্বারা আমরা যে-কোনও লোকের রুহের সঙ্গে কথা বলিতে পারি। আমি যদি নিজে মোরাকেবায় বসি, তবে সেই রুহ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে একজন মোরাকেবায় বস, আমি তার রুহের দিকে তোমরা যার কথা বলিবে তার রুহের তাওয়াজ্জোহ দেলাইয়া তারই রুহের ফয়েয হাসিল করিব। তৎপর তোমরা যে-কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে কে মোরাকেবায় বসিবে?

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কেহই কোন কথা বলিল না, মোরাকেবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল : আমি বসিব।

পীর সাহেব একটু হাসিলেন।

বলিলেন : বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও যেক্‌রে-খফা-আম করিস নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?

—বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল। সে বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব আবার বলিলেন : কি, আমার মুরিদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানী তরক্কী হাসেল হয় নাই, যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?

—বলিয়া তিনি শাগরেদদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

প্রধান খলিফা সুফী সাহেব উঠিয়া বলিলেন : হুযুর কেবলা কি তবে বান্দাকেই হুকুম করিতেছেন? আমি তো আপনার আদেশে কতবার মোরাকেবায়-নেস্‌বতে-বায়ান্নাসে বসিয়াছি। কোনও নূতন লোককে বসাইলে হইত না?

সুফী সাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরিদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল।

তারা সকলে সমস্বরে বলিল : আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।

অগত্যা পীর সাহেবের আদেশে সুফী সাহেব মোরাকেবায় বসিলেন।

পীর সাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : কার রুহের ফয়েয হাসেল করিব?

মুরিদগণের মুখে কথা যোগাইবার আগেই জনৈক শাগরেদ বলিলেন : এইমাত্র মৌলুদ-শরীফ হইয়াছে; হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোয়াজেযা বয়ান হইয়াছে। তাঁরই রুহ আনা হোক।

সকলেই খুশী হইয়া বলিল : তাই হউক, তাই হউক।

তাই হইল।

সুফী সাহেব আতর-সিক্ত মুখমণ্ডলের গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া ইহল। মেশ্‌ক্‌-যাফরান ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

পীর সাহেব তাঁর প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের রুহ-মোবারক নাযেল করিবার জন্য ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন।

শাগরেদরা চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত-কণ্ঠে সুর করিয়া দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পীর সাহেব কখনও জোরে কখনও-বা আস্তে নানা প্রকার দোওয়া কালাম পড়িয়া সুফী সাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর শাগরেদগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পীর সাহেব বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে সুফী সাহেবের বুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুফী সাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তাঁর বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পীর সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুফী সাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফী সাহেব ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে মূর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পীর সাহেব মুরিদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন : বদর বাবাজীর একটু তক্‌লিফ হইল। কী করিব? পরের রুহের উপর অন্য রুহের ফয়েয হাসেল আসানির সঙ্গে করা বেল্‌কুল না-মোমকেন।

যা হউক, হযরতের রুহ্ তশরিফ আনিয়াছেন। তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।

—বলিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া সমস্বরে পড়িতে লাগিল : ইয়া নবী সালাম আলায় কা ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরুদ শেষ হইলে অভ্যাসমতো অনেকেই বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন : হযরতের রুহে পাক এখনও এই মজলিসে হাযের আছেন, তোমরা কেহ বসিতে পারিবে না। কার কী সওয়াল করিবার আছে, তা করিতে পার।

এমদাদ একটা বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

—মাথায় এক ফন্দি আঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল : কেবলা, আমি কোনো সওয়াল করিতে পারি?

পীর সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন : যা না, জিজ্ঞাসা কর না গিয়া!

—বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন : বাবা, সকলের কথাই যদি রুহে-পাকের কাছে পঁহুছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

এমদাদ তথাপি সুফী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ-সালাম জানিবেন।

হযরতের রুহ কোনো জবাব দিল না।

পীর সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন : অধিকক্ষণ রুহে পাককে রাখা বে-আদবি হইবে। তোমাদের যদি কাহারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে কোনো সওয়াল করিতে পার।

—বলিতেই পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা বেলায়েত-পুরী সাহেব অগ্রসর হইয়া "আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া রসুলুল্লাহ" বলিয়া সুফী সাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল সুফী সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল : ওয়া আলায়কুমুস্ সালাম, ইয়া উম্মতী।

মওলানা সাহেব বলিলেন : হে রেসালত-পনা, সৈয়দুল্ কাওনায়েন, আমি আপনার খেদমতে একটা আরয করিতে চাই।

আওয়ায হইল : শীগগির বল, আমার আর দেরী করিবার উপায় নাই।

মাওলানা : আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব নূরে-ইয-দানির জলওয়া সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কী? তাঁর আমলে কি কোনও গলৎ আছে?

কঠোর সুরে উত্তর হইল : হাঁ, আছে।

পীর সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদ-কাঁদ সুরে নিজেই বলিলেন : কী গলৎ আছে, ইয়া রসুলুল্লাহ? আমার পঞ্চাশ বৎসরের রঞ্জ-কশি কি তবে সব পণ্ড হইয়াছে?

—বলিয়া পীর সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফী সাহেবের অচেতন দেহের মধ্য হইতে আওয়াজ হইল : হে আমার পিয়ারা উন্মৎ, ঘাবড়াইও না। তোমার উপর আল্লার রহমৎ হইবে। তুমি মারফৎ খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফৎ হয়?

পীর সাহেব হাত কচ্‌লাইয়া বলিলেন : হুযুর, আমি কবে শরিয়ত অবহেলা করিলাম?

উত্তর হইল : অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ, তাদের এক বিবি হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানী ফয়েজ হাসিল করিতে চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই। আমি চার বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ? চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চারদিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চার চিজ দিয়া খোদাতালা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কেতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার মযহাব অনুসারে চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এইভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতালা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই

চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে-আমরে নুরে-ইয্‌দানিতে ফানা হইতে হইবে, দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।

পীর সাহেব সকলকে শুনাইয়া হযরতের রুহের দিকে চাহিয়া বলিলেন : এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব?

—তুমি বৃদ্ধ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।

পীর সাহেব মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন : না রেসালত-পানা আমি আর বিবাহ করিব না।

—না কর, ভালোই। কিন্তু তোমার রুহানী কামালিয়ত হাসেল হইবে না। তুমি নুরে-ইয্‌দানির জলওয়া বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। তোমার মুরিদানের কেহই নফসানিয়তের হাত এড়াইতে পারিবে না।

পীর সাহেব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন : আমি নিজের জন্য ভাবি না ইয়া রসুলুল্লাহ; কিন্তু যখন আমার মুরিদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাযী হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়িকে বিবাহ করিব।

—তুমি তওবা আসতাগফার পড়। তুমি খোদার কলম রদ করিতে চাও? তোমার বিবি ঠিক হইয়া আছে। বেহেস্তে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।

—সে কে, ইয়া রসুলুল্লাহ?

—এই বাড়ির তোমার মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।

—ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি মুরিদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব? সে যে আমার বেটার বউ-এর শামিল।

—ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ করিতে পারিবে না?

ইয়া রসুলুল্লাহ, সে যে সধবা!

রজবকে বল স্ত্রীকে তালাক দিতে। কলিমন তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না। আমি আর থাকিতে পারি না। চলিলাম। আর্‌রহমাতুল্লাহ আলায়কুম, ইয়া উম্মতি।

মূর্ছিত সুফী সাহেব একটা বিকট চিৎকার করিলেন। পীর সাহেবের অপর-অপর শাগরেদেরা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মুরিদগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পীর সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন : চাই না আমি রুহানী কামালিয়ত। আমি মুরিদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।

গ্রাম্য মুরিদগণ আখেরাতের ভয়ে পীর সাহেবের অনেক হাতে-পায়ে ধরিল। কিন্তু পীর সাহেব অটল।

এই সময় প্রধান খলিফা সুফী সাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন : এই নিকাহ্ না করিলে কেবল পীর সাহেবের একারই রুহানী নোক্‌সান হইবে না, তাঁর মুরিদগণের সকলের রুহের উপরও বহুত মুসিবত পড়িবে। তখন পীর সাহেব অগত্যা নিজের রেজামন্দী জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন : সোব্‌হান আল্লাহ্! এ সবই কুদ্‌রতে এলাহী! তাঁরই শানে-আযিম! আল্লা পাক নিজেই কোরআন-মজিদে ফরমাইয়াছেন : (আরবি ও উর্দু)...।

বাপ-চাচা পাড়া-পড়শীর অনুরোধে, আদেশে, তিরস্কারে ও অবশেষে উৎপীড়নে তিষ্ঠিতে না পারিয়া রজব তার এক বছর আগে বিয়া-করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিল এবং কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

কলিমনের ঘন-ঘন মূর্চ্ছার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকার্য সমাধা হইয়া গেল।

এমদাদ স্তম্ভিত হইয়া বর বেশে সজ্জিত পীর সাহেবের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার তার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে এক লাফে বরাসনে-উপবিষ্ট পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহ্‌দী-রঞ্জিত দাড়ি ধরিয়া হেচ্‌কা টান মারিয়া বলিল : রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

আর বলিতে পারিল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে মার্ মার্ করিয়া আসিয়া এমদাদকে ধরিয়া ফেলিল এবং চড়-চাপড় মারিতে লাগিল।

এমদাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজের সখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাসা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও।

পীর সাহেবের প্রতি এমদাদের বেয়াদবিতে মুরিদরা ইতিপূর্বে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ছিল। এবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হইল। মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন : এই পাগলটা আমাদের হুযুর কেবলার অপমান করিতেছে। তোমরা কয়েকজন ইহাকে কান ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আস।

ভূলুণ্ঠিত পীর সাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আস্‌তাগফেরুল্লাহ' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙ্গুল দিয়া চিরুণী করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন : দেখিস বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিয দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভালো করিতে পারে? (আরবি ও উর্দু)।

লালশাক একটি পুষ্টিকর খাদ্য

উত্তর আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে লালশাককে আগাছা মনে করা হত। শুধু তাই নয়, আমেরিকা ফসল ও সবজির ক্ষেতে বেড়ে-ওঠা এই আগাছা নির্মূলে কোটি কোটি ডলার খরচ করেছে একসময়। এই নির্বুদ্ধিতার জন্য আমেরিকার অবশ্য দুঃখের শেষ নেই এখন। অপুষ্টিজনিত সমস্যা-আক্রান্ত বিশ্বের জন্য এ একটি দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডই ছিল বটে। এর প্রধান কারণ হল, খাদ্য হিশেবে লালশাক উত্তর আমেরিকার কাছে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই শাক হিশেবে লালশাকের ব্যবহার হয়ে আসছে সাত হাজার বছর আগে থেকে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে মেক্সিকোর আজটেকরা লালশাকের চাষ করত। আজটেক রাজা মনতেজুমাকে বছরে দুশো হাজার বুশেল লালশাক সম্মানী দিতে হত।

লালশাকের প্রথম উৎপত্তি কোথায়—এ নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। কারো মতে ভারতবর্ষ, কেউ বলেন মধ্য-আমেরিকা। তবে যেখানেই হোক-না কেন, লালশাকের বিশেষত্ব হল যে, পুরনো ও নতুন—উভয় পৃথিবীতেই শাক হিশেবে এ আদৃত।

লালশাকের অনেক প্রজাতি রয়েছে। এর কিছু-কিছু প্রজাতি খাদ্য হিশেবে ব্যবহৃত হয়, কিছু-কিছু হয় না। লালশাক খুব কম সময়ের মধ্যে বেড়ে ওঠে। এর বীজগুলো কালো রঙের, তৈলাক্ত। গাছের উচ্চতা, পাতা, পাতার রং, কাণ্ডের ব্যাস ইত্যাদি প্রজাতিতে-প্রজাতিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তাছাড়া বছরের কোন্ সময়টিতে জন্মাচ্ছে সেটাও একটা ব্যাপার বটে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে লালশাকের ব্লিটাম প্রজাতিই হল সবচেয়ে পুষ্টিকর। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লোহা এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' রয়েছে; বাঁধাকপি, ফুলকপি, চীনাকপি ইত্যাদিতেও যা এত পরিমাণে নেই।

বাংলাদেশে লালশাক বহু আগে থেকেই শাক হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রচুর 'এন্‌থোসায়ানিন' থাকায় ব্লিটাম প্রজাতির এই শাক লাল হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশে প্রধানত ব্লিটাম প্রজাতির শাকই জন্মে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলেই ব্লিটাম প্রজাতির লালশাকের চাষ হয় বেশি।

আগস্ট এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে লালশাক লাগানো হয়। পানি সহজে নিষ্কাশন করা যায় এমন উঁচু জমিতে উৎপাদন সবচেয়ে ভালো হয়। কাদাময় মাটিতে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসের বৃষ্টিতে ভেজা কাদাময় জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হয়। এছাড়া বছরের অন্যান্য সময়েও ফলন সম্ভব, তবে আগস্ট-নভেম্বরের তুলনায় উৎপাদন কম হবে।

পুষ্টির দিক দিয়ে বাঁধাকপি, ফুলকপির চেয়েও উন্নত লালশাকের ক্রয়মূল্যও সামান্য। অথচ ঐ দুটো সবজিই প্রচার ও গবেষণায় বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কৃষকের কাছেও লালশাকের আবাদ প্রাধান্য পায় না। কারণ, লালশাক মোটেই অর্থকরী সবজি নয়। এইদিক দিয়ে প্রতিযোগিতায় লালশাকের জয়লাভের কোনো ভরসাই নেই। লালশাকের চেয়ে মরিচের আবাদ বেশি লাভজনক। কৃষক তাই লালশাকের জন্য জমি খরচ না করে অর্থকরী ফসলের আবাদেই আগ্রহী হবে। অথচ অন্য অনেক আদৃত সবজির চেয়ে লালশাক পুষ্টি ও মূল্যের দিক দিয়ে অনেক বেশি বিশ্বস্ত ও সহজপ্রাপ্য।

বেশি বুদ্ধির বিশ্বরেকর্ড

মনস্তাত্ত্বিক টারমান সাহেবের সূচক সংখ্যা অনুযায়ী ১৫০ বুদ্ধ্যঙ্ক (১.০) বিশিষ্ট মানুষকে প্রতিভাবান বলা চলে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে কি উঙ ইয়ঙ (জন্ম ১৯৬৩ সালের ৭ই মার্চ) নামে বিস্ময়কর বুদ্ধির অধিকারী এমন এক কিশোরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যার ১.০-কে ২১০ বলে ধরা হয়।

৪ বছর আট মাস বয়সে টোকিও'র (জাপান) এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে শিশু কিম উঙ ইয়ঙ প্রথমে মুখে মুখে কবিতা ছড়া বানিয়ে দর্শকদের শোনায়, তারপর চারটি ভাষায় (কোরীয়, ইংরেজি, জার্মান ও জাপানি) অনর্গল কথা বলতে থাকে, এরপর বোর্ডে জটিল ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাসের অঙ্ক কষে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয় (১৯৬৭)। কিম এর-মা-বাবা দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং দুজনেরই জন্ম ১৯৩৪ সালের ২৩ মে তারিখে সকাল ১১টায়।

বাদুড় রাতে কেমন করে চলাফেরা করে?

বাদুড় হল এক নিশাচর প্রাণী। রাতের বেলায় এরা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে। অন্ধকারে ঘন বনের মধ্যে কোনোকিছুর সাথে ধাক্কা না-খেয়ে এরা খুব দ্রুতবেগে উড়তে পারে। অন্যকোনো জন্তু বা পাখির এই ক্ষমতা নেই। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য এরা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার এক মজাদার বিষয়।

বাদুড়ের ওপর কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে। একটা পরীক্ষাতে একটা ঘরের ছাদ থেকে অনেকগুলো রশি (দড়ি) ঝুলিয়ে দেয়া হল। তারপর কয়েকটা বাদুড়কে আঠা দিয়ে তাদের চোখ বন্ধ করে ঐ ঘরে উড়তে দেয়া হল। দেখা গেল—বাদুড়গুলো ঐ রশিগুলোর একটারও সাথে ধাক্কা না-খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। পরীক্ষা থেকে এটা প্রমাণিত হল যে উড্ডয়নকালে বাদুড়েরা চোখের ব্যবহার করে না। এরপর তাদের মুখ ও কান বন্ধ করে ঐ ঘরে আবার তাদেরকে উড়তে দেয়া হল। এবার কিন্তু উড়তে গিয়ে বাদুড়গুলো যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হল। খুব ঘনঘন তারা দেয়াল ও রশিগুলোর সাথে ঠোক্কর খেতে লাগল। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে বাদুড়েরা উড়বার সময় তাদের মুখ ও কানকে কাজে লাগায় বা এই দুই অঙ্গের সাহায্য নেয়। তোমরা কি জানো—কেন এমনটি হয়?

উড়বার সময় বাদুড়েরা মুখ থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করে। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত এই তরঙ্গকে শব্দোত্তর তরঙ্গ (ultrasonic waves) বলে। শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক হল ১,০০,০০০ হার্ৎজ। হার্ৎজ হল কম্পাঙ্কের একক। এই শব্দোত্তর তরঙ্গ যদি কোনো বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তা প্রতিহত হয়ে বাদুড়ের কানে ফিরে আসে। বাদুড়ের কান কিন্তু এই শব্দোত্তর তরঙ্গ অনুভব করতে পারে। ফলে উড়বার পথে কোনো বাধাকে শনাক্ত করতে এই শব্দোত্তর তরঙ্গ এদেরকে সাহায্য করে। তার ফলে সেই বাধাকে এরা সহজেই এড়িয়ে যায়।

আমাদের কান কিন্তু শব্দোত্তর তরঙ্গ টের পায় না। তাই আমরা শব্দোত্তর তরঙ্গকে শুনতে পাই না। আমরা শুধু ২০ থেকে ২০,০০০ হার্ৎজ কম্পাঙ্কযুক্ত শব্দই শুনতে পাই।

বাদুড়েরা তাদের চোখ শুধু পোকামাকড় বা অন্য কোনো শিকার দেখবার কাজেই ব্যবহার করে।

হুমায়ুন আজাদ

বাঙলা সাহিত্যের নানা কাল

[বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। এই সাহিত্যের ইতিহাস খুবই ছোটো করে তোমাদের জন্যে পরিবেশন করা হল]

বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। দশম শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে রচিত হচ্ছে বাঙলা সাহিত্য। এ সময়ে সৃষ্টি হয়েছে সুবিশাল এক সাহিত্য। সাহিত্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করে, অনবরত পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে সামনের দিকে প্রবাহিত হয় সাহিত্য। এ যদি না হয় তবে সে সাহিত্য মরে যায়। হাজার বছরে বাঙলা সাহিত্য কয়েকটি বিরাট বাঁক নিয়েছে, এ বাঁকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সাহিত্যের পরিবর্তন-ধারা অনুসারে বাঙলা সাহিত্যকে তিনটি কালে বিভক্ত করা হয়। এ কাল তিনটি হল :

ক. প্রাচীন যুগ : ৯৫০ থেকে ১২০০ অবধি।

খ. মধ্যযুগ : ১৩৫০ থেকে ১৮০০ অবধি।

গ. আধুনিক যুগ : ১৮০০ থেকে আজ পর্যন্ত, আরো বহুদিন পর্যন্ত।

এ তিনটি কালের সাহিত্যই বাঙলা সাহিত্য, কিন্তু তবু বিষয়বস্তুতে, রচনারীতিতে এ তিন কালের সাহিত্য তিন রকম। প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় একটি মাত্র বই, যার নাম চর্যাপদ। এর ভাষা দুর্বোধ্য, এর বিষয়বস্তু দুরূহ। এর কবিরা সকলের জন্যে সাহিত্য রচনা করেননি, করেছেন নিজেদের জন্য। তাছাড়া সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁদের ছিল না। তাঁরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ সাধক, তাঁরা এ কবিতাগুলোতে নিজেদের সাধনার অতি গোপন কথা বলেছেন। তবু মনের ছোঁয়ায় তাতে লেগেছে সাহিত্যের নানাবিধ রঙ ও সৌরভ। এর পরে দেড়শো বছর বাঙলা ভাষায় আর কিছু রচিত হয়নি।

কালো, ফসলশূন্য এ সময়টিকে (১২০০ থেকে ১৩৫০) বলা হয় অন্ধকার যুগ। কেননা এ সময়ে আমরা কোনো সাহিত্য পাইনি। অন্ধকার যুগের পরে পুনরায় প্রদীপ জ্বলল, এল মধ্যযুগ। এ যুগটি সুদীর্ঘ। এ সময়ে রচিত হল অসংখ্য কাহিনীকাব্য, সংখ্যাহীন গীতিকবিতা, মানুষ আর দেবতার কথা একসঙ্গে গীত হল। আগের মতো সাহিত্য আর সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, এর মধ্যে দেখা দিল বিস্তার। এর ফলে সাহিত্যে স্থান পেল দেবতা ও দৈত্য, মানুষ ও অতিমানুষ; এল গৃহের কথা, এল সিংহাসনের কাহিনী। এ সময়ের যাঁরা মহৎ কবি, তাঁদের কিছু নাম : বড় চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, আলাওল, কাজী দৌলত। মধ্যযুগে একশ্রেণীর কাব্যকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য। এগুলো আকারে বেশ দীর্ঘ হয়, কোনো এক দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠার কাহিনী এগুলোতে বলে যান কবিরা। এজন্যে মঙ্গলকাব্য দেবতাদের কাব্য! মধ্যযুগের সকল সাহিত্যই দেবতাকেন্দ্রিক, মানুষ সে সময়ে প্রাধান্য লাভ করেনি। মানুষের সুখদুঃখের কথা এসেছে দেবতার কথা প্রসঙ্গে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা দেবতার ছদ্মবেশে এ সকল কাব্যের মধ্যে সবখানে আছে মানুষ।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলি। এ কবিতাগুলো ক্ষুদ্র; কিন্তু এগুলোতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তাকে তুলনাহীন বলা যেতে পারে। এ কবিতার নায়ক-নায়িকা হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাধা। বৈষ্ণব কবিগণ কখনো রাধার বেশে কখনো কৃষ্ণের বেশে নিজেদের হৃদয়ের আকুল আবেগ প্রকাশ করেছেন এ কবিতাগুলোতে। মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা একটি নতুন প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথম শোনালেন মানুষের গল্প। মধ্যযুগের হিন্দু কবিরা দেবতার গান ও কাহিনী রচনায় যখন সমর্পিত তখন মুসলমান কবিরা ইউসুফ-জুলেখা বা লাইলি-মজনুর হৃদয়ের কথা শোনালেন। এর ফলে দেবতার বদলে প্রাধান্য লাভ করল মানুষ। এ মানুষ যদিও কল্পনার সৃষ্টি, তবু মানুষের কথা সবার আগে বলার কৃতিত্ব মুসলমান কবিরা দাবি করতে পারেন।

মধ্যযুগের অবসানে এল আধুনিক যুগ, এইতো সেদিন, ১৮০০ সালে। আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় দান হল গদ্য। প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে বাঙলা ভাষার গদ্য বলতে কিছুই ছিল না। তখন ছিল কেবল কবিতা বা পদ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা সৃষ্টি করলেন বাঙলা গদ্য। এদের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেরির সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। ঊনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধেক কেটেছে সদ্য জন্মলব্ধ গদ্যের লালনপালনে। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভঙ্গিতে গদ্য রচনা করেছেন, আর বিকশিত হয়েছে বাঙলা গদ্য। সে সময়ের যাঁরা প্রধান গদ্যলেখক, তাঁরা হলেন—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত। গদ্যের সঙ্গে সাহিত্যে এল বৈচিত্র্য, উপন্যাস সৃষ্টি হল, রচিত হল গল্প, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ আরো কত কী। প্রথম উপন্যাস লিখলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, উপন্যাসের নাম আলালের ঘরের দুলাল। মহাকাব্য রচনা করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাম মেঘনাদবধ কাব্য। মধুসূদন দত্ত হলেন আধুনিককালের একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। তাঁর হাতে সর্বপ্রথম আমরা পেলাম মহাকাব্য ও সনেট, পেলাম ট্যাজেডি, নাম কৃষ্ণকুমারী নাটক, পেলাম প্রহসন, নাম বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা। এরপরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ। তারপরে এলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এবং আরো কত প্রতিভা। এঁরা সবাই বাংলা সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

প্যারাশুট আবিষ্কার

জীবনটাকে হাতে নিয়ে নিজেকে জমাট-বাঁধা শূন্যতায় ভাসিয়ে দিয়ে নেমে আসতে হয় পানিতে বা মাটিতে। কখনো প্রাণের তাগিদে, কখনো বা নিছক খেলা হিশেবেই প্যারাশুট নিয়ে এভাবে ঝাঁপ দিতে হয় আকাশ থেকে। দুর্ঘটনার ভয়ে সাহসী মানুষের দল পিছিয়ে যাননি। বিদেশের বহু জায়গায় প্যারাশুটিং জনপ্রিয় হয়েছে।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ঝকঝকে নীল আকাশের গায়ে এক জঙ্গিবিমানের ডানায় তখন অস্তগামী সূর্য রক্তরশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতীয় জঙ্গিবিমানটি পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের মাঝ-আকাশে সদর্পে চক্কর মারছে। হঠাৎ বিমানের খোলা পেট থেকে একজন মানুষ বাইরে ঝুঁকে বিমানের ঝাঁকুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলতে লাগল। না, কোনো পাগল যাত্রী নয়, ইনি হলেন ভারতীয় প্যারাশুট-বাহিনী '৭৮৪ প্যারা'র এক মারাঠী জাম্পার, মহাদেও গুরং। চলেছেন তিনি সাতটি ফেয়ারচিল্ড প্যাকেট যুদ্ধবিমানের সবার আগেরটাতে। পূর্ব-পাকিস্তানে নামতে হবে যুদ্ধের জন্য। সঙ্গে একই বিমানে আরও উনচল্লিশজন দক্ষ প্যারাট্রুপার সেনা।

বিমানের দরজায় সবুজ আলো জ্বলে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ এল : 'অ্যাকশন স্টার্ট'। কালবিলম্ব না করে ঝাঁপ দিলেন মহাদেও শূন্যের বুকে। শোঁ-শোঁ আওয়াজে হাওয়া কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গুন্‌তে লাগলেন হাজার এক, হাজার দুই, হাজার তিন, হাজার চার—। কী হল? এবার তো প্যারাশুট খুলে যাওয়ার কথা! তাঁর পিঠের সঙ্গে বিমানের দরজায় বাঁধা নাইলনের দড়ি দেহভারে ছিঁড়ে গিয়ে ছাতার মতো প্যারাশুট বেরিয়ে আসার সময় তো পেরিয়ে গেছে। অবাক কাণ্ড! দড়ি

ছিঁড়ল না তো। অসহায় অবস্থায় তিনি বিমান থেকে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ঝুলে আছেন আর বিমান চলতে শুরু করেছে আরও দ্রুতগতিতে। পাশ দিয়ে আরও কয়েকজন নেমে গেল ঝাঁপ দিয়ে। উত্তেজনায় তাঁর মাথা থেকে ক্রাশ হেলমেটও পড়ে গেল। মহাদেও বুঝতে পেরেছেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনের পরদায় ভেসে উঠল তাঁর স্ত্রী কুসুম আর মেয়ে আশা আর শশিকলার মুখ। কিন্তু না, ঠিক সময়েই বিমানের সঙ্গীরা হাত লাগিয়েছে। তারা মহাদেওর পিঠে-বাঁধা দড়ি ধরে উপরে টেনে তুলে সাহায্যকারী প্যারাশুট লাগিয়ে দিয়েছে। ১৩ মিনিট শূন্যে ঝুলে তিনি চলে এসেছেন লক্ষ্যস্থল থেকে ১৫ মাইল দূরে। দড়ি কেটে দিতেই বিশাল ছাতার মতো প্যারাশুট খুলে গেল মাথার উপরে। আস্তে-আস্তে মহাদেও নেমে এলেন বাংলাদেশের ধানক্ষেতের মধ্যে এক পুকুরে। যোগ দিলেন যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে প্যারাশুট পরে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়ার জীবন-মরণ খেলা।

আকাশযান থেকে কোনো প্রয়োজনে বা বিপদকালে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে নেমে আসার জন্য কাপড়ের বিরাট ছাতার মতো যে-বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয় তার নামই প্যারাশুট। প্যারাশুট কথাটা এসেছে ইতালীয় 'প্যারা' এবং 'শুট' শব্দের সমন্বয়ে। 'প্যারা' মানে 'বাধা দেওয়া' আর 'শুট' মানে 'পড়া' অর্থাৎ পতন থেকে রক্ষাকারী বস্তুর নামই প্যারাশুট। যারা প্যারাশুটটি পরে আকাশে ঝাঁপ দেয় তাদের বলা হয় প্যারাট্রুপার বা স্কাইডাইভার। এদের পিঠে বাঁধা থাকে একটি ব্যাগ, যাতে থাকে ভাঁজ-করা প্যারাশুট। একটি দড়িও ব্যাগ থেকে বেরিয়ে যুক্ত হয়ে থাকে বিমানের সঙ্গে। যখন প্যারাট্রুপার দরজা পার হয়ে লাফিয়ে পড়ে, তার শরীরের ওজনে ওই নাইলনের দড়ি ছিঁড়ে যায়, আর হাওয়ার চাপে পাতলা নাইলনের কাপড়ের তৈরি প্যারাশুট খুলে যায়। প্যারাশুটের ছাতার হালকা কাপড়কে বলা হয় 'ক্যানপি', আর এই কাপড়ের সঙ্গে যুক্ত যে-দড়িগুলো নেমে আসে প্যারাট্রুপারের কাঁধ পর্যন্ত, সেগুলোকে 'লাইনস' বলা হয়। তাছাড়া যে-দুটি বেল্টে প্যারাট্রুপার হাত গলিয়ে প্যারাশুট পরে তার নাম 'হারনেস'।

মানুষের শূন্যে ওড়ার ইচ্ছে থেকেই প্যারাশুটের জন্ম। জানা যায়, বহু আগে চিনা-সৈনিকরা তাদের সম্রাটকে খুশি করার জন্য পেটের বেল্টের সঙ্গে বড়সড় ছাতা বেঁধে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে নামত। প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যানধারণা নিয়ে প্যারাশুট কল্পনা করেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। এরপর সিবাস্টিন লে নরম্যান্ড নামে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কল্পিত 'উড়ন-ছাতা'কে বাস্তব রূপ দেন। তিনি ১৭৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর মন্টেপেলিয়ের অবজারভেটরি টাওয়ার থেকে প্যারাশুট পরে ঝাঁপ দেন। বিশ্বের প্যারাশুট ইতিহাসে যিনি প্রথম নিয়মিত প্যারাশুট পরে ঝাঁপ দিতেন তাঁর নাম অ্যান্ড্রু জে গারনেরিন। প্যারিসে ২০০০ ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি এই জীবন-মরণ খেলাটি শুরু করেন।

সেটা ছিল ১৭৯৭ সাল। এর কয়েক বছর পর অ্যান্ড্রু জে গারনেরিন ইংল্যান্ডে প্রদর্শনী ঝাঁপের আয়োজন করেন এবং সেখানে ৪০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে-যাওয়া বেলুন থেকে প্যারাশুট পরে নেমে আসেন। এই প্রদর্শনীতে কাতারে-কাতারে মানুষ জড়ো হয়েছিল ওই মরণ-ঝাঁপ দেখতে। তখন প্যারাশুটের সুবিধাযুক্ত আধুনিক রূপের বদলে একটি ঝুড়িতে মানুষকে বসিয়ে তাতে প্যারাশুট লাগিয়ে ফেলে দেওয়া হত বেলুন থেকে।

সর্বপ্রথম মহিলা জাম্পার হিশেবে গানেরিনের ভাইজি এলিজার নাম করা যেতে পারে। বিমান থেকে ঝাঁপ দেবার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম অর্জন করেন আমেরিকার ক্যাপ্টেন বেরি, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে। এরপর বিশ্বযুদ্ধের ডাকে এগিয়ে গিয়েছিলেন এইসব প্যারাট্রুপাররা, সৈন্যবাহিনীতে এঁদের তখন বেশ কদর। জার্মান প্যারাট্রুপাররা তো অনবরত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শূন্যে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়তেন

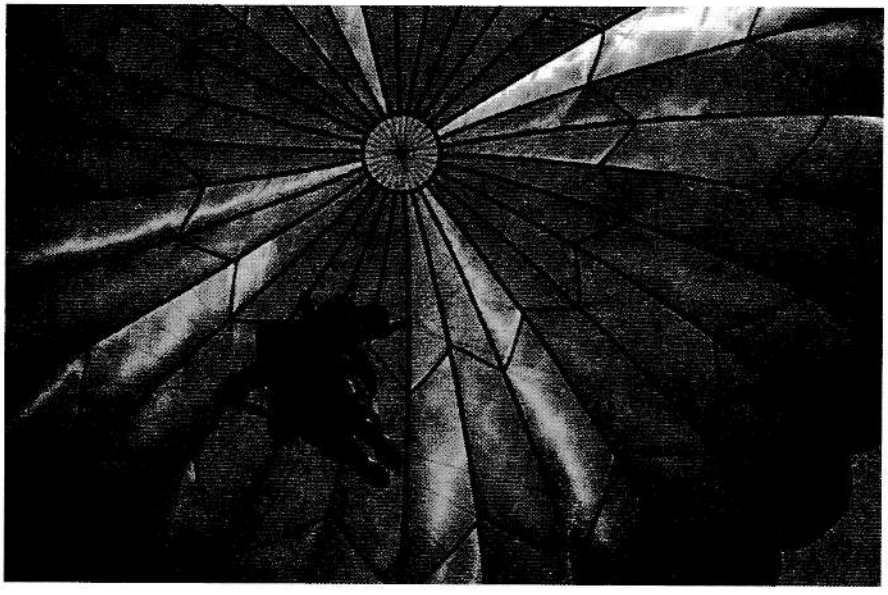

শত্রুপক্ষের মাটিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সব দেশেই প্যারাশুটের চর্চায় ভাটা পড়লেও আমেরিকাতে রীতিমতো চালু হয়েছিল এই লোমহর্ষক খেলা।

আমাদের দেশে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়া শুরু হয় ১৯৪৩ সাল নাগাদ। তখন ডাকোটা থেকে চাকলালাতে ঝাঁপ দেওয়া শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। ক্যাপ্টেন রঙ্গরাজ আর হাবিলদার মাথুর সিংই প্রথম জাম্পার। এরপর ভারতের সেনাদলে প্যারাশুট-বাহিনীর চল্ হয় ১৯৪৫ সালের ১ মার্চ। তখন ভারতে ভ্যালেনসিয়া নামক বিমান ব্যবহার করা হত প্যারাট্রুপারদের ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই বাহিনী আরও সমৃদ্ধিলাভ করে, কৃতিত্বও আদায় করে নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্যারাট্রুপার নামানোর ঘটনা প্রথমেই বলেছি। এলিফ্যান্ট পয়েন্টে জাপানি সেনাদের বিরুদ্ধে, কোরিয়ায়, গোয়ার মুক্তিযুদ্ধেও আকাশ থেকে সৈন্য নামানোর জন্য প্যারাশুটের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এখনও সগৌরবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ভারতের প্যারাট্রুপার-বাহিনী। তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে প্রধানত আগ্রায়। কিছুদিন আগে আমরা মোহনবাগান মাঠে আয়োজিত এক প্রীতি-ম্যাচের আগে যে-সেনাদের প্যারাশুট পরে আকাশ থেকে নামতে দেখেছিলাম তারাও এসেছিলেন আগ্রা থেকেই।

একবার ভাবো তো : কয়েক মাইল উঁচু দিয়ে উড়ে-যাওয়া উড়োজাহাজের খোলা দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে কেমন লাগে! নিচে পৃথিবী বিছিয়ে দিয়েছে সবুজ গালিচা। বাড়িঘর, গাছপালা সব মিলেমিশে একাকার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আলাদা করে। এই অবস্থায় ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে প্যারাট্রুপারদের মনের অবস্থা আন্দাজ করা যায় কি? যত সাহসীই হোন বুক কাঁপবেই, মনে পড়বে প্রিয় মানুষজনদের কথা। বিমানের দরজার কাছেই থাকেন ডেসপ্যাচাররা, যাঁদের কাজ হল নির্বিঘ্নে প্যারাট্রুপারদের নামতে দেওয়া। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জাম্পাররা নামার আগে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু কিছুতেই লাফিয়ে পড়তে চাইছে না। তখন ডেসপ্যাচাররা তাঁদের

জোর করে ঠেলে ফেলে দেন, এমনকি লাঠি দিয়ে মেরেও ফেলে দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় নামতে অস্বীকার করলে আরও কড়া বন্দোবস্ত নেওয়া হয়।

আর-এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, নাইট জাম্প। গভীর রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য দরকার আরও মনের জোর। জীবনটাকে হাতে নিয়ে কোনোরকমে নিজেকে জমাট-বাঁধা কালো শূন্যতায় ভাসিয়ে দিয়ে নেমে আসতে হয় জলে বা মাটিতে। শুধু যে নামতেই ভয় তা নয়, ভয় আকাশে, ভয় ডাঙায় কিংবা জলেও। ঠিকমতো না নামতে পারলে যে কত দূরে গিয়ে পড়তে হবে তার ঠিক নেই। শিক্ষার সময় সাধারণত একটি বড় ছাদে বৃত্তাকার জায়গায় নামতে বলা হয়। বৃত্তের কেন্দ্রকে বলা হয় বুলস আই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড হাওয়ার খপ্পরে পড়ে কিংবা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে জাম্পাররা বিপদে পড়েন। যেমন মোহনবাগান মাঠে নামতে গিয়ে এক প্যারাট্রুপার দূরে এক বহুতল বাড়ির ছাদে নেমে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি বিপদ দেখা দেয় প্যারাশুট না খুললে। সেক্ষেত্রে যে কী হবে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। আর প্যারাশুট যদি আগেভাগেই খুলে যায় বিপদ সেখানেও। সেক্ষেত্রে খুলে-যাওয়া বিশাল ক্যানপি বিমানে লেগে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

কিন্তু শুধু দুর্ঘটনার ভয়ে কি পিছিয়ে আসবেন বুদ্ধিমান আর সাহসী মানুষের দল? তা হতে পারে না। তাই আজ বিদেশের বহু জায়গায় প্যারাশুটিং জনপ্রিয়, সেইসঙ্গে রোমাঞ্চকর খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যবাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে প্যারাট্রুপারদের ক্লাব, শিক্ষণ-কেন্দ্র ইত্যাদি। আমেরিকা এই ব্যাপারে বেশ এগিয়ে, সেখানে আছে গোল্ডেন নাইটসহ আরও কিছু সংস্থা। বিখ্যাত প্যারাশুটিং সংস্থা হিসাবে ব্রিটিশ ন্যাশনাল স্কাইডাইভার অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্যাটাপিলারের নাম করা যেতে পারে।

আকাশ-সংক্রান্ত যে-কোনো কাজেই প্যারাশুটের জুড়ি মেলা ভার। হঠাৎ শূন্যের বুকে উড়ন্তযান বিকল হয়ে গেলে প্যারাশুটের সাহায্য নিতেই হয়। তবে বিপন্ন যাত্রীদের ফেলে বিমানচালকের প্যারাশুট পরে পালিয়ে

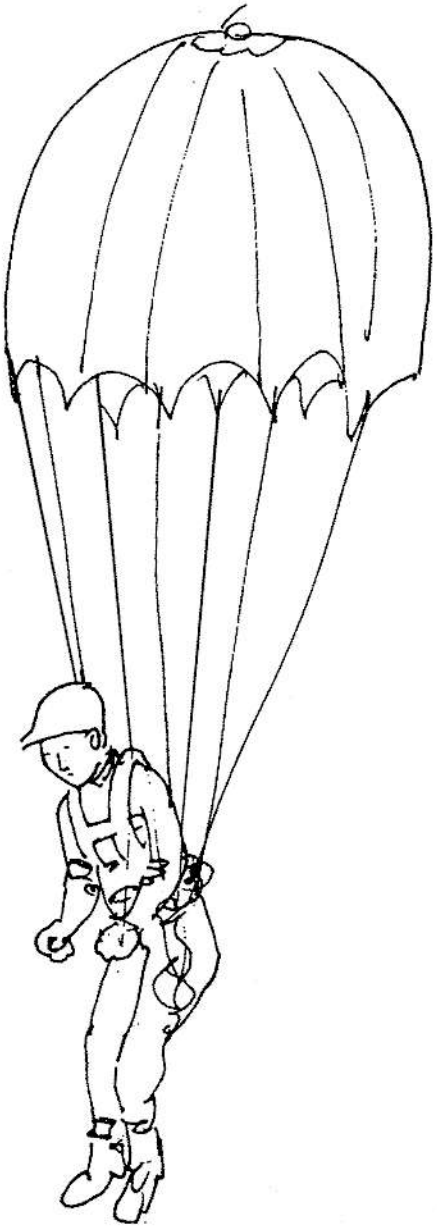

আসা অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্যারাশুট ত্যাগ করে চালককে শূন্যে ভেসে বাঁচতে হয় বইকি। চাইলে আসনে বসে-থাকা অবস্থাতেই সুইচ টিপে আসনসমেত শূন্যে বেরিয়ে আসতে পারেন বিমানচালক। তারপর প্যারাশুট খুলে তাঁকে ভাসমান অবস্থায় নামিয়ে আনে প্যারাশুট।

শুধু মানুষই নয়, বিভিন্ন মালপত্রও প্যারাশুটবাহিত হয়ে নেমে আসতে পারে যে-কোনো আকাশযান থেকে। এমনকি গাড়ি পর্যন্ত নামানো হয়ে থাকে একাধিক প্যারাশুট জুড়ে দিয়ে। অনেকগুলো প্যারাশুট একসঙ্গে ব্যবহার করে ২০ টন মালপত্র পর্যন্ত নামানো সম্ভব হয়েছে।

যুদ্ধের সময় প্যারাট্রুপার বাহিনীর ব্যস্ততা সবাইকে ছাপিয়ে যায়। সেনাসমেত অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো বা যুদ্ধরত সেনাদের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে প্যারাশুটের ভূমিকা অনিবার্য। এছাড়া দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা খরাকবলিত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মূল দায়িত্ব অনেক সময় প্যারাট্রুপারদের ওপর পড়ে। বহু চিকিৎসক আছেন, যাঁরা নিজেরাই প্যারাট্রুপার এবং বিপদের সময় নিজেরা আকাশপথে নেমে আর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করেন। কিছুদিন আগে বিতর্কিত আকাশ-অভিযানের শামিল হয়েছিল ভারতীয় বিমানবাহিনী। শ্রীলঙ্কার বিপদগ্রস্ত তামিলদের জন্য প্যারাশুট করে ২৫ টন ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল জাফনা এলাকায়। এই ধরনের অভিযানে প্যারাশুট ছাড়া অন্য কোনোভাবে সফল হওয়া সম্ভব নয়। অবতরণের দুর্দান্ত গতি কমানোর জন্যও প্যারাশুট ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকায় প্যারাট্রুপারদের এক বিশেষ দফতর আছে অগ্নিনির্বাপণের জন্য। বনে বনে দাবানল নেভাতে এই বিশেষ প্যারাট্রুপার দলকে কাজে লাগানো হয়। অস্যাপোলো এবং জেমিনি—এই দুটি মহাকাশযান যখন বিকল হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছিল, তখন তাদের পতনের গতি রোধ করতে জোড়া-জোড়া বিশাল প্যারাশুট কাজে লাগানো হয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশযানের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল প্যারাশুটগুলো। বব সিনক্লেয়ারের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। এই মানুষটি একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যান, আর সেইসঙ্গে অভিজ্ঞ প্যারাট্রুপার। চোখে মুভি-ক্যামেরা বেঁধে আকাশপথে উড়ন্ত অবস্থাতেই ইনি ছবি তুলেছেন অনেক।

হাস্যকৌতুক

সম্রাট আকবর সেদিন যমুনার তীরে তাঁর সুন্দর উদ্যানে বসে অস্তগামী সূর্যের শোভা দেখছিলেন একদৃষ্টিতে। এমন সময় বীরবল এসে বসলেন পাশে এবং প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা সম্রাট, সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে মুখ লুকোয় কেন প্রতিদিন?

সম্রাট বিরক্ত হয়ে বললেন : তোমার মতোন কোনো এক নির্বোধের কাছে যাও, এর জবাব পাবে।

সেইজন্যই তো আপনার কাছে এলুম, সম্রাট।

সম্রাট অত্যন্ত বাকরসিক ব্যক্তি। তাঁর বিরক্তমুখ দেখতে দেখতে খুশিতে ভরে উঠল বীরবলের বাক্যবাণে। তিনি তাঁর কণ্ঠের মণিরত্নমালা খুলে বীরবলের গলায় সাদরে পরিয়ে দিলেন।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্প কেন হয়?

বহু যুগ ধরেই মানুষ ভূমিকম্পকে দেবতার অভিশাপ বলে মনে ক'রে এসেছে। কিন্তু জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পেরেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে দেবতার রোষের কোনো সম্পর্কই নেই। তাহলে ভূমিকম্প কেন হয়?

ভূমিকম্পের মূলে রয়েছে কিছু প্রাকৃতিক শক্তির কার্যকারণের সম্পর্ক। মনীষী অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) বলেছিলেন, ভূপৃষ্ঠের নিচে জমে থাকা গ্যাস মুক্তির জন্য শিলাস্তরে ক্রমাগত আঘাত করে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি করে। আরেক গ্রিক মনীষী লুক্রেটিয়াস বিশ্বাস করতেন ভূগর্ভের কোনো গুহা যখন কোনো দুর্যোগে ভেঙে পড়ে, তখনই ভূস্তরে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। তবে বিগত কয়েক শতাব্দি ধরে বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানীর গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে ভূমিকম্পের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত কারণ। যাঁদের নিরলস পরিশ্রেমে ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ম্যালে, মিলনে, রিড, ইমানুরা, ওমরী প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানী।

সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন (১) ভূপৃষ্ঠজনিত, (২) আগ্নেয়গিরিজনিত এবং (৩) শিলাচ্যুতি-জনিত।

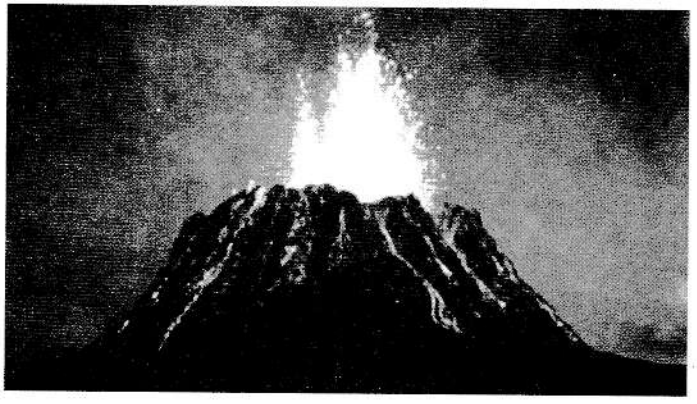

(১) ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ : পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ১৯১১ সালে তুর্কিস্তানের ভূমিকম্পে পামির উপত্যকা অঞ্চলে ৫০,০০০ কোটি টন ওজনের বিশাল ধস (Landslide) পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এই বিরাট ধস নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ভূবিজ্ঞানী আর ডি ওল্ডহ্যামও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অনেক সময়ে ভূকম্পনের ফলেই পাহাড়ি জায়গায় বিরাট আকারের ধস নামতে শুরু করে। কিন্তু ধস আগে, না ভূমিকম্প আগে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে'র মতোই জটিল। এছাড়া অন্যান্য কারণে, যেমন, মহাদেশের উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতেও ভূমিকম্পনের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে যে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়, তা মৃদু হলেও কলকাতার আবহাওয়া-অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

(২) আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ : ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের জন্ম হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের (Crater) ভেতরের ভূস্তরে আঘাত করতে থাকে। সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। এভাবেই ১৮৮৮ সালে সুমাত্রার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে গলিত লাভা উদ্‌গীরণের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। সে বছরেই জাপানের বন্দইসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোত বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পন অনুভব করা গিয়েছিল।

(৩) শিলাচ্যুতিজনিত কারণ : আধুনিক ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ভূগর্ভের ভেতরে ভেতরে শিলাচ্যুতিই ভূমিকম্পের মূল কারণ। ১৯০৬ সালের সানফ্রানসিসকো ভূমিকম্পের সঙ্গে সান আনড্রিয়াস শিলাচ্যুতির (Fault) সম্পর্ক লক্ষ্য ক'রে অধ্যাপক এইচ এফ রিড ভূমিকম্পের কারণ দেখিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঘোষণা করেন। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বটির (Elastic rebound theory) সাহায্যেই ভূমিকম্পের জটিল গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তাঁর মতে ভূমিকম্পের আগে সম্ভাব্য শিলাচ্যুতি তলের (Fault plane) দুপাশে নানা কারণে ক্রমশ টান পড়তে থাকে। ফলে

শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে ক্রমে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত ও স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity) সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে, মনে হয় কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তরটিকে ভেঙে দু'টুকরোয় আলাদা করে দিয়েছে। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে শিলাস্তরটির একটি অংশ ওপরে উঠে যায় আর অন্য অংশটি নেমে আসে নিচে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে আশপাশের সমস্ত শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের।

শিলার এ ধরনের চ্যুতি-বিচ্যুতি ভঙ্গিল পর্বতমালার (Fold mountain) মধ্যে বেশি। তাই এসব অঞ্চলেই আকছার ভূমিকম্প হয়। ১৮৯৭ সালের আসাম ভূমিকম্পে চিদরং শিলাচ্যুতির ফলে একটি শিলাস্তর প্রায় ১০.৫ মিটার নিচে নেমে গিয়েছিল। পেরু (১৯৭০), ইরান (১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৩) কিংবা মেকসিকোর (১৯৮৫) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এইসব ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সম্ভব?

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কি সম্ভব, এই প্রশ্নটি নিয়ে শুধু সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীরা নয়, পুরনো দিনের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরাও বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব কিনা— এ সম্পর্কে প্রাচীনকালে যেসব দেশে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তার মধ্যে জাপান, চীন, ভারত ইত্যাদি কয়েকটি দেশ নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য।

প্রাচীনকালের কিছু কিছু কাহিনী পড়ে জানা যায়, ভূমিকম্পের আগে পানির মধ্যে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ওঠে মাছ (বিশেষত মাগুর মাছ), ব্যাঙ ও সাপ মাটির তলার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, আকাশে আচমকা রামধনু ফুটে ওঠে, চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা কুয়োর পানি হয়ে ওঠে ঘোলাটে।

ভূমিকম্পের আগে মাগুর মাছের চঞ্চল হয়ে ওঠবার ব্যাপারটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালান জাপানি ভূপদার্থবিদ টেরাদা। সমীক্ষায় তিনি এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে সবচেয়ে প্রথমে যিনি তাৎপর্যময় গবেষণা করেছেন, তিনি হলেন চীনা বিজ্ঞানী জান হেন (৭৮-১৩৯ সাল)। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ঠিক করবার জন্য তিনি এক ধরনের পাত্রের ভেতরে রাখেন একটি ঝুলন্ত পেন্ডুলাম, তার সঙ্গে ৮টি কপিকল কোনাকুনি জোড়া। প্রত্যেকটি কপিকলের বাইরের দিকে শেষ প্রান্তে লাগানো ৮টি ড্রাগন। প্রত্যেকটি ড্রাগনের হাঁ-করা মুখে একটি ক'রে বল আটকানো রয়েছে। ভূমিকম্পের সময় কপিকলে টান পড়লেই ড্রাগনের মুখ পুরোপুরি খুলে বল পড়ে যায় নিচে। আর পড়বি তো পড়, পড়ে নিচে বসিয়ে রাখা ব্যাঙের মুখে। ড্রাগনের মুখ থেকে ব্যাঙের মুখে বল পড়েলেই বুঝতে হবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই প্রাচীনকালেই যে এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরের ভূমিকম্পও বুঝতে পারা যেত, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রতিবছর ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ মারা যায়। তাই ভূমিকম্প সম্বন্ধে যদি পূর্বাভাস দেয়া যায়, তবে এই মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের অর্থ হল, কোথায় কখন কতটা তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে তা আগেভাগে বলতে পারা। এখনো পর্যন্ত কোথায় কতটা তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে, তা হয়তো মোটামুটিভাবে বলতে পারা সম্ভব, কিন্তু কবে, কখন হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা খুবই বিব্রত। একথা জানা আছে, ভূমিকম্পের কিছু দিন আগে থেকেই ভূমিকম্পগ্রস্ত অঞ্চলের ভূমি মৃদুভাবে কাঁপতে থাকে আর মাঝে মাঝে তা হেলে পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির এই কাঁপুনি রেকর্ড ক'রে ও ভূমি হেলে পড়ার খবর

ভূমিকম্প পূর্বাভাস কেন্দ্রে পাঠানো হলে তা বিশ্লেষণ ক'রে ভূমিকম্পের দিনক্ষণ আগাম বাতলে দেওয়া অনেকটাই সম্ভব। তবু এখনো পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও তথ্য বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকায় ভূমিকম্পের আগাম আভাস নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এসব নানা অসুবিধে সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানে। নানা আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে রাশিয়ান ভূবিজ্ঞানীরা ১৯৬৬ সালের (২৬ এপ্রিল) তাশখন্দ ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাস করতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর আগে একটি বড় আকারের ভূমিকম্প পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে চীনে। এই কেন্দ্র থেকে সাম্প্রতিককালের দুটি বড় আকারের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করাও সম্ভব হয়েছে।

ভূমিকম্প-বিশারদরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভূমিকম্প সম্পর্কে শুধু পূর্বাভাস নয়, ভূমিকম্প যাতে না হয় অথবা তীব্রতা কমে যায়, এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব হবে।

লেপ-তোশক রোদে দিই কেন

বর্ষার শেষে বা শীত পড়ার মুখে লেপ-তোশককে রোদ খাওয়ানোর একটা রীতি চালু আছে। কিন্তু কেন?

লেপ-তোশকে যেসব তুলোর তন্তু আছে, সেগুলো সেলুলোজের। সেলুলোজ বহু গ্লুকোজ অণুর সুবিন্যাস করা একটা রাসায়নিক সমষ্টি। এই অণু জল টানে আর অতি সহজেই তা জলে স্যাঁতসেতে হয়ে ওঠে।

বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি। লেপ-তোশকের তন্তু জল টেনে নিয়ে ভেজা-ভেজা হয়ে যায়। ফলে তাতে নানা ধরনের ছত্রাক জন্মাতে পারে আর সেলুলোজও নষ্ট হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। এও একধরনের পচন। এই পচন ঠেকানোর জন্যে বর্ষার শেষে লেপ-তোশককে রোদ খাওয়ানো হয়।

বর্ষায় যে আর্দ্রতা চলে আসে লেপ-তোশকে, রোদের গরমে তা বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়। তখন তন্তুপুঞ্জ ফাঁক-ফাঁক হয়ে ফেঁপে ওঠে। ফলে লেপ-বালিশে কিছুটা ফুলো-ফুলো ভাব আসে। এই সময়ে ঝাড়াঝাড়ি করলে বা লাঠি দিয়ে পেটালে ধূলিকণা, এমনকি যদি কোনো সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মে থাকে লেপ-তোশকের তুলোর তন্তুতে, সেগুলোও ঝরে পড়ে।

চাকা ঘোরে জলের টানে

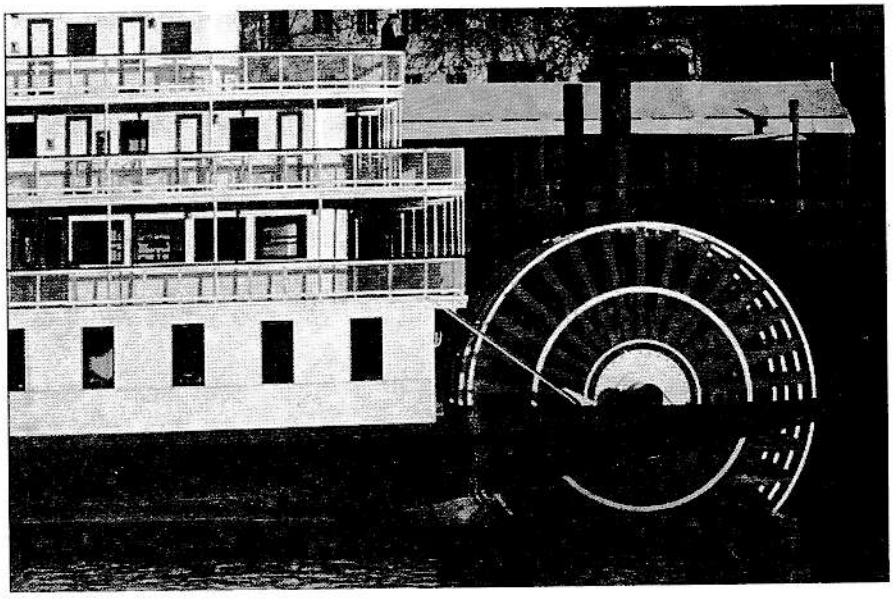

সেই কোন্ আদিম যুগে হাতদুটোকে কাজে লাগাতে শিখেই মানুষ হাতিয়ার বানিয়েছিল। তারপর যখন সে যন্ত্র বানাতে শিখল তখন হাতিয়ার তৈরির কাজটা সহজ হয়ে গেল। চাকা বানানোর কায়দাটাও মানুষ রপ্ত করেছিল সেই আদ্যিকালে। চাকার ওপর চেপে এল গাড়ি। প্রথমে মানুষই ঠেলত সেই গাড়ি। কোনোকিছু পিঠে চাপিয়ে টেনে নেওয়ার বদলে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়াটা তো সোজা। পরে মানুষ বুদ্ধি করে জন্তুকে জুড়ে দিল গাড়ির সঙ্গে। তখনই ঠেলার কষ্ট থেকেও রেহাই। তারপর অনেকদিন বাদে পানি ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করে বাষ্পের শক্তি দিয়ে যেদিন চাকা ঘোরানো গেল—সেদিন মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে এল অনেকটা।

বাষ্পের যে এত জোর তা টের পেয়েছিল এক ছোট্ট ছেলে। নাম : জেমস ওয়াট। শোনা যায়, চায়ের কেটলিতে পানি ফোটার সময় বাষ্পের প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে ধারণাটা এসেছিল জেমসের মাথায়।

বাষ্পের শক্তিকে তার আগে কেউ কাজে লাগানোর কথাটা যে ভাবেনি তা অবশ্য নয়। দু হাজার বছর আগে প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের গ্রিকবিজ্ঞানী 'হিরো' বাষ্পের সাহায্যে মন্দিরের দরজা খোলার কথা বলে গেছেন। টমাস নিউকোমন নামে এক কারিগর প্রথম কাজ-চলা-গোছের এক বাষ্পীয় যন্ত্র বানিয়েছিলেন এখন থেকে তিনশো বছর আগে। সে-সময়ে মাটির নিচে টিনের খনি থেকে জমা পানি তোলা হত চাকা আর কপিকলের সাহায্যে। চাকা ঘোরানোর কাজটা করত ঘোড়া। নিউকোমন বাষ্পের সাহায্যে একটা পিস্টনকে ওপর-নিচে উঠিয়ে নামিয়ে পানি তোলার ব্যবস্থা করেন।

নিউকোমনের যন্ত্রে একটা বয়লারে পানি ফোটাতে হত, বাষ্প গিয়ে ঢুকত ওপরের একটা চোঙায়। চোঙায় থাকত পিস্টন—যেন বড়সড় একটা পিচকিরি। বাষ্প সেই পিস্টনকে ঠেলে ওপরে তুলে দিত। পরে চোঙাটাকে ঠাণ্ডা করলেই পিস্টন নেমে আসত নিচে। এইরকম চলত বারবার।

নিউকোমনের ইঞ্জিন যাতে আরো ভালোভাবে কাজ করে তার ব্যবস্থা করলেন জেমস ওয়াট। ইতিমধ্যে উনি কারিগরি নিয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং নিজের শহরে যন্ত্রপাতি মেরামতির দোকান খুলে বসেছেন। নিউকোমনের ইঞ্জিন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে উনি দেখলেন—ওটার একটা বিরাট খুঁত হল : বারবার চোঙাটাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। এতে সময় যায়, বাষ্প তৈরি করতে গিয়ে যে তাপ খরচ হয় তাও শুধুশুধু নষ্ট হয়।

টানা পাঁচ বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে জেমস ওয়াট শেষে নিজেই বানিয়ে ফেললেন নতুন এক ইঞ্জিন। তিনি আগেকার যন্ত্রের সাহায্যে চোঙার ওপর আর-একটা কুঠুরি বানালেন, মাঝে রইল ভালব—যাতে চোঙা থেকে ওখানে বাষ্প ঢুকতে পারলেও বেরনোর রাস্তা বন্ধ। পিস্টনের চাপে চোঙার বাষ্প যেই কুঠুরিতে ঢুকল, চোঙার মধ্যে তার আর ফিরে আসার উপায় নেই। ওপরের কুঠুরিটাকে অনবরত পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা। ফলে জলীয় বাষ্প আবার জমে পানি। কুঠুরি ফের আগের মতোই ফাঁকা। কাজেই পিস্টনের ওঠানামার জন্য চোঙাকে আর বারে বারে ঠাণ্ডা-গরম করতে হয় না।

চোঙার মাথায় কুঠুরি লাগিয়েই বাজিমাত করলেন জেমস ওয়াট। ওতেই যন্ত্রের ক্ষমতা একলাফে চারগুণ বেড়ে গেল। পরে পিস্টনের সঙ্গে এমনভাবে চাকা জুড়ে দেওয়া হল যাতে পিস্টন যখন সামনে যায়, চাকা তখন অর্ধেকটা ঘোরে। যখন পিছোয়, চাকার বাকি অর্ধেকটা ঘোরে তখন।

ব্যস! তৈরি হয়ে গেল রেলগাড়ির ইঞ্জিন। শুধু রেলগাড়িই নয়, আগে যতরকম কাজ মানুষকে গায়ের জোরে করতে হত, তার প্রায় সব জায়গাতেই এসে গেল স্টিম ইঞ্জিন, আর তাতে পৃথিবীর

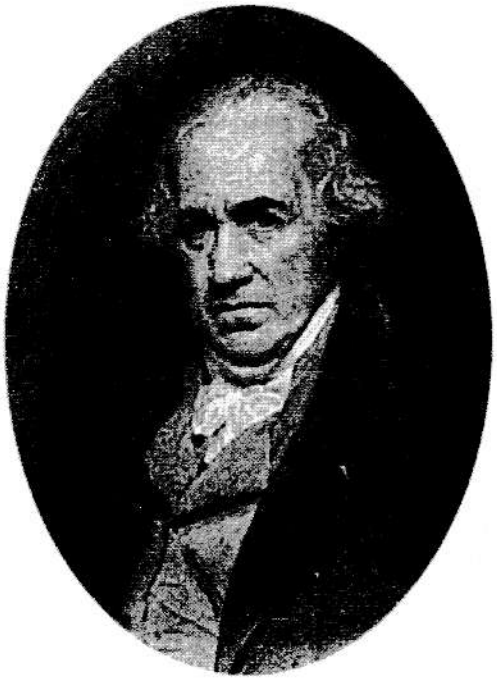

জেমস ওয়াট

চেহারাটাই গেল বদলে। কতরকম কারখানা হল; তাঁত চালাবার যন্ত্র তৈরি হল, ইস্পাত তৈরির কারখানা হল, নিত্যনতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হল। সবই ঐ স্টিম ইঞ্জিনের কল্যাণে, জলীয় বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার হওয়ার আগে পানির শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে চাকা ঘোরানোর কায়দা মানুষ রপ্ত করেছিল। খ্রিস্টজন্মের একশো বছর আগেই নদীর স্রোতের সাহায্যে চাকা ঘোরানোর ব্যবস্থা ছিল। সেই চাকার সঙ্গে পাথরের চাকতির যোগ থাকত। পানির মধ্যে চাকা ঘুরলে পাথরের জাঁতাকল ঘোরে এবং তার ফলে শস্য পেষাই হয়। ব্রিটেনে এখনো ঐ ময়দা পেষাইকল দেখতে পাওয়া যায়, যাদের বয়স হাজার বছরেরও বেশি।

নদী-নালা দিয়ে বয়ে যাওয়া জলস্রোতে অথবা পাথরের গা বেয়ে নেমে-আসা ঝরনার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে থাকে তা ঝরনার পানি যত উঁচু থেকে পড়ে—তার থেকে শক্তি পাওয়া যায় ততবেশি, চাকাও ঘোরে তত জোরে। ১৮২০ সালে এক ফরাসি কারিগর 'টারবাইন' নামে একটা জিনিস তৈরি করেন। এটাও একধরনের চাকা, আগের তুলনায় এটা আকারে অনেক ছোট এবং অনেক বেশি কাজের। নতুন ধরনের ঐ চাকার গায়ে লাগানো হল অনেকগুলো লোহার পাত বা ব্লেড। পানির স্রোত এ ব্লেডগুলোর গায়ে ধাক্কা দিলে চাকা ঘোরে। ব্লেডের সংখ্যা যত বেশি, চাকাও ঘোরে তত জোরে।

চাকা ঘুরিয়ে পানির শক্তিকে যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় সেটা অবশ্য জানা গেছে অনেক পরে। দুটো ঘুরন্ত তারের কুণ্ডলীর ভেতর চুম্বক রেখে তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয় এখন থেকে শ-বছর আগে। তামার তারের কুণ্ডলীকে ঘোরানোর জন্য যে টারবাইনকে কাজে লাগানো যায় সেটাও সকলের মাথায় এল তখন। ব্যস, পানি থেকে বিদ্যুৎ তৈরিতে আর বাধা রইল না।

নদীতে পানির স্রোত যেহেতু সারাবছর একই রকম থাকে না, নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রকাণ্ড সব জলাধারে পানি আটকে রেখে সেই জমা পানি দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণত পাহাড়ঘেরা ঢালু অঞ্চল যেখানে পানির স্রোত এমনিতেই বেশি সেখানেই এক বা একাধিক নদীতে বাঁধ দিয়ে এই ধরনের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। বাঁধের উল্টোদিকে থাকে সারি সারি 'স্লুইস গেট'। প্রয়োজনমতো সেগুলো খুলে দিয়ে জলাধারের অতিরিক্ত জলকে বের করে দেওয়া যায়। সেই জল আবার খাল কেটে নিয়ে যাওয়া হয় ক্ষেতে-খামারে, চাষবাসের জন্য। জলাধারের জমা জল পাইপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে তা দিয়ে টারবাইন ঘোরানো হয়, তৈরি হয় বিদ্যুৎ।

হিসাবে দেখা গেছে, দেড়শো মিটার উঁচু থেকে নেমে আসা জল যখন টারবাইনে ঢোকে তখন তার বেগ থাকে ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার। ১০২ মিটার উঁচু থেকে এক লিটার পানিকে টারবাইনে ঢোকালে তা যত জোরে ঘোরে, তাতে এক হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। ঐ বিদ্যুৎ দিয়ে ৪০ ওয়াটের ২৫টা আলোর বাল্ব জ্বালানো সম্ভব। ১০২ লিটার পানিকে এক মিটার উঁচু থেকে ফেললেও ঐ একই শক্তি পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রয়েছে কানাডার চার্চিল জলপ্রপাতের গায়ে। এটির বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষমতা ৪,৫০০ মেগাওয়াট। এর সাহায্যে প্রায় ১০ কোটি বাল্ব জ্বালানো সম্ভব।

সাগরের ঢেউয়ের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। ঝোড়ো হাওয়ায় অতলান্তিক মহাসাগরে যে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ, তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইডেন, কানাডা, পেরু, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম এবং আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে এক আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা। হালে, জাপানে 'কাইমি'

নামে এক বিশেষ ধরনের জাহাজ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে ঢেউয়ের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে ২০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব।

শুধু পানির ঢেউ না, জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় কি না তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন বহুদিন ধরে। ১৯৬১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানীরা ভূমধ্যসাগরের তীরে রাইনস্ নদীর খাড়িতে সাগরের জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু করেন। কেন্দ্রটি চালু হয় ১৯৬৭ সালে। এভাবে বিদ্যুৎ তৈরির কাজটা সহজ। এতে জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকিয়ে পরে সেই জমা পানির সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়।

সব সমুদ্রোপকূলে অবশ্য এজাতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে-তোলা সম্ভব নয়। দেখা গেছে, যেসব উপসাগর বা সমুদ্রের খাড়ির মুখটা ফানেলের মতো সরু, সেখানে বাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানি আটকে রাখা সম্ভব। যেসব জায়গায় জোয়ারের পানি অন্তত ৪ মিটার উঁচু হয় শুধু সেইসব জায়গায় এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা যায়। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের প্রায় ডজন দুয়েক জায়গার খোঁজ মিলেছে।

গরম বরফ

বরফ কখনো গরম হয়? এ তো অসম্ভব ব্যাপার। আর অসম্ভব বলেই আমি এটাকে মঞ্চে 'সম্ভব' করে দেখাতে চাইছি। সব ম্যাজিকই তো তাই। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো। আগেই বলেছি ম্যাজিকে মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই। সবই বিজ্ঞানভিত্তিক। উদ্দেশ্য একটাই, মনোরঞ্জন।

জাদুকর সকলের সামনে একটা বরফের টুকরো নিয়ে সেটাকে একটা কাচের গ্লাসে ঠকাস করে রাখলেন। তারপর এক বোতল পানি নিয়ে তাতে ঢাললেন। পানিতে বরফটা ভেসে উঠল। সবই স্বাভাবিক, সবই সাধারণ। এবার জাদুকর একটা চামচ নিয়ে ওই বরফটাকে পানির মধ্যে ঘোরাতে লাগলেন। বরফটা পানিতে পাক খেতে লাগল। তারপর জাদুকর ওই গ্লাসের একটু পানি দর্শকদের একজনের হাতে ঢাললেন। অবাক কাণ্ড! বরফটা যদিও তখনো পানিতে আছে, তবুও পানি কিন্তু ঠাণ্ডা নয়, বরং তুলনামূলকভাবে বেশ গরম। সকলে তাজ্জব। কী করে এটা হল!

তোমরা ভাবছ, এটা নিশ্চয়ই কোনো 'কেমিক্যালস'-এর কারসাজি। মোটেই না, এটা পুরোপুরি চোখে ধাঁধা-দেওয়া 'পিওর ফিজিকস'-এর একটা ম্যাজিক। বরফটা সাধারণ, কিন্তু তাতে একটা কায়দা করা ছিল। আগে থেকে একটুকরো সেলোফেন পেপার (পলিথিন নয়) দিয়ে ওই বরফটা মুড়ে রাখা ছিল। আর বোতলে রাখা ছিল গরম পানি। বরফটাকে নিয়ে গ্লাসে ফেললে ঠকাস করে আওয়াজ হবে। তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না, এবার বোতল থেকে গরম পানি ঢাললে ওই বরফ যাবে গলে, কিন্তু সেলোফেন পেপারের জন্য দেখে মনে হবে বরফটা তখনো আছে। বেশি গরম পানি ঢাললে বরফের শীতলতা কেটে পানিটা বেশ গরমই হয়ে যাবে। বরফটা যে গলে পানি হয়ে গেছে, তা কিন্তু দর্শকেরা বুঝবেন না। গরম পানি থেকে 'স্টিম' বা 'বাষ্প' বের হলে তাঁরা ভাববেন বরফের হিমশীতল বাষ্প বের হচ্ছে। বাকিটুকু অভিনয়। একটু ভেবেচিন্তে অভ্যাস করে দেখিয়ো, গ্লাসটা সময়মতো সরিয়ে নিয়ো, দেখবে বড় 'কেমিস্ট' বা 'প্রফেসর'রাও কেমন ঘাবড়ে গেছেন।

যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রঘু ডাকাত

রঘু ডাকাতের নামে লোকে একসময়ে ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইত। রঘু ডাকাতের বাড়ি কোথায় ছিল, কেউ ঠিকভাবে বলিতে পারিত না। কেহ বলিত নদীয়া জেলায়, কেহ বলিত হুগলি, কেহ বলিত চন্দননগর। সে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকিত না বলিয়া নানাজনে নানাস্থানে তাহার নির্দেশ করিত। রঘুর এভাবে থাকিবার প্রধান কারণ ছিল ধরা পড়িবার ভয়। কে জানে কোন্ সুযোগে পুলিশ আসিয়া ধরিয়া ফেলে। এজন্য সে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার পেছনে গোয়েন্দা ও পুলিশ লাগিয়াই ছিল।

গভর্নমেন্ট সে-সময়ে রঘু ডাকাতকে ধরিবার জন্য অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন সরকার ডাকাতদের দমন করিবার জন্য একটি দপ্তরও খুলিয়াছিলেন। বাংলার সর্বত্র—কি জলপথে কি স্থলপথে—সর্বত্র ছিল ডাকাতদের অসাধারণ প্রভাব। হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, বারাসত, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, চন্দননগর, কলিকাতা সর্বত্রই ডাকাতির জন্য কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র—কেহই শান্তিতে বাস করিতে পারিত না।

রঘু ডাকাতের সম্বন্ধে নানারূপ গল্পগুজব প্রচলিত ছিল। সে ও তাহার দলের লোকেরা রণ-পা করিয়া রাত্রিতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে কাহারও বাড়িতে ডাকাতি করিয়া আবার নির্বিঘ্নে সেই

রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিত। সেকালে নদীয়া, হুগলি, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার অনেক স্থানই ছিল বন-জঙ্গলে ভরা।

রঘু ডাকাত একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল দস্যু ছিল, তাহার হাতে সর্বদা একখানা দীর্ঘ লাঠি থাকিত। তাহার দলের ডাকাতেরা লাঠি, তলোয়ার, ঢাল, বল্লম ও সড়কি নিয়া ডাকাতি করিতে ছিল দক্ষ। শিকারী নামে একদল লোক রঘু ডাকাতের দলে ছিল।

কৃষ্ণনগরের একজন রাজা লক্ষ্ণৌ হইতে শিকারীদের এদেশে আনেন। তখন কৃষ্ণনগরের চারিদিকে ছিল গভীর বন-জঙ্গল। সেই বন-জঙ্গলে নানা জাতীয় হিংস্রজন্তুর বাস ছিল। রাজা প্রথমে তাহাদের ঐসব বন্যজন্তু শিকার করিবার জন্য এদেশে আনাইয়া বসতি দিয়াছিলেন। সেই অবধি শিকারীরা কৃষ্ণনগরের চারিদিকে বাস করিত। উহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় ছিল পশুশিকার ও ডাকাতি। শিকারীদের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল।

ডাকাতের দলের সকলেই ছিল কালীর উপাসক। কি হিন্দু দস্যু কি মুসলমান দস্যু—সকলেই কালীর পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। এইসব ডাকাতকে ধরা বড় সহজ ছিল না। এদিকে পুলিশ ফৌজ তাড়া করিলে তাহারা চন্দননগরে পালাইয়া যাইত। ফরাসি-অধিকৃত চন্দননগরে গিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিত। রঘু ডাকাতের উপদ্রব বিশেষ করিয়া নৈহাটি থানা ও বারাসতের কদমগাছি থানা, হুগলি এবং চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

সেই সময়ে নৈহাটি থানায় দুর্গাচরণ চক্রবর্তী এবং কদমগাছি থানায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুইজন নামকরা দারোগা ছিলেন। তাঁহাদের ওপর কর্তৃপক্ষের আদেশ ছিল—যেমন করিয়া পারো রঘু ডাকাতকে ধরিতে হইবে।

রঘু ডাকাত সম্বন্ধে নানা সুন্দর-সুন্দর গল্প আছে। দুর্গাচরণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও রঘু ডাকাতকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। একবার দারোগা দুর্গাচরণ একখানি চিঠি পাইলেন।

'আপনার সাথে আমার শীঘ্রই দেখা হবে—প্রস্তুত থাকিবেন।

ইতি,

সেবক-রঘু

— দুই —

এখানে রঘুর মহত্ত্বের একটি গল্প বলিয়া লইতেছি।

চূর্ণী নদীর তীরে ছোট একটি গ্রাম। সেখানকার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ। বিবাহ বাড়িতে লোকজন হৈ-হৈ করিতেছে। বর ও বরযাত্রীর দল আসিয়া নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল, লগ্ন সমাগত; কিন্তু বরকর্তা বলিতেছেন—আমার পণের সব টাকা না পেলে কোনোরকমেই বরকে নিয়ে আসব না।

সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য-মর্যাদা না পাইলে বর বিবাহ করিত না। কুলীনের ছেলের মেয়ের অভাব কী? এক লগ্নে তো দশটা বিবাহ সে করিতে পারে। কাজেই বরকর্তা নির্বিকার।

বিবাহ-বাড়ির আলো যেন এক নিমেষেই মলিন হইয়া গেল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি—হাতে একটা লম্বা লাঠি, চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর বসিয়া ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—পেন্নাম হই ঠাকুর, কাঁদছ কেন?

ঠাকুর বলিলেন—কে তুমি?

হা-হা-হা—আমি যেই হই না কেন, বলো না ঠাকুর, এত কাঁদছ কেন?—বলিয়া লোকটা অট্টহাস্য করিল।

ব্রাহ্মণ তখন সবিস্তারে সব কথা বলিলেন এবং জানাইলেন—বর ও বরযাত্রী চূর্ণীর ঘাটে এসে নৌকা বেঁধেছে। টাকা না পেলে বিয়ে করতে আসবে না। কী হবে বলো? তাই বাড়িসুদ্ধ সকলের এত কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছ। আমি গরিব মানুষ—এত টাকা কোথায় পাব?

—এই কথা ঠাকুর! চুপ করো। মা ঠাকরুণদের চুপ করতে বলো। বিয়ের আয়োজন করো। বরযাত্রীদের আর কন্যাযাত্রীদের খাবার ব্যবস্থা করো। হাঁ—কত টাকা দিতে হবে?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—পাঁচশো একটাকা।

—বেশ! কোনো গোল কোরো না ঠাকুর। আমি বর ও বরযাত্রী নিয়ে আসছি। টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন। চূর্ণী নদীর পারে কয়েকখানি নৌকায় বর ও বরযাত্রীর দল জটলা পাকাইতেছিলেন—এতবড় অপমান তাঁহারা সইবেন না। বরকর্তা বলিতেছিলেন—চলো বাড়ি ফিরে যাই।

অনেকেই তাঁহার কথার সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিতেছিলেন এবং অন্যান্য জায়গার মেয়েদের কথাও হইতেছিল যেখানে বেশি পণ মিলিবে!

এমন সময় সেই নিবিড় বন-জঙ্গলপূর্ণ পথে দেখা গেল কতকগুলি মশালের আলো এবং শোনা গেল লোকজনের গোলমাল। বরকর্তা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, নৌকার বাহিরের পাটাতনের ওপর বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন—এমন সময় হৈ-হৈ করিতে-করিতে বন-জঙ্গল কাঁপাইয়া লোকগুলি নৌকায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং সেই দলের একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি বলিল—ঠাকুরমশাই, তুমি যেই হও, তোমার বর ও বরযাত্রী নিয়ে বিয়েবাড়ি চলো। বিয়ের সব আয়োজন হয়েছে।

কে একজন কর্কশস্বরে বলল—কে তুমি হুকুম করতে এসেছ?

—সে-কথা পরে হবে। ভালোয়-ভালোয় চলো—বিয়ের সভায় টাকাকড়ি বুঝ-প্রবোধ করে নিও।

—এখানেই দিতে হবে।—বরকর্তা বলিলেন।

—দ্যাখো ঠাকুর সাবধান। যদি ভালোয়-ভালোয় না চলো, তবে নৌকাসুদ্ধ পারে টেনে তুলব।

—কী এতবড় আস্পর্ধা? কে তুমি?

—রঘু ডাকাত!

নৌকার সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। কেহ আর কোনো দ্বিরুক্তি না করিয়া কন্যার পিতার বাড়িতে চলিলেন। মনে-মনে ভাবিলেন, সর্বনাশ! রঘু ডাকাত!

রঘু কন্যাকর্তাকে ডাকিয়া গোপনে বরপণের সব টাকা দিয়া বলিল—আমি এখানেই আছি। ভয় নেই। সকলকে খাইয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করো।

ব্রাহ্মণ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—কে তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু?

রঘু কহিল—চুপ করো ঠাকুর, আমি রঘু ডাকাত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রঘু, তুমি বিয়ে দিয়ে যেয়ো। মা কালী তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমার...।

—চুপ।

ঠাকুর আর কোনো কথা বলিলেন না।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের আদর-আপ্যায়নে তৃপ্তি লাভ করিয়া পরদিন নিজ দেশে চলিয়া গেলেন।

রঘুর এমনই ছিল মহত্ত্ব!

— তিন —

দুর্গাচরণবাবু একদিন থানায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন এবং ডাকাতি নিবারণের পথ খুঁজিতেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া হুকুম—ডাকাত ধরা চাই-ই। এমন সময় দেখিলেন, একজন জেলে খুব বড় দুইটি রুইমাছ মাথায় করিয়া থানার দিকে আসিতেছে।

জেলে সেই বৃহৎ মৎস্যদুইটি থানার বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া কাপড়ের খুট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল এবং নমস্কার করিয়া চিঠিটা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল : 'দারোগাবাবু, পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমার পুষ্করিণীতে মাছ ধরেছিলাম। আপনি আসতে পারবেন না জানিয়েছেন, তাই দুটি মাছ আপনার জন্য লোক মারফৎ পাঠালাম। লোকটি আমার বিশ্বস্ত প্রজা।'

সুখসাগরের জমিদারের সঙ্গে দারোগাবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। কাজেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যে-লোকটি মাছ আনিয়াছিল, তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিলেন : তোমার বাবুকে বোলো, আমি মাছ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমি দু-চার দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।—এই বলিয়া দারোগাবাবু প্রচুর জলপান দিয়া ছেলেটাকে বিদায় দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দুর্গাচরণবাবু আর-একখানা চিঠি পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল : 'দুর্গাচরণবাবু, আমি বলেছিলাম, একদিন আপনার সাথে দেখা করে আসব। সেদিন দেখা করে এসেছি। মাছ কেমন খেলেন?

সেবক—*রঘু ডাকাত*।'

দুর্গাচরণবাবু হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন—এমন করে আমাকে ফাঁকি। বেটা হাতের কাছ থেকে ফসকে গেল।

— চার —

গঙ্গার পারে নৈহাটির কাছে এক পল্লীতে একজন ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটি বাগানবাড়ি ছিল। তাঁহার নাম ছিল বিনোদবাবু। বিনোদবাবু এই বাগানবাড়িতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। গঙ্গার পারেই ছিল বাগানবাড়িটি। নিচ দিয়া গঙ্গা কুলকুল স্বরে বহিয়া যাইত। আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল—এইসব বড় বড় গাছ বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিনোদবাবু ধনী জমিদার মানুষ, বড় শখ করিয়া এই বাগানবাড়িটি তৈরি করিয়াছিলেন। প্রায়ই তিনি এখানে আসিতেন।

একবার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ-আলোচনায় কথাপ্রসঙ্গে রঘুডাকাতের কথা উঠিল। বিনোদবাবু বলিলেন—শুনেছি রঘু অতি দুঃসাহসিক ডাকাত। তবে এ-কথা জেনো ভাই, তার সাধ্য হবে না আমার এখানে আসে। আর এক বন্ধু বলিলেন—বলো কী? রঘুর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই, বড়াই করো না।

দুই-তিন মাস পরে বিনোদবাবু একটি চিঠি পাইলেন। চিঠির মর্ম এই—

'আমি শীঘ্রই একদিন আপনার বাগানবাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

—*রঘু ডাকাত*।'

বিনোদবাবু তো চিঠি পাইয়া অবাক! তিনি বুঝিতে পারিলেন, যেভাবেই হোক রঘু ডাকাতের কানে তাঁহার সদম্ভ উক্তিটা পৌঁছাইয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা পুলিশের উপরঅলাদের নিকট এবং নৈহাটি থানার দারোগাকে চিঠির মর্ম জানাইয়া পত্র দিলেন। শীঘ্রই একদল পুলিশ ও দারোগা আসিয়া বাড়ির চারদিক ঘেরাও করিয়া পাহারায় রহিল। বিনোদবাবুও বন্ধুবান্ধবদের সহিত প্রস্তুত রহিলেন ডাকাতের প্রতীক্ষায়।

একদিন সকালবেলা একজন ভদ্রলোক বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি একটা বড় রকমের দামি ফিটন গাড়ি চড়িয়া আসিয়াছেন। দারোয়ান সসম্ভ্রমে ভদ্রলোককে বিনোদবাবুর নিকট লইয়া আসিল। তখন বিনোদবাবু দারোগা দুর্গাচরণবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে রঘুর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন।

ভদ্রলোক বিনোদবাবুর ঘরে আসিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ফরাশের একপাশে বসিলেন। নবাগত ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় বাবরি চুল, ঢাকাই মসলিনের ফতুয়া গায়ে, সেই পাতলা মসলিনের ফতুয়ার ভিতর হইতে সোনার হার দেখা যাইতেছে। বলিষ্ঠ তাঁহার শরীর, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

বিনোদবাবু বলিলেন—আপনার কী প্রয়োজনে আসা বলুন।

—আজ্ঞে, ত্রিবেণীর কাছে আপনার ছোট তালুক আছে, শুনেছি আপনি সেটি পত্তনি দেবেন, আমাকে দিলে বড় উপকার হয়। আমি সেজন্যেই আপনার দরবারে এসেছি।

—মশাইয়ের নাম!

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি সুখচর।

জমার বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্কের পর বার্ষিক জমা স্থির হইয়া গেল। ভদ্রলোক আগাম বায়নাস্বরূপ একশো টাকা দিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিনোদবাবু টাকা লইয়া সেরেস্তার কর্মচারী মারফত যথারীতি রসিদ দিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে ভুলিলেন না। এইভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বিনোদবাবু গর্ব করিয়া তাঁহার বন্ধুদের বলিতে লাগিলেন—কোথায় হে তোমাদের রঘু ডাকাত আমার এখানে আসবে—হা! হা!

তাঁহারা বলিলেন—ভাই, এখনও সময় যায়নি। সাবধানে থেকো।

সত্যই সময় যায় নাই। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে একখানি ছিপনৌকা চুপি-চুপি আসিয়া বিনোদবাবুর বাগানবাড়ির গায়ে ভিড়িল। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সারি-সারি বড়-বড় আম,

নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ। কতকগুলি গাছ একেবারে বাগানের মধ্যস্থ বাড়ির গা ঘেঁষিয়াই ছিল।

ছিপ হইতে একদল লোক ধীরে-ধীরে দেওয়াল বাহিয়া গাছের উপর উঠিল এবং চুপি চুপি গাছ হইতে মাটিতে নামিয়া হামাগুড়ি দিতে-দিতে বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল। একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাহাদের সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

খিড়কির দরজা দিয়া একে-একে সকলে উঠিল। তাহারা দেখিল, নিচে দারোয়ানরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাবুর শোবার ঘরের পাশে উপরের দরবার-ঘরটির দেওয়ালে দারোয়ানরা তাহাদের তলোয়ারগুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। ঘরের দরজার সামনের প্রজ্বলিত লণ্ঠনগুলি নিবাইয়া দিয়া ঐ লোকগুলি ঝুলানো তলোয়ারগুলি হাতে লইয়া দারোয়ানদের অস্ত্রহীন করিল।

এইবার ডাকাতের দল বাড়ির সব ঘরের কপাট ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তন্নতন্ন করিয়া মূল্যবান জিনিশপত্র ও টাকাকড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কপাট ভাঙার শব্দে দারোয়ানরা জাগিয়া দেখিল, ডাকাতের দল লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। তখন একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—কিন্তু তাহাদের অস্ত্র কোথায়!

ডাকাতেরা তাহাদেরই অস্ত্রশস্ত্র নিয়া তাহাদেরই আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। ডাকাতেরা প্রস্থান করিবার আগে সেই দীর্ঘকায় দস্যু অতি সন্তর্পণে বিনোদবাবুর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া তাঁহার হাতপা ও মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। বিনোদবাবু ভয়ে ও বিস্ময়ে গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলেন।

পুলিশ ও দারোগা সপ্তাহকাল বিনোদবাবুর বাড়ি পাহারা দিয়া অবশেষে নিশ্চিন্ত মনে কয়েকদিন আগে ফিরিয়া গিয়াছিল।

কিছুদিন পরে বিনোদবাবু আর একখানি পত্র পাইলেন :

> 'আপনি আমাকে তালুকের পত্তনি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। আপনার কোনো ক্ষতি আমি করিনি, আপনার যাহা কিছু ছিল তাহা নির্বিঘ্নে নিয়ে এসেছি। সে টাকা-কড়ি আমি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। আপনি আমার জমিদার। বাকি টাকা পাঠিয়ে দেব—লেখাপড়া কবে শেষ করবেন? এখন বোধহয় সেদিনকার সেই ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছেন—
>
> ইতি,
>
> *শ্রী রঘু ডাকাত*

বিনোদবাবু চিঠিখানি পুড়িয়া বন্ধুদিগকে বলিলেন : ভাই, সত্যই রঘু ডাকাত অসাধারণ লোক। তবে সে আমার প্রজা হয়েছে।

—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দারোগা দুর্গাচরণবাবুও চিঠি পাইলেন :

'দারোগাবাবু, দুবার আপনার সঙ্গে দেখা হল—ধরতে পারলেন না তো।

ইতি,

রঘু ডাকাত

রঘু ডাকাত এমনি ছিল দুঃসাহসিক। রঘু ডাকাতের পরিণাম কী হইয়াছিল জানি না। এ-বিষয়ে সরকারি কাগজপত্রে সন্ধান মিলে না। সে এমন জনপ্রিয় দস্যু ছিল যে গরিব-দুঃখীরা তাহার সন্ধান জানিলেও কেহই বলিয়া দিত না।

ক্রিকেট খেলার আইনকানুন

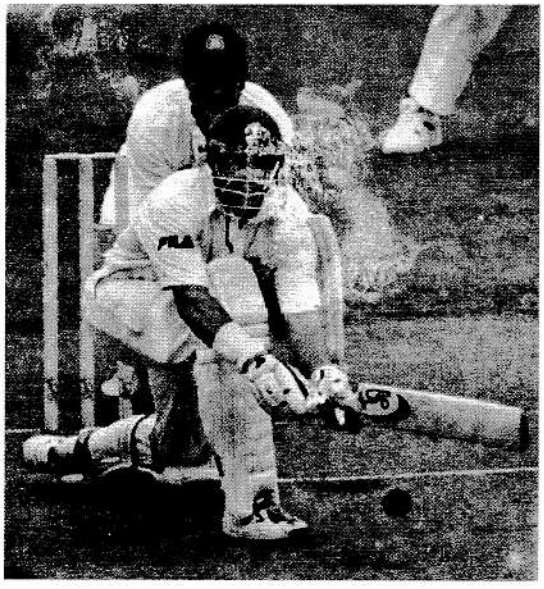

মাঠের মাঝখানে কিছুদূর ব্যবধানে (প্রমাণ মাপ ২২ গজ) সমান্তরাল মুখোমুখি পোঁতা উইকেটের একদিকে একজন ব্যাট দিয়ে বল ঠেকাবে, অপরদিকে ঠেকাবে তারই সহযোগী ব্যাটসম্যান। বিপক্ষের এগারোজন মাঠে থাকবে। ওই এগারোজনের একজন ব্যাটসম্যানকে বোলিং করে বলটাকে তার দিকের উইকেটে লাগাবার চেষ্টা করবে। সক্রিয় ব্যাটসম্যানের উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে অপর একজন ব্যাটসম্যানের ফসকানো বলগুলি ধরবে। বাকি ন-জন মাঠের নানান জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের কাজ ব্যাটসম্যান বল মারলে তা ধরা। একদিক থেকে বোলার ছটি বল দেবে বিপরীতে অবস্থিত ব্যাটসম্যানকে।

এই খেলার নাম ক্রিকেট। ইংল্যান্ডে এর জন্ম, এককালে ইংরেজদের যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল, এখন যার নাম কমনওয়েলথ, তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে শুধু ক্রিকেট খেলা হয় এবং কয়েকটি দেশের মধ্যে টেস্ট ম্যাচের সুবাদে সেইসব দেশে এই খেলার প্রবল জনপ্রিয়তা।

খেলার আগে টস করে যে-পক্ষ ব্যাটিং করা স্থির করবে তাদের দুজন করে একসঙ্গে মাঠে নামবে, দুই উইকেট আগলাতে। একজন আউট হলে, আর একজন তার স্থান নেবে। এইভাবে দশজন আউট হয়ে গেলে ১১ নম্বর সঙ্গীর অভাবে খেলতে পারবে না, একপক্ষের ইনিংস শেষ হয়ে যাবে। তখন অপরপক্ষ ব্যাটিং করবে এবং আগে যারা ব্যাটিং করেছে, তাদের এগারোজন মাঠে নামবে ফিল্ডিং সাইড হয়ে।

বোলার বল দিলে সে-বল মেরে যদি ব্যাটসম্যান মাঠের সীমানা পার করে দিতে পারে, আর কেউ মাঝপথে তা আটকাতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাটসম্যান চার রান পায়, তাকে বলে বাউন্ডারি, চার রান।

যদি উঁচু করে বল মারা হয়, যাতে বল সোজা মাঠের সীমানা পার হয়ে মাটিতে পড়ে, তবে তা ওভার বাউন্ডারি, ছ'রান। এছাড়া ব্যাটসম্যান বল মারলে সে যদি ছুটে অপর উইকেটে পৌঁছতে পারে তাহলে যে বল মেরেছিল তার এক রান হয়। একবার মারের ফলে যে-কবার উইকেটের এপাশ-ওপাশ দৌড়ানো যায়, সেই কটি রান ধরা হয়। উইকেটকিপার যদি বল আটকাতে না পারে, সেই অবস্থায় ব্যাটে বল না-লাগলেও রান করা চলে, তার নাম বাই রান, কারো ব্যক্তিগত রান নয়, দলগত। বাই বাউন্ডারি হলেও চার রান। পায়ে বল লেগে রান হলে সেই লেগবাইও দলের রান, ব্যাটসম্যানের রান নয়। এই হিশেবে একপক্ষীয় এগারোজন ব্যাটসম্যানের সমষ্টিগত রান দলের রান বলে গণ্য। যে-পক্ষের বেশি রান হল, সেই পক্ষ জয়ী। বড় বড় প্রতিযোগিতামূলক খেলায় এক-এক পক্ষ দু-ইনিংস করে খেলে এবং দুই ইনিংসের মোট রানের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

আউট কত ভাবে হয় : ১. বল মেরে দৌড়াবার সময় দুই ব্যাটসম্যান ছুটে এসে অপরদিকের উইকেটে পৌঁছবার আগেই যদি ফিল্ডিংপক্ষ বল ধরে তা উইকেটে লাগাতে পারে, তবে দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে যে এসে বিপরীতদিকের উইকেটে পৌঁছতে পারল না, সে রানআউট হয়ে গেল, আর ব্যাটিং করতে পারবে না। ২. ব্যাটে মারা বল মাটি স্পর্শ করার আগেই ফিল্ডিংপক্ষের কেউ যদি তা লুফে ফেলতে পারে, তা হলেও ব্যাটসম্যান আউট—ক্যাচ আউট। এছাড়াও আউট আছে। ৩. ব্যাটসম্যানের হাত ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংশে, বিশেষ করে পায়ে বা পোশাকে এমনভাবে যদি বল লাগে, যে-বল পা বা গা দিয়ে না-আটকালে তা উইকেটে লাগত, তা হলেও ব্যাটসম্যান আউট—লেগ বিফোর উইকেটে। ৪. খেলার সময় ব্যাটিং করবার নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যদি ব্যাটসম্যান বেরিয়ে পড়ে আর বল তার উইকেটে লাগানো যায়, তবে সে আউট—স্টাম্পড আউট। এই কাজ সাধারণত উইকেটের পিছনে যে ফিল্ডিং করে, সেই উইকেটকিপারের। বল হাতে ধরে উইকেটে হাত দিলে চলবে। ৫. সবচেয়ে প্রধান আউট হল বোলারের দেওয়া বল ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে রুখতে পারল না, বল উইকেটে লাগল, তাহলে বোল্ড আউট হল। ৬. ব্যাটসম্যান হাতে বল ধরলে আউট। ৭. বল দুবার মারলে আউট। ৮. নিজের ব্যাট বা অঙ্গ বা পোশাকের ছোঁয়ায় উইকেট গেলেও আউট। সব আউটেই উইকেটের মাথার দুইটি কাঠি, যাকে বলে বেইল, তার অন্তত একটি পড়ে যাওয়া চাই।

এতক্ষণ উইকেট বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা হল দুপাশে মাটিতে পোঁতা পাশাপাশি তিনটি কাঠি। উইকেট বলতে ওই তিন-কাঠি যেমন বোঝায়, দুপাশের দুসেট স্টাম্পের মধ্যবর্তী পাঁচ ফুট প্রস্থ জায়গাটুকুও বোঝায়। উইকেট নরম, শক্ত, মসৃণ, ফাটা বা চটা-ওঠা হয়ে গেলে, বোলারের সুবিধা হয়, আর ব্যাটসম্যানের বেকায়দা। মসৃণ ঘাসের উইকেটে না থাকলে, সেখানে পাটের বা নারকেল ছোবড়ার মাদুর পেতে খেলা যায়, তার নাম ম্যাটিং উইকেট। উইকেটের অপর নাম পিচ।

তিনটে কাঠি, যার প্রতিটির নাম হল স্টাম্প, সেগুলো মাটির উপরে ২ ইঞ্চি বেরিয়ে থাকবে, মাথায় থাকবে দুটি বেইল—যে-বেইল না পড়লে আউট ধরা হবে না। তিন স্টাম্পের উইকেট প্রস্থ হবে আট থেকে ন ইঞ্চি।

স্টাম্প যেখানে পোঁতা থাকবে, তার সামনে (অপর উইকেটের দিকে) চার ফুট জায়গা ব্যাটসম্যানের খেলার এলাকা—তাকে বলা হয় পপিং ক্রিজ। স্টাম্পের সামনে ও পিছনে মোট আট ফুট হল বোলিং ক্রিজ, সেখান থেকে বোলার বল ছাড়বে। পপিং ক্রিজের বাইরে থেকে বোলিং করলে, তা নো-বল—যার ফলে ব্যাটিংপক্ষে এক রান যোগ হয়। বল যদি এত দূরে দিয়ে যায় যে ব্যাটসম্যান ব্যাট বাড়িয়েও নাগাল পায় না, তা ওয়াইড বল—তাতেও ব্যাটিংপক্ষের এক রান। এক-এক দিক থেকে বিপরীতদিকে দাঁড়ানো ব্যাটসম্যানকে ছ'টি বল দেওয়া হবে, তার নাম এক ওভার। নো-বল ও ওয়াইড বল গোণা হয় না, তাতে আউট হলেও আউট নয় এবং রানও ব্যক্তির নয়, দলের।

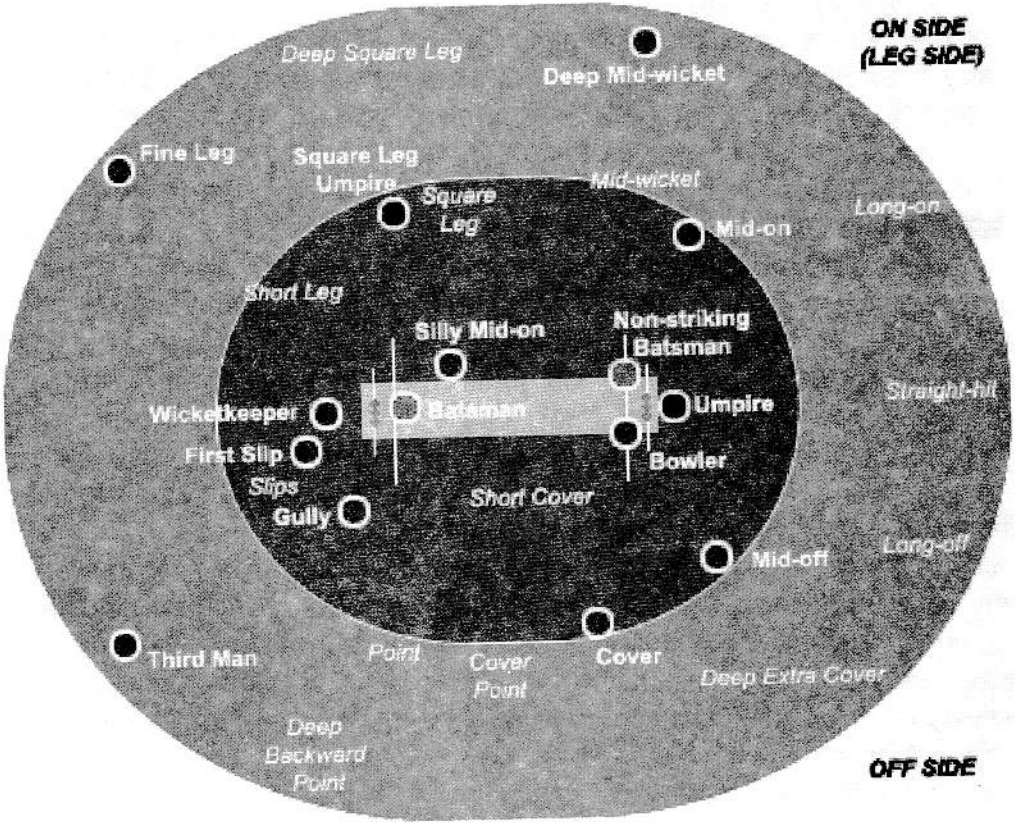
ON SIDE
(LEG SIDE)
Deep Square Leg
Deep Mid-wicket
Fine Leg
Square Leg
Umpire
Square
Leg
Mid-wicket
Mid-on
Long-on
Short Leg
Silly Mid-on
Non-striking
Batsman
Wicketkeeper
Batsman
Umpire
Straight-hit
First Slip
Bowler
Slips
Gully
Short Cover
Mid-off
Long-off
Third Man
Point
Cover
Point
Cover
Deep Extra Cover
Deep
Backward
Point
OFF SIDE

বোলার সহজ ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে বল ফেলবে। ছুড়ে দেওয়া কোনোমতেই চলবে না। ডানহাত বা বাঁহাতে বোলিং করা চলবে।

বোলিং কত রকমের : ১. ফাস্ট : খুব দ্রুতগামী, ২. মিডিয়াম ফাস্ট : মাঝারি গতিসম্পন্ন। এই ধরনের বল শূন্যে চলা অবস্থায় ডাইনে বা বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে ব্যাটসম্যানের সামনে পড়তে পারে, যে বোলিং করবে তার বল ধরার ও ছাড়ার কৌশলে; তাকে বলা হয় স্যুইং বল। বল যখন বোলারের বাঁয়ে বেঁকে ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি দিকের শেষ স্টাম্পের (অফ-স্টাম্প) সামনে পড়ে, সেই বল হয় আউট স্যুইং; আর ডাইনে বেঁকে পায়ের দিকে স্টাম্পের (লেগ স্টাম্প) সামনে পড়লে, তা ইনস্যুইং বল। বলের সেলাই অংশের যথাযথ ব্যবহারে বল ঠিকমতো স্যুইং করানো যায়। ধীরগতি বল যারা ছাড়ে, তারা বলে এমন মোচড় দিয়ে ছাড়ে যে বলটা লাট্টুর মতো পাক খেতে-খেতে গিয়ে মাটিতে পড়ে বেয়াড়াভাবে ঘুরে যায়। ৩. অফ-স্টাম্পের দিকে বল পড়ে পাক খেয়ে লেগ-স্টাম্পের দিকে গেলে, তা অফ-স্পিন বোলিং, আর ৪. লেগ-স্টাম্পের দিকে বল পড়ে অফ-স্টাম্পের দিকে গেলে, তা লেগ-স্পিন। এছাড়াও আছে ৫. টপ-স্পিন, যাতে বল এমনভাবে পড়ে যে, বল পড়েই ঝটকা মেরে দ্রুতগুতিতে সামনে স্টাম্পের দিকে যায়। স্পিনের মুখে বল বেকায়দায় মারলেই তা উঠে যায় এবং ক্যাচ আউট করা সহজ হয়। এছাড়াও আছে গুগলি বোলিং—বলটি ছাড়া হয় লেগ-ব্রেকের ভঙ্গিতে, কিন্তু বোলারের কোনো গোপন কৌশলে তা অফ-স্টাম্পে পড়ে ভিতর দিকে বেঁকে যায়। বলে স্পিন বা মোচড় দিয়ে ছাড়লে বল মাটিতে পড়ে যখন অন্যদিকে চলে যায়, তাকে ব্রেক বলা হয়। লেগে পড়ে অফে গেলে তা লেগ-ব্রেক, আর অফে পড়ে লেগে গেলে তা অফ-ব্রেক।

বোলার বল ছাড়লে সে-বল কতদূর গিয়ে ভূমি স্পর্শ করল, তার গুরুত্ব খুব বেশি এবং একেই বলা হয় বোলিং-এর লেঙ্গথ্। বল যদি এমন জায়গায় পড়ে যে ব্যাটসম্যান পিছিয়ে খেলবার সময় পাচ্ছে না, আবার এগিয়ে খেলবার সুযোগও পাচ্ছে না, সেই বলই আদর্শ লেঙ্গথ্, ক্রিকেটের ভাষায় গুড লেঙ্গথ্ বল। আর বল যদি ঠিক ব্যাটের মুখে পড়ে, তবে তা খেলা আরো বিপজ্জনক। এই ধরনের বলকে বলা হয় ইয়র্কার।

এই আলোচনার সব বক্তব্যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে বোলার ও ব্যাটসম্যান দুজনেই ডানহাত ব্যবহার করছে। বাঁয়া বা ন্যাটা বোলার ডানহাতের ব্যাটসম্যানকে অফ-ব্রেক বল দিলে, তাকে বলা হয় চায়নাম্যান। বল একবারও মাটিতে না পড়ে সরাসরি ব্যাটসম্যানের ব্যাটের মুখে এসে পড়লে, তা ফুলটস বোলিং। ফাস্ট বা মিডিয়াম পেস বল যদি সেলাই-অংশ মাটিতে পড়ে পিচ নিয়ে আচমকা অন্যদিকে চলে যায়, তা হল কাটার।

লেঙ্গথ্, স্যুইং, স্পিন, ব্রেক ছাড়াও যার গুরুত্ব খুব বেশি, তা হল বলের ডিরেকশান। এলোপাথাড়ি গেলে চলবে না, ব্যাটসম্যান সহজে মারবে। সঠিক লক্ষ্যে বল যাওয়ার নাম ডিরেকশন।

বলটি চামড়ায় মোড়া ও মাঝখানে সেলাই দেওয়া। তার ভিতরে থাকে কর্ক। বলের ওজন সাড়ে পাঁচ থেকে পৌনে ছ'আউন্স (প্রমাণ সাইজ); পরিধি ৮ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি।

ব্যাটসম্যানের হাতের অস্ত্র হল ব্যাট। হাতলসমেত ব্যাট লম্বায় ৩৮ ইঞ্চির বেশি হবে না এবং কোনো অংশই সাড়ে চার ইঞ্চির বেশি চওড়া হবে না। ব্যাট একাধারে আত্মরক্ষার ও আক্রমণের অস্ত্র। ব্যাট দিয়ে উইকেট বাঁচিয়ে চলতে হবে, যাতে বোলারের দেওয়া বল স্টাম্পে না লাগে। আবার ব্যাট দিয়ে বল মেরেই রান করতে হয়, আর রান করাই ক্রিকেট খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যাট ঠিকভাবে—হাতল হাতে জড়িয়ে ধরাই ব্যাটিং-এর প্রথম পাঠ। তারপরই গার্ড নেওয়া, অর্থাৎ ব্যাটের চেয়ে দ্বিগুণ চওড়া উইকেটের সামনে ঠিক কোন্‌খানে ব্যাট ধরলে বল ব্যাট কাটিয়ে উইকেটে লাগবে না, তা ঠিক করা।

বল মারার উপযুক্ত ব্যাট চালনা বা স্ট্রোক সাধারণত ছ-রকমের :

১. ড্রাইভ : খুব জোরের সঙ্গে সামনের দিকে বল মারা। ওই মারে অফ দিয়ে বল গেলে অফ-ড্রাইভ, অন দিয়ে গেলে অন-ড্রাইভ। অফ-সাইডের মাঝামাঝি মারকে বলে কভার-ড্রাইভ। অনেক সময় পিছনের পায়ে ভর রেখে ড্রাইভ মারতে হয়, তাকে বলে ব্যাকফুট ড্রাইভ।

২. কাট : অফ-সাইডের মার, ব্যাট সামনের দিকে লম্বা করে নিয়ে মারতে হয়। সোজাসুজি অফের দিকে বল গেলে স্কোয়ারকাট; একটু দেরি করে মেরে তা উইকেটকিপার ও এক নম্বর স্লিপের মাঝখান দিয়ে পাঠালে, তা হল লেটকাট। স্কোয়ার কাট থেকে আর-একটু সামনে দিয়ে বল গেলে তা হল কাট।

৩. পুল : অফের বল এমনভাবে মারা যাতে বোলার যে-পথে যাবার জন্য বল ছেড়েছে, তার বিপরীতে অনের দিকে বল চলে আসে। এইভাবে একদিকের বল অন্যদিকে টেনে আনা যথেষ্ট কঠিন।

৪. গ্লান্স : লেগ-সাইডের বলের গতিপথ ঘুরিয়ে মারা। সাধারণত লেগ উইকেটের কোণাকুণি পিছনদিকে বল ছোটে।

৫. হুক : বোলার যদি খুব জোরে শর্টপিচ বল দেয়, যা অনেকখানি লাফিয়ে ওঠে, তখন ব্যাটসম্যান লেগের দিকে দ্রুত ঘুরে পিছনে মারলে বল কোণাকুণি ছুটে বার হবে।

৬. চপ : বল অফ-সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ব্যাটের চেটো চেপে খুব জোরে মারা।

ফিল্ডিং : ক্রিকেটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বোলিং যত ভালো হোক, ক্যাচ উঠলে ক্যাচ ধরা চাই, মার না-থামালে ব্যাটসম্যান দৌড়ে রান নেবে বা বাউন্ডারি হবে। ব্যাটসম্যানের রান করবার সময় রান-আউট করতেও ফিল্ডারদের ঠিকমতো বল ধরে সঙ্গে সঙ্গে উইকেটে ছুড়ে দিতে হয়। ফিল্ডিং অনুশীলন ক্রিকেট-খেলার মুখ্য অঙ্গ।

মাঠে ক্রিকেটের আইন প্রয়োগ করার পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার আম্পায়ার-এর। খেলায় সাধারণত দুজন করে আম্পায়ার থাকেন। একজন বোলারের কাছে, অপরজন অপরদিকের লেগ-সাইডে। ফিল্ডিংপক্ষের কেউ আম্পায়ারের কাছে 'হাউজ দ্যাট' বলে আবেদন না-করলে, আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দেন না, কেউ আউটও হয় না। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ক্রিকেটের জটিল আইন ও তার ব্যাখ্যা খেলা-শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে জেনে ও বুঝে নিতে হবে।

ব্যক্তিগত ও দলগত রানের হিসাব, কে কীভাবে আউট হল, কোন্ বোলার কত বল দিয়ে ও কত রান দিয়ে কটি উইকেট পেল, কতক্ষণ ও কত ওভার খেলা হল—সবই বিশেষ খাতায়— স্কোরবুকে স্কোরারকে লিখে রাখতে হয়।

ক্রিকেট খেলার মৌলিক কৌশল

ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ও ফিল্ডিং-এ প্রত্যেককে পাকা হতে হয়। বোলিং ও উইকেটকিপিং-এ কেউ দক্ষতা অর্জন করে, কারো বা সহজাত দক্ষতা ঘসে-মেজে আরো উন্নত করে নিতে হয়।

ব্যাটিং : ১. ব্যাটিং-এর প্রথম পাঠ ঠিকমতো ব্যাট ধরা এবং ব্যাট ধরে ঠিকভাবে উইকেটের সামনে দাঁড়ানো— ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে স্টান্স। ২. সাড়ে চার ইঞ্চি চওড়া ব্যাট দিয়ে ন ইঞ্চি প্রস্থের উইকেট আগলাতে হয়। কাজেই ঠিক কোন্খানে এবং কীভাবে ব্যাট ধরে কোন্ স্টাম্প কোন্ দিক থেকে আগলে ব্যাটিং করবে, গোড়াতেই তা বুঝে নিতে হবে। সঠিক হিসাবে ব্যাট রাখা স্থির করাকে বলা হয় গার্ড নেওয়া। ৩. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে যেতে হবে বোলার কীভাবে বল ধরেছে,

কীভাবে ছুটে এসে বল ছাড়ল, বল ছাড়ার সময় তাতে কীভাবে মোচড় বা স্পিন দিল, বল কোথায় পড়ল এবং পিচে পড়ে কীভাবে কোন্‌দিকে ছিটকে গেল—সবকিছু ভালো করে দেখে নিয়ে, ঠিক সময়ে সোজা ব্যাট পেতে দিতে হবে উইকেট বাঁচাবার জন্য।

ফিল্ডিং : এর প্রথম পাঠ ঠিকমতো দাঁড়ানো, যাতে বল পায়ের তলা বা এপাশ ওপাশ দিয়ে গলে না চলে যায়। দু-পা জোড়া করে দাঁড়িয়ে আর দুহাত পাশাপাশি লাগিয়ে সামনে পেতে দিলে বল ধরা অনেক সহজ হয়।

ফিল্ডার কে কোথায় দাঁড়াবে

তিনটি বিন্দু হল উইকেট : নিচের উইকেটে বোলার, উপরের উইকেটে ব্যাটসম্যান। ফিল্ডার—বাঁয়ে নিচ থেকে পরে পরে : লংঅফ, মিড-অফ, একস্ট্রা কভার, সিলি মিড-অফ, কভার, পয়েন্ট গালি। ব্যাটিং উইকেটের পিছনে উইকেটকিপার, তার পিছনে কোণাকুণি : স্লিপ ৩, ২, ১; আরো পিছনে থার্ডম্যান; ডাইনে/উপর থেকে নিচে : লংলেগ, ব্যাকোয়ার্ড শর্টলেগ, সিলি মিড-অন, মিড- অন ও লং-অন। বোলার বা উইকেটকিপার বাদে বাকি ন-জনকে এই ১৭টি পোজিশানের মধ্যে যেভাবে যেখানে প্রয়োজন দাঁড় করাবেন অধিনায়ক, বোলারের বল বুঝে।

উইকেটকিপিং : যদিও প্রতি ক্রিকেটারেরই সবকিছু শিখে নেওয়া উচিত, তবু উইকেটকিপার একদলে জন দুই-এর বেশি থাকে না। সারাদিন উবু হয়ে বসে প্রতিটি বলের গতিপথের দিকে লক্ষ্য রেখে সেটি ধরবার জন্য তৈরি থাকা খুবই কঠিন কাজ।

শ্যামদেশীয় যমজ

থাইল্যান্ডের (শ্যামদেশ) ম্যাকলঙ শহরে ১১ মে ১৮১১ সালে জন্ম হয়েছিল যমজ ভাই চ্যাঙ ও ইঙ ব্যাঙ্কারের; তাদের দুজনের শরীর বুকে বুকে (একটি কার্টিলেজ বন্ধনীতে) জোড়া ছিল। ৩২ বছর বয়সে (১৮৪৩ সালের এপ্রিলে) তারা যথাক্রমে সারা ও অ্যাডেলেড ইয়েটস নামে দুই বোনকে বিয়ে করেন। চ্যাঙের ১০টি ও ইঙের ১২টি সন্তান হয়। ৬২ বছর বয়সে প্রথমে চ্যাঙ মারা যান (১৮৭৪ সালের ১৭ জানুয়ারি); তার তিন ঘণ্টার মধ্যেই ভায়ের শোকে ইঙ্ মারা গেলেন।

খায়রুল আলম সবুজ

অ্যাডাকস

আফ্রিকার সাহারা মরুর বিরানভূমিতে বালুময় পরিত্যক্ত অঞ্চলে বাস করে অ্যাডাকস। একটি বুড়োমতো পুরুষ অ্যাডাকস ছোট্ট একটি দল নিয়ে মরুভূমির নীরস বুনোঘাসের সন্ধানে দিনমান ঘুরে বেড়ায়। মরুভূমির যেসব অঞ্চলে উট পর্যন্ত বাস করতে পারে না, অ্যাডাকসরা সেখানে দিব্যি বাস করে। সত্যি বলতে কী অ্যাডাকসরা সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, এমনকি মাসের-পর-মাসও কোনোরকম পানি না-খেয়েই দিব্যি বেঁচে থাকে। আসলে অ্যাডাকসরা যেসব তৃণগুল্ম খায় সেখান থেকেই তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় পানি আসে।

এন্টিলোপ জাতেরই একটি অংশ এই অ্যাডাকস। ঠিক হরিণ নয়, তবে হরিণের মতো। একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল বছরের বিভিন্ন ঋতুতে অ্যাডাকসের গায়ের রং পালটায়। শীতকালে এদের রঙ ধূসর বাদামি, আবার গ্রীষ্মে একেবারে দুধশাদা। অ্যাডাকস প্রায় এক-মিটারের মতো উঁচু হয়।

এদের আঁকাবাঁকা সুন্দর শিংগুলো কখনো প্রায় এক-মিটার লম্বা হয়। কিন্তু লেজ খাটো দড়ির মতো।

অ্যাডাকস মরুভূমির নির্জনতম জায়গাতে বসবাস করলেও এদের জীবন তেমন সুরক্ষিত নয়। এরা জোরে দৌড়াতে পারে না। মানুষেরা ঘোড়ায় চড়ে অথবা উটে চড়েই খুব সহজে এদের ধরে ফেলতে পারে। যেসব শিকারি বন্দুক, রাইফেল নিয়ে জিপে করে আসে—অ্যাডাকস শিকার করা তাদের জন্য কিছুই নয়। আরব বেদুইনরা বহুকাল ধরেই অ্যাডাকস শিকার করে আসছে।

এখন আর খুব বেশি বাকি নেই। সারা সাহারা খুঁজলে হয়তো হাজার-কয়েক পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো আইন প্রয়োগ করে অ্যাডাকস শিকার আজও নিষিদ্ধ করা হয়নি। সমানেই চলছে অ্যাডাকস নিধন। এমন চললে হয়তো অল্পদিনে বাকিরাও শেষ হয়ে যাবে।

চামড়ার নৌকোয় আটলান্টিক পার

চামড়ার নৌকো? নিশ্চয়ই ভাবছ, লোকটার মাথায় ছিট আছে; নইলে এমন বিদঘুটে কথা কেউ বলে! কাগজের নৌকো, শালতি নৌকো, কাঠের নৌকো—সব বাদ দিয়ে কিনা চামড়ার নৌকো! চামড়ার তো জুতো হয়, কিন্তু নৌকো—এমন কথা তো কখনোই শোনা যায় না।

কখনও শোনা যায়নি, এমন কথা বলা যায় না। আর একটু খুলে বলতে গেলে, সেই আদ্যিকালের কথা। ইতিহাসের ভাষায় ষষ্ঠ শতাব্দী। আইরিশ সাধু সেন্ট ব্রেনডান সত্যি সত্যিই একটা চামড়ার নৌকো বানিয়েছিলেন। বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, তাতে করে একদল শিষ্য নিয়ে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। ল্যাটিন পুঁথিপত্তরে এই ব্যাপারে বিস্তর লেখাজোকা আছে। এক হিশেবে বলতে গেলে, কলম্বাসের হাজার বছর আগে, আর ভাইকিংদের চারশো বছর আগে সেন্ট ব্রেনডান—সাত বছর ধরে নানা দ্বীপ টহল দিয়ে আমেরিকায় যান, আবার আমেরিকা থেকে ওই নৌকোতেই ফেরত আসেন আয়ারল্যান্ডে।

হার্ভার্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হার্কনেস ফেলো' টিম সেভেরিন নামে এক ভদ্রলোক একটি ল্যাটিন পুঁথি পড়ে এই ব্যাপারটা জেনে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। চামড়ার নৌকোয় আটলান্টিক—এ কী অসম্ভব কথা! তিনি ব্রেনডান সম্পর্কে আরও খোঁজখবর জোগাড় করতে লেগে গেলেন।

মানচিত্র দেখতে বসলেন। ব্রেনডান আয়ারল্যান্ডের হেব্রিডেস থেকে ফারোস, ফারোস থেকে আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড—সেখান থেকে ল্যাব্রাডর নিউফাউন্ডল্যান্ড হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন উত্তর

আমেরিকায়। উত্তর ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় যাওয়ার এইটাই শর্টকাট। ভাইকিংরা এই পথ দিয়েই যাতায়াত করত।

সবই তো হল, কিন্তু চামড়ার নৌকোয় তিনি গেলেন কী করে? চামড়া তো সমুদ্রের নোনা-পানিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। ব্রেনডানের পুঁথিপত্রে নৌকোটা কীভাবে তৈরি হয়েছিল, তারও হিশেব-নিকেশ দেওয়া আছে। এখন চামড়ার নৌকো বানিয়ে আটলান্টিকে ভাসা সম্ভব কিনা দেখতে গেলে, ব্যাপারটা নিজেকেই পরখ করতে হয়। অতএব, টিম এবার চামড়ার নৌকো বানাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন।

প্রথমেই গেলেন লন্ডন লাইব্রেরিতে। চামড়ার ঐতিহাসিক ব্যবহার সম্পর্কে নানারকম বই পড়তে-পড়তে তিনি বারবার যে-নামটি পেলেন, সেই নামটি হল জন ওয়াটারার। তিরাশি বছর বয়েস এই চর্ম-বিশেষজ্ঞের। তাঁর সঙ্গে টিম দেখা করতে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, চামড়ার নৌকো বানানো সম্ভব এবং আটলান্টিক পাড়ি জমানোও সম্ভব।' জন তাঁকে পাঠালেন বিখ্যাত চর্মবিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট শিকেশের কাছে। ডক্টর শিকেশ সব শুনে টিম-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হ্যারল্ড বার্কিনের। হ্যারল্ড সারা পৃথিবীতে বাছাই-করা চামড়া বিক্রির ব্যবসা করেন।

এরপরই শুরু হল নৌকো বানাবার চামড়া সংগ্রহ করা। মুশকিল হল এক জায়গায়। ব্রেনডানের নৌকোয় যে চামড়া ব্যবহার হয় তা ট্যান করা হয়েছিল ওকগাছের ছাল দিয়ে, কিন্তু ওকগাছের ছাল আজকাল আর পাওয়াই যায় না। শেষ অবধি, ডক্টর শিকেশ ওকগাছের ছাল জোগাড় করলেন।

সবই হল, এবার দরকার একটা ডিজাইন। কলিন ম্যুডি ও প্যাট্রিক এলাম 'সোপ্রানিনো' নামে ছোট্ট একটি ইয়ট-নৌকোয় ১৯৫০ সালে আটলান্টিক পার হয়েছিলেন। তিনি সব দেখেশুনে বললেন : 'চামড়ার নৌকো অসম্ভব কিছু নয়। ল্যাটিন পুঁথিপত্র অনুসরণ করে আমি ডিজাইন বানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এটা কী করে চলবে আমি জানি না। এই ধরনের নৌকা চালাবার জ্ঞান এখন আর কারুর নেই। কাজেই, সে-বিদ্যে তোমাকেই অর্জন করতে হবে।'

ক্রসহেভেন বোট ইয়ার্ডে ষষ্ঠ শতাব্দীর নকশা অনুসারে টিম সেভেরিনের 'ব্রেনডান' নৌকো তৈরি হল—কাঠের ফ্রেমে ঊনপঞ্চাশটা ষাঁড়ের চামড়া থেকে টুকরো জুড়ে, কেটে, সেলাই করে, চামড়ার 'হালে' আগাগোড়া চর্বি লাগিয়ে।

১৭ মে ১৯৭৬। টিম, ব্রেনডান ক্রিক থেকে তাঁর এই দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গী চারজন : জর্জ মোলোনি, রলফ হ্যানসেন, আর্থার বুটস ও ট্রোনডুর পাটুর্সন। চারজনেরই অবসর সময়ে নৌকো নিয়ে যত্রতত্র ভ্রমণের বাতিক বেশ প্রবল এবং নাবিকি কাজকর্মও তাদের বেশ ভালোই জানা।

এখন নৌকোটা দেখতে হল কেমন? বেশ কায়দাদুরস্ত। আগাগোড়া চামড়ায় তৈরি একটা বিরাট ভাসমান কলার মতো! কাঠের ফ্রেমে চামড়ার পুরু তোশক এঁটে দিলে ঠিক যেমনটি হয়—তেমনই। মজার নৌকো হলেও, এতে কিন্তু বিপদ অনেক। যেমন : ঢেউয়ের ধাক্কায় ফেটে যেতে পারে, চামড়ার সেলাই ছিঁড়ে যেতে পারে, নৌকোর নিচে 'কীল' না-থাকায় এলোমেলো ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে ওটা ধাঁ করে উলটে যেতে পারে। কিন্তু, টিম আর সঙ্গীসাথীরা ওসব ভয়-ভাবনা করলেন না। তাঁরা নৌকোটা নিয়ে দিব্যি ভেসে পড়লেন।

নতুন বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৭-এর গোড়ার দিকে ব্রেনডান মোটামুটি চলেছে। খুব একটা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়তে হয়নি। ঠিক তিমিমাছের মতোই নৌকোটার চালচলন। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ল সবার—নৌকোর মুখ ঠিক যেদিকে ঘোরানো হয়, ঠিক তার উলটোদিকে নৌকোটা সরে যায়! ব্যাপারটা কী, ধরার আগেই ব্রেনডান পড়ল এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-এলাকায়। বিরাট বিরাট ঢেউ দেখে মনে হল এই বুঝি নৌকোটা ওলটাল! না, শেষ অবধি কিন্তু ওলটায় না, ঢেউগুলোই যেন নৌকোটাকে নিয়ে খেলা করে।

প্রথম ঢেউটা এত ধীরে-ধীরে নৌকোটাকে উপরে তুলে নিয়ে যায় যে মনে হয় যেন একটা গোটা যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, তারপরই আর-একটা ঢেউ ওটাকে সট করে প্রথম ঢেউয়ের মাথা থেকে নিজের মাথায় টেনে আনে। অবিরাম এই দম-আটকানো খেলায় নাবিকদের প্রাণ ভয়ে খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হয়।

এইভাবেই একদিন লক্ষ্য করলেন তাঁদের নৌকো সামনের দিকে না গিয়ে পেছনদিকে চলছে তরতর করে! অন্যদিকে, ঝড়ের দাপটে পালের দড়ি-দড়া সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। কী করা যায়! জর্জ আবার একটা মতলব বের করলেন। নৌকোর সামনের দিকটা তিনি পেছনে, আর পেছনের দিকটা করে দিলেন সামনে। ব্যস, আর-কোনো সমস্যা রইল না দিগ্‌নির্ণয় করতে! ব্যাপারটা অবশ্য বিদঘুটে হল, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর নৌকোর নকশাতে সবই তো একটু বিদঘুটে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও, ব্রেনডানের নৌকোর রহস্য যেন অনেকখানি উদ্ঘাটিত হল।

এইভাবে ঝড়ের প্রথম ধাক্কা সামলানো গেল। এখনও ৩,০০০ মাইল বাকি। মাঝে মাঝে কৌতূহলী তিমিমাছের ছানাপোনারা নৌকোর গা ঘেঁষে-ঘেঁষে চলতে লাগল।

১৩ মে অবধি বেশ ভালোই কাটল। তারপরই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ১৬ মে'র পর থেকে শুরু হল অনবরত বৃষ্টি, কুয়াশা আর হিম। একটা তেরপল দিয়ে পুরো নৌকোটা ওরা ঢেকে দিলেন। পশ্চিমের হাওয়া ধরে চলতে গিয়ে দেখা গেল ব্রেনডান দুর্দান্ত বেগে উত্তরের দিকে ছুটে চলেছে। কোনোমতেই আর সামলানো যাচ্ছে না।

ব্রেনডান থেকে ঠিক নব্বই মাইল দূরে গ্রিনল্যান্ডের বরফে ঢাকা পূর্বাঞ্চল। এখনও অবধি আশপাশে পানি আছে, আর কিছুদূরে গেলেই বরফের সঙ্গে ধাক্কা অনিবার্য। ৩০ মে খবর এল সকালবেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে এক ঝড়-তুফান ছুটে আসছে। খবর আসার ঘণ্টাখানেক পরেই বিরাট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল নৌকোর উপর। নৌকোর অর্ধেক

পানিতে ভরে যেতে সবাই মিলে পাম্প চালিয়ে পানি ছেঁচে ফেলতে ব্যস্ত হলেন।

আরও খানিকক্ষণ পর প্রচণ্ড গর্জনে আর-একটা ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৌকোর মধ্যে। পানির ঘূর্ণিতে ভেসে উঠল স্লিপিং ব্যাগ থেকে রান্নার জিনিশপত্র অবধি। এদিকে বই ভাসছে, ওদিকে ম্যাপ, আর একদিকে রেডিও। অদম্য সাহসে ঐ চার নাবিক আবার পানি ছেঁচে চললেন। মাঝে মাঝে একজন গিয়ে ঢেউয়ের মাথার উপর নৌকোটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে পানি ছেঁচে বের করার পর আবার একটা ঢেউ। অর্থাৎ আরও এক ঘণ্টা পানি-ছেঁচা। কিন্তু এইভাবে পানি ছেঁচে কতক্ষণ চলবে! হঠাৎ টিমের মনে পড়ে গেল, তেরপলের বদলে চামড়া দিলে কেমন হয়। নৌকোর মধ্যে বাড়তি কিছু চামড়া আছে! মিনিট পনেরোর মধ্যে চামড়ার একটা চাদর নৌকোর ছাউনির সঙ্গে বেঁধে একেবারে মজবুত করে সেলাই করে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একটা ঢেউ। এবার কিন্তু সেই ঢেউ চামড়ার চাদরের ওপর দিয়ে আরেকপাশে গড়িয়ে পড়ল, নৌকোর মধ্যে আর ঢুকতে পারল না। এইভাবে চলল ১ জুন অবধি। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত দুর্যোগের মধ্যেও ব্রেনডানের গতি কিন্তু ব্যাহত হয়নি।

সেই দিনই বিকেলে চারজনেই চমকে উঠলেন।

ক্র্যাক...ক্র্যাক...ক্র্যাক...

আশপাশ থেকে কিছু-একটা ভেঙে পড়ার আওয়াজ এবং আওয়াজটা বেশ জোরেই হচ্ছে। জর্জ মুখ বাড়িয়েই আঁতকে উঠলেন। ব্রেনডান প্রচণ্ড গতিতে বরফের উপর ধাক্কা মারছে। আর বরফগুলো আশপাশ থেকে চাড় খেয়ে ভেসে পড়ে নৌকোর চারপাশে গোল হয়ে ভাসছে।

টিম চেঁচালেন : 'পাল নামাও! পাল নামাও!'

পাল খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো অবধি ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড়। আশপাশ ঘন অন্ধকারে জমাট। টর্চের আলো ফেলে যে-দৃশ্য চোখে পড়ল, তা আরও ভয়ঙ্কর। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বিরাট বিরাট বরফের

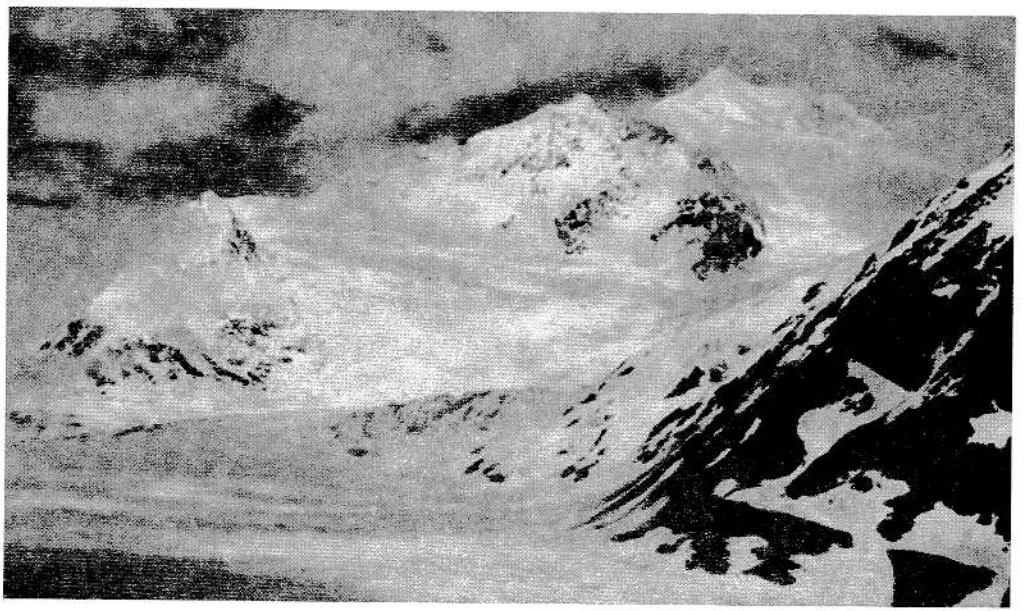

চাঙড় রাক্ষসের মতো দাঁত বের করে আছে! এই বরফের মধ্যে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।

এঁরা কোনোক্রমে নৌকোর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এত করেও কিছু করা গেল না, ব্রেনডান সোজা একটা রাক্ষুসে বরফের গায়ে এসে ধাক্কা মারল! আর অন্যদিক থেকে ভাসমান একটি বিরাট বরফের টুকরো ধীরেসুস্থে গড়িয়ে এল ব্রেনডানের দিকে। সেইসঙ্গে ধাক্কা-খাওয়া বরফের কিছু চাঙড় প্রচণ্ড শব্দে ব্রেনডানের উপর ভেঙে পড়ে তার মাস্তুল প্রায় আটকে দিল।

কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত, আর ঠিক সেই অবসরে আচমকা ছুটে-আসা একটি ঢেউ ব্রেনডানকে ঠিক আগের মতোই মাথায় তুলে বরফের আরেকপাশে—পানির এলাকায় নামিয়ে দিল।

এইভাবে রাতটা কেটে গেল।

সকালে আরও এক গা-ছমছমে দৃশ্য।

মাইলের-পর-মাইল শুধু বরফ আর ফাঁকে-ফাঁকে পানি। স্রোতের ধাক্কায় বরফ কাটাতে-কাটাতে ব্রেনডান এগুতে লাগল, তারপরই পড়ল এক ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে। বরফ হালকা হয়ে এসেছে, কিছুটা গেলেই খোলা সমুদ্র, ঝড়ও ততটা নেই। পানির এলাকার মধ্যে একটা বরফের পুরু আস্তরণের ফাঁক দিয়ে ব্রেনডান একটু এগিয়েছে—সেই মুহূর্তে বরফের সামনের দিক জুড়ে গেল। পেছনে ফেরারও পথ নেই—সেখানে ইতিমধ্যে বরফের একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে গেছে। দুদিক থেকে বরফের চাপে ব্রেনডান হঠাৎ বরফের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে পানিতে পড়ল। তারপরই এক অঘটন। নৌকোর মধ্যে ফোয়ারার মতো পানি ঢুকছে। অর্থাৎ কোথাও একটা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। আবার চলল পানি ছেঁকে বের করার কঠিন পরিশ্রম ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধরে।

টিম এবার কানাডিয়ান কোস্টগার্ডের সেন্ট এ্যান্টলি কেন্দ্রে বেতার-বার্তা পাঠালেন। ওপার থেকে জবাব এল : 'গুজ বে থেকে একুশ ঘণ্টার মধ্যে আইসব্রেকার পৌঁছবে আপনাদের কাছে।'

আরও খবর এল ওই কেন্দ্র থেকে : যে-জায়গায় ব্রেনডান আটকা পড়েছে, ঠিক ওই জায়গাতেই কয়েকদিন আগে কার্সন নামে একটা আইসব্রেকার জাহাজ ডুবে গেছে। কাজেই, এইরকম একটা জায়গা থেকে একটা চামড়ার নৌকা কীভাবে রেহাই পাবে, সে-বিষয়ে কোস্টগার্ডের বেশ সন্দেহ আছে।

সারারাত ধরে পানি ছেঁচতে-ছেঁচতে সবাই ছ্যাঁদাটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন, ভোররাতের দিকে টিম হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নৌকোর এককোণে ফোসফোরসেনসের আলো ঝিলিক দিচ্ছে। নৌকোর মধ্যে ফোসফোরসেনসের আলো এল কী করে? ওইখানেই তাহলে ছ্যাঁদাটা আছে। সবাই মিলে পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, আঙুলের মতো ছোট্ট একটি ছ্যাঁদা আর পানির চাপে চামড়া প্রায় ইঞ্চি-চারেক লম্বাটে হয়ে চিরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডুবুরির পোশাক পরে—ফোয়ারার মতো ছিটকে-আসা পানির মধ্যে নেমে পড়ে চামড়ার পট্টি লাগিয়ে সেলাই করতে বসে গেলেন। জিরো সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডায় দুদিন ধরে এই সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ চলল একটু একটু করে। তন্নতন্ন করে নৌকোটা দেখলেন ওঁরা। না, আর কোথাও কোনো ক্ষতি হয়নি।

সেন্ট এ্যান্টনিতে টিম খবর পাঠালেন : 'আইসব্রেকার পাঠাতে হবে না।' আর সমস্ত খবরও তাঁরা জানালেন ওই কেন্দ্রে।

এই কদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও, ওই চার নাবিকের মধ্যে তখন নতুন উদ্যম। প্রত্যেকেই বললেন : 'নৌকোটা চামড়ার ছিল বলেই মেরামত করতে পারা গেছে—কাঠ কিংবা ফাইবার গ্লাস হলে ডুবে মরতে হত।'

না, এরপর আর-কোনো বিপদ হয়নি। ঠিক এক সপ্তাহ পরে ব্রেনডান, নিউফাউন্ডল্যান্ডের পেকফোর্ড আইল্যান্ডে নিরাপদেই পৌঁছেছিল।

জসীম উদ্‌দীন

রাখাল ছেলে

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'

'ওই যে দেখ নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা;
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড়ো না!'

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথা ধাও,
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।'

'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারারাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু-খান পা,
বলছে ডেকে : 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা।'
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে ভাই
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই!'

'রাখাল ছেলে। রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,
এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।'

'কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলি।
সরষে বালা নুইয়ে গলা হলদে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে।
ঝাউয়ের ঝাড়ে বাজায় বাঁশি পউষ-পাগল বুড়ি,
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি, জানিই নেকো বসা।'

ও হেনরি

প্রেম, ঘড়ি ও খলিফা

ভ্যালেলুনা রাজ্যের রাজকুমার মাইকেল বসে আছে। পার্কের পছন্দমতো একটা বেঞ্চে সেপ্টেম্বরের রাত্রির ঠাণ্ডা তার শরীরে দুর্লভ ওয়াইন টনিকের মতো দ্রুত জীবন সঞ্চার করছে। বেঞ্চগুলো শূন্য। পার্কচারীরা তাদের উত্তাপহীন রক্তস্রোত নিয়ে হেমন্ত-শীতের প্রথম স্পর্শেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছে।

পূর্বদিকে বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে আকাশ আলো করে এইমাত্র চাঁদ উঠল। মিহি ধারায় ঝরে-পড়া ফোয়ারার পাশে ছেলেমেয়েরা হৈ-হল্লায় ব্যস্ত। ছায়াবৃত কোণগুলোতে হরিণ-দম্পতিরা প্রেম নিবেদনে রত। মানুষের দৃষ্টি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন। দেশি মিস্ত্রির তৈরি মাউথ-অর্গান কে যেন বাজিয়ে চলেছে পথের ধারে। ছোট্ট পার্কের মনোরম পরিবেশের চারদিকে রাস্তার মোটরগুলো বিচিত্র হর্ন বাজিয়ে চলেছে—পিপ, মিউ, ভ্যাপ। চলমান ট্রেনের গর্জন যেন বাঘ-সিংহের মতো পার্কটির নির্জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। গাছের মাথার উপর শোভা পাচ্ছে প্রাচীন পাবলিক বিলডিঙের টাওয়ারের একটা গোল আলোকোদ্ভাসিত ঘড়ি।

প্রিন্স মাইকেলের ছেঁড়া জুতো-জোড়া মেরামত করা সুদক্ষ মুচিরও আয়ত্তের বাইরে। জীর্ণ বস্ত্রের যে-কোনো ব্যবসায়ী তার পরিহিত পোশাক সম্বন্ধে কথা বলতে অস্বীকার করবে। দুই হপ্তার ক্লান্তির রেখা পড়েছে তার চেহারায়। ধূসর—বাদামি-লাল—সবজে—হলুদ—এসব বিচিত্র রঙের সম্মিলিত

সমন্বয় বা কোরাসের সুর যেন। যার প্রচুর পয়সা আছে তেমন কোনো মানুষই ওর মতো জঘন্য টুপি ব্যবহার করে না।

প্রিয় বেঞ্চটিতে বসে মৃদু হাসল প্রিন্স মাইকেল। সে ভেবে সুখ পাচ্ছে যে, ইচ্ছে করলে সামনের সবকয়টি আলোকিত জানালাঅলা বিরাট-বিরাট অট্টালিকা কিনে নেবার সামর্থ তার রয়েছে। মানহাট্টানের এই গর্বোন্নত নগরীর যে-কোনো কুবেরের সমান সোনা, হিরে-জহরত, মূল্যবান শিল্পসামগ্রী জড়ো করতে পারে সে, এত বেশি জমিদারি ও সম্পত্তি কিনতে পারে যে তাদের সবগুলো ঘুরে দেখার সময়ও হবে না তার। শাসক রাজন্যবর্গের সাথে একাসনে বসতে পারে সে।

সামাজিক জগৎ...শিল্পের জগৎ...সুন্দরের সমাবেশ...সর্বোচ্চ সম্মান...জ্ঞানীর প্রশংসা...তোষামোদ...অনুকরণ...ধনী জমিদারের সঙ্গ...বিবেচনা...যোগ্যতা...ক্ষমতা... আনন্দ... যশ...জীবনের সমস্ত মধু ভ্যালেলুনা রাজ্যের প্রিন্স মাইকেলের জন্যে যেন সঞ্চিত। যখন খুশি সে তা নিতে পারে। কিন্তু জীর্ণবাসে পার্কের বেঞ্চে বসে ধ্যানস্থ হতেই তার সাধ। কারণ জীবন-বৃক্ষের ফল সে আস্বাদ করেছে। মুখের তিক্ত স্বাদ নিয়ে তাই সে স্বর্গ থেকে এগিয়ে এসেছে মর্ত্যের নিপীড়িত হৃদয়-বেদনার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে।

রাঙা দাড়িঅলা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই এসব চিন্তা স্বপ্নের মতো ছায়া ফেলে গেল তার মনের পর্দায়। দরিদ্রতম ভিক্ষুকের বেশে পার্কে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষকে চিনতে ভালো লাগে তার। ধনৈশ্বর্য, উচ্চাসন, মোদ্দাকথায় জীবনের কাম্য জিনিশের চেয়ে সত্যানুসন্ধানেই বেশি আনন্দ তার।

ওর প্রধান শান্তি ও সান্ত্বনা মানুষকে বিপদমুক্ত করা। সত্যিকারের প্রয়োজনে সাহায্য করা, ভাগ্যাহতকে অপ্রত্যাশিত ও রাজসিক উপহারে সুখি করা—সত্যিকারের রাজকীয় মাহাত্ম্যে সবকিছু সুবিবেচনার সাথে বিচার করা।

টাওয়ারের গায়ের বিরাট ঘড়িটার উপর নজর পড়তেই প্রিন্স মাইকেলের হাসি কতকটা বিরক্তিতে পর্যবসিত হল। অনেক বিরাট ব্যাপার নিয়ে ভাবছে সে। সময়ের বিতর্কমূলক গণ্ডিরেখার কাছে গোটা দুনিয়ার বশ্যতা ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। এই-যে মানুষের অবিরাম দ্রুত আসা-যাওয়া ঘড়ির ক্ষুদ্র কাঁটার মাপে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এই চিন্তা সবসময়ই তাকে বিমর্ষ করে তোলে।

ইতোমধ্যে সান্ধ্য-পোশাকে এক যুবক এল। প্রিন্সের বেঞ্চ থেকে একটু দূরে তৃতীয় বেঞ্চটিতে সে বসল। মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে সে প্রায় আধঘণ্টা সিগারেট টানল, বারবার করে চাইল গাছের উপর দিয়ে টাওয়ারের মাথার বড় ঘড়িটার দিকে। সুস্পষ্ট ওর অস্থিরতা। প্রিন্স লক্ষ করল যে, যুবকের মনঃপীড়ার কারণ যেভাবেই হোক ঐ ধীরগতিতে চলা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জড়িত। মহামান্য প্রিন্স উঠে গেল যুবকের বেঞ্চে।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে মাফ চাইছি', বলল সে। 'আমার মনে হয় আপনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার হয়, আমি সাহায্য করতে রাজি। আমি প্রিন্স মাইকেল, ভ্যালেলুনা রাজ্যের সিংহাসনের ভাবী-উত্তরাধিকারী। আমাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়ই—তাই না? ওটা আমার সখ। যাকে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে হয় তাকে সাহায্য করি। হয়তো-বা আপনার কষ্ট আমাদের দুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় লাঘব হতে পারে।'

যুবক প্রিন্সের দিকে চাইল। দৃষ্টি উজ্জ্বল বটে কিন্তু ভ্রূকুটির বঙ্কিম রেখা তখনও সোজা হয়নি। ভ্রূভঙ্গি নিয়েই সে হাসল। ঠিক হাসল কিনা যেন বোঝা গেল না। বলল, 'প্রিন্স, আপনাকে দেখে সুখি হলাম। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি আপনাকে চেনার যো নেই। আপনার সাহায্যের প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার সাহায্যে এতে কোনো সুবিধা হবে বলে তো মনে হয় না। ব্যক্তিগত ব্যাপার, বুঝলেন? তবু ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

যুবকের পাশে বসে পড়ল প্রিন্স মাইকেল। সাহায্য দিতে চেয়ে বহুবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে, কিন্তু কখনোই ঔদ্ধত্যের সাথে কেউ প্রত্যাখ্যান করেনি। তার উন্নত ললাট আর নম্র ব্যবহার এমন কিছু ছিল যা ঠেকিয়ে রেখেছে অবমাননাকে।

'ঘড়ি হল মানুষের পায়ে বিরুদ্ধতার নিগড়। দেখলাম, বারবার করে ঘড়ি দেখছেন আপনি। ওটার চেহারাটা অত্যাচারীর মতো, নম্বরগুলো লটারির টিকিটের মতোই ভুয়ো আর হাতদুটো নিশি ভূতের হাতের মতোই ভয়ঙ্কর, দয়ামায়াহীন। অনুনয় করে বলছি, চোখ-রাঙানো পেতল আর ইস্পাতের ঐ দৈত্যটার দাসত্ব ঝেড়ে ফেলে দিন আপনি।'

যুবক বলল, 'সাধারণত সেটা করি না আমি। কাজকর্মের সময় প্রায়ই ঘড়িটা সঙ্গে রাখি।'

'গাছপালা আর দূর্বাঘাসের মতোই মানবপ্রকৃতিটা আমার ভালোভাবে জানা'—প্রিন্স বলল গভীর আন্তরিকতার সাথে। 'দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত লোক আমি। চারুকলার গ্র্যাজুয়েট। আর তাছাড়া সৌভাগ্য-দেবতার খাজাঞ্চিখানা আমার হেফাজতে। মানুষের এমন দুঃখ কমই আছে ইচ্ছে করলে যা দূর করা আমার সাধ্যাতীত। আপনার চেহারায় দেখতে পাচ্ছি সততা, আভিজাত্য আর অসহায়তার সংমিশ্রণ। দয়া করে আমার উপদেশ বা সাহায্য নিন। আপনাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে। চেহারা দেখে আমার সামর্থ্য বিচারের মতো আহাম্মকি করবেন না।'

ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই যুবকের কপাল কুঞ্চিত, নিষ্প্রভ হয়ে এল। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সে চারতলা এক লাল ইটের বাড়ির দিকে। বাড়ির খড়খড়িগুলো নামানো, তাদের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আলোর সামান্য একটু আভাস।

'নটা বাজতে দশ মিনিট!'—হতাশায় যুবকের হৃৎপিণ্ডটাই যেন নিঙড়ে বেরিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর পা বাড়াল হনহন করে।

'দাঁড়ান!'—প্রিন্সের গর্জনে তড়াক করে ঘুড়ে দাঁড়াল যুবক। হেসে ফেলল।

'দশ মিনিট সময় দিচ্ছি ওকে, তারপরেই ইতি', বিড়বিড় করে বলল সে। তারপর গলা চড়িয়ে—'আপনারই মতো ঘড়ির চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করব এবার, আর সে-সঙ্গে মেয়েদেরও।'

'বসুন,' শান্তস্বরে বলে প্রিন্স। 'ঘড়ির সাথে মেয়েদের ভাব-সাব একটু কম। সময়রূপ দৈত্যই আমাদের আনন্দকে সঙ্কীর্ণ—সীমাবদ্ধ করে দেয়। আমার ওপর যদি আস্থা থাকে তবে আপনার গল্প বলুন শুনি।'

উদ্ভাসিত হাসিতে যুবক নিজেকে যেন ছুড়ে দিল বেঞ্চের উপর। সকৌতুকে সে বলতে শুরু করল, 'মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজের চরণে নিবেদন করছি। আপনি কি ঐ বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন—ঐখানে—ঐযে তিনটি জানলায় যেখানে আলো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আজ বিকেলে ওখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি—অর্থাৎ ইয়ে, মানে আমরা—সে আমার বাগদত্তা। আমি কুপথে চলছিলাম—প্রিন্স, অতি বদছেলে আমি। সে সবই শুনতে পেয়েছে, আমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আমরা সবসময়ই চাই মেয়েরা আমাদের ক্ষমা করুক, তাই নয় কি প্রিন্স?

'সে বলেছে—'ভেবে দেখার সময় চাই। তবে, নিশ্চিত জেনো তোমাকে হয়তো সম্পূর্ণ ক্ষমাই করব—নয়তো কখনো আর তোমার মুখ দেখব না। এর ভেতর আপস-রফা নেই।' সে বলেছে—ঠিক সাড়ে আটটায় উপরের তলার মাঝখানের জানালার দিকে তাকাবে। তোমায় ক্ষমা করব, এই যদি ঠিক করি তবে জানলায় শাদা সিল্কের চাদর ঝুলিয়ে দেব। তাহলেই তুমি জানতে পারবে সবকিছুই ভুলে গেছি। তুমি আমার কাছে আসবে। আর যদি চাদর না দেখ তবে বুঝবে আমাদের সব সম্বন্ধ চিরদিনের মতো চুকে গেছে।'

তিক্ত সুরে যুবক বলল, 'সেজন্যেই আমি ঘড়ি দেখছি। সঙ্কেত পাবার নির্দিষ্ট সময়ের পর তেইশ মিনিট পার হয়ে গেছে। কাজেই আমি এখন কিছুটা অস্থির বলে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না, জীর্ণ চীরধারী প্রিন্স?'

আবেগজড়িত কণ্ঠে প্রিন্স মাইকেল বলল, 'আবার বলছি, মেয়েতে-সময়ে সম্পর্কটা সাপে-নেউলে। ঘড়িগুলো এক-একটা শয়তান আর মেয়েরা আশিস-স্বরূপা। আপনার সঙ্কেত-চিহ্ন এখনও তো দেখা যেতে পারে?'

যুবক বলল, 'মোটেই না। আপনার ধারণা ভুল। মেরিয়ানকে আপনি চেনেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে সে। এটাই প্রথমত আমাকে আকর্ষণ করে। আহ্বানের পরিবর্তে আমি প্রত্যাখ্যানই পেয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল যে আটটা একত্রিশ মিনিটেই আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। জ্যাক মিলবার্নের সঙ্গে পশ্চিমে যাব আজ রাত পৌনে বারোটায়। এবার ওঠা যাক। কিছুদিনের জন্য জ্যাকের খামারে যাব—তারপর ডুবে যাব হুইস্কির মধ্যে—গুড নাইট, প্রিন্স!'

প্রিন্স মাইকেল হাসল। সুন্দর, ভদ্র, বিনীত সে হাসি। যুবকের কোটের প্রান্ত টেনে ধরল সে। রাজকুমারের চোখের ঔজ্জ্বল্য কোমল, স্বপ্নাতুর, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল। 'ধীরে বন্ধু, ধীরে।' নির্লিপ্তভাবে প্রিন্স বলল। 'ন-টার ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত দেরি করুন। অনেকের চেয়ে বেশি আমার সম্পদ—ক্ষমতা—জ্ঞান। কিন্তু ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলে আমার বড্ড ভয় হয়। ন-টা বাজা পর্যন্ত আপনি আমার কাছে বসুন। ঐ মেয়ে আপনারই হবে। ভ্যালেলুনার উত্তরাধিকারী প্রিন্সের কথা রাখুন। আপনার বিয়েতে এক লাখ ডলার আর হডসন নদীর তীরে একটা বাড়ি উপহার দেব আমি। কিন্তু একটা শর্তে। সে-বাড়িতে কোনো ঘড়ি থাকবে না। ওটা আমাদের সুখের সময়কে সীমাবদ্ধ করে—দুঃখ দেয়। আপনি কি এতে রাজি?'

'নিশ্চয়ই।' খুশি হয়ে যুবক উত্তর দিল। 'ওগুলো অর্থহীন, বাজে—সারাক্ষণ টিকটিক করে, ঘণ্টা বাজায়—আর ডিনারে দেরি করিয়ে দেয়।' সে আবার টাওয়ারের ঘড়ির দিকে চোখ তুলল। ঘড়ির কাঁটা ন-টার তিন মিনিট দূরে দাঁড়িয়ে।

প্রিন্স মাইকেল বলল—'ভাবছি, একটু ঘুমোব—সারাদিন বড্ড ক্লান্তিতে কেটেছে।' দেহটাকে বেঞ্চে ছড়িয়ে দিল, যেন সে এর আগেও এমনি করে শুয়েছে বহু। ঘুম-জড়ানো চোখে প্রিন্স বলল, 'যে-কোনোদিন সন্ধ্যায় আমার দেখা পাবেন এখানে। অবশ্যি ভালো আবহাওয়া থাকলে। বিয়ের দিন ঠিক হলে আসবেন—চেক দেব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, ইওর হাইনেস'—এতটুকু ব্যঙ্গের লেশ নেই যুবকের কণ্ঠস্বরে। 'হডসন নদীর তীরের বাড়িটার আর দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবু বড্ড খুশি হয়েছি আপনার সদয় উপহারের প্রস্তাবে।'

প্রিন্স মাইকেল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। ছেঁড়া টুপিটা বেঞ্চের তলায় গড়িয়ে পড়েছে। যুবক সেটা তুলে প্রিন্সের ঘুমন্ত মুখের উপর রেখে আরাম করে একটু নড়ে বসল, যেন একটা গভীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে।

'হতভাগ্য!' বলল সে ছেঁড়া কাপড়গুলো ওর বুকের উপর ঠিক করে দিয়ে—।

সারা এলাকাটাকে চমকে দিয়ে টাওয়ারের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন-টা বাজল। বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্দিষ্ট জানলায় শেষবারের মতো তাকাল যুবক—আর উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সঙ্গে-সঙ্গেই।

উপরতলার মাঝখানের জানলায় হেলে-দুলে পৎপৎ করে উড়ছে বাঞ্ছিত মার্জনার তুষার-শুভ্র সঙ্কেত-চিহ্ন—আলো-আঁধারির কারচুপিতে চাদরটাকে দেখাচ্ছে স্বর্গীয় কোনো বিহঙ্গীর শ্বেতপক্ষের মতো।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক ঘরমুখো নাগরিক। গোল-গাল, বিলাসী গোছের। বৈচিত্র্যবিহীন এ-শহরের বিশেষ একটা জানলায় শাদা সিল্কের একখানি চাদর কতবড় আনন্দের বার্তা ঘোষণা করছে

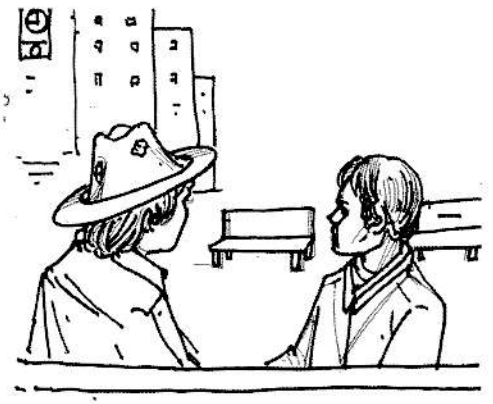

সেটা সে কল্পনাও করতে পারবে না। এগিয়ে গিয়ে যুবক তাকে পাকড়াও করল। 'দয়া করে সময়টা একবার বলবেন?'

বিষয়ী লোকের মতো সাবধানে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে লোকটি বলল :

'আটটা বেজে সাড়ে উনত্রিশ।' অভ্যেসের বশেই টাওয়ারের ঘড়ির দিকে চাইল সে। 'ওরে বাবা! ও-ঘড়িটা আধঘণ্টা এগিয়ে! দশ বছরে এই প্রথমবার বিগড়াতে দেখলাম, মশাই। আমার এ-ঘড়ি কিন্তু এক সেকেন্ডও—'

শেষের কথাগুলো শূন্যতাকে লক্ষ করেই বলা। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল বিলীয়মান ছায়ার মতোই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শ্রোতা—যেদিকে উপরতলার তিনটে জানলায় আলো।

পরদিন সকালে এল দুজন পুলিশঅলা। বেঞ্চির উপর গুঁড়ি মেরে পড়ে-থাকা ন্যাকড়া-সর্বস্ব একটা মূর্তি ছাড়া গোটা পার্কটা জনমানবশূন্য। ওর দিকে তাকাল তারা।

একজন বললে, 'মাতাল মাইকটা। রোজ রাতে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকবে, কুড়ি বছর ধরে এ-পার্কেই আস্তানা ওর। মনে হচ্ছে এবারে বাছার হয়ে এল।'

আর একজন পুলিশঅলা ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখল ওর হাতের মুঠোয়, 'দেখেছ, কাকে ঠকিয়ে ৫০ ডলারের একখানা নোট মেরে এনেছে ব্যাটা। আফিম না চণ্ডু, কী খায় ব্যাটা, বলতে পার?'

তারপর ভ্যালেলুনার রাজকুমার মাইকেলের জুতোর তলায় বাস্তবের লাঠির ঘা শোনা গেল, 'থপ, থপ, থপ'।

নয়নতারা

আমরা সকলেই নয়নতারা গাছটি চিনি। বাড়ির বাগান, টবে, এমনকি বাড়ির আনাচেকানাচেও এই গাছটিকে আমরা দেখে থাকি; কিন্তু এর অসাধারণ গুণের খবর আমরা কজন রাখি?

নয়নতারা গাছটিকে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কাজে লাগাই না। কেবলমাত্র পাতা ও শিকড়কেই আমরা বিশেষভাবে কাজে লাগাই। এই পাতা ও শিকড় থেকে বর্তমানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে। যার মধ্যে ভিনক্রিস্টিন ও ভিনব্লাসিন উল্লেখযোগ্য। আর এই উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে জানো? এই দ্রব্যগুলো থেকে ক্যানসার রোগের ওষুধ তৈরি হচ্ছে। একটু অবাক হয়ে পড়েছ, তাই না? না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এইরকমই বহু গাছ আছে, যারা আমাদের বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রস্তুতিতে সাহায্য করে চলেছে। এবারে নিশ্চয়ই গাছটির প্রশংসা না করে পারবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নীতি-কবিতা

অপব্যয়ের ফল

যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

সুসময়

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর, এই বিশ্বপতি যিনি
সকল সময়ে বন্ধু, সকলের তিনি।

সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে.
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।

অনাহারে কেন মৃত্যু হয়?

আমাদের দেশে ঊর্ধ্বতন মহলে একটি হাস্যকর বক্তব্য প্রায় শোনা যায় যে, মৃত্যুর কারণ অনাহার নয়। উপস্থাপন ভঙ্গিটা এ রকম যে, যিনি অল্প বাংলা শিখেছেন তিনি অনাহারকে থ্রমবোসিস, ক্যানসার, কলেরা বা নিউমোনিয়ার মতো একটা রোগ মনে করবেন। কিন্তু অনাহার রোগ নয়, সে হল রোগের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ—যার সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক স্ত্রী-পুরুষের স্বাস্থ্য জড়িত আছে।

অনাহার এবং তার সঙ্গেই আছে অপুষ্টি। এই দুয়েরই সর্বদা সহ-অবস্থান নজরে আসে। এতে যারা ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ জনের প্রধানত ফুসফুসে যক্ষ্মা আছে এবং সত্য কথা, সে যক্ষ্মা মারাত্মক ধরনের। প্রাথমিকভাবে অপুষ্টি নিয়ে আসে অজীর্ণতা কিন্তু পরে এরজন্যই পরিপাকশক্তি হ্রাস পায় এবং কোনো খাদ্যবস্তুই পরিপাক করা সহজ হয় না। তাছাড়া অপুষ্টির জন্যে সর্দি, কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিস দেখা যায়। অপুষ্টিজনিত রোগে যাঁরা ভোগেন তাদের মধ্যে ব্যাসিলাই জীবাণুঘটিত অর্থাৎ আমাশয়জাতীয় রোগও দেখা যায়। তাছাড়া এর জন্যে কোনো-না-কোনো জীবাণু অথবা রাউন্ড ওয়ার্ম বা কেঁচোজাতীয় আন্ত্রিক-পরজীবী রোগীকে আক্রমণ করে, রোগীর খাদ্যে ভাগ বসায়, রোগ সংক্রমিত করার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

সুস্থ শরীরকে রোগজীবাণু যতটা কাহিল করে, অপুষ্টিতে তা আরও মারাত্মক হয়ে আসে। ফলে অপুষ্টি রোগসংক্রমণে সহায়তা করে। আবার বিপরীত দিক দিয়ে রোগসংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আরও অপুষ্টি দেখা দেয়। এইভাবে একটি দুষ্টচক্র নিয়ত আবর্তন করে চলে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এই চক্র আরও বিশেষভাবে শিশুদের পুষ্টিকে ব্যাহত করে। সেখানে শুধু অপুষ্টি নয়, সেই সঙ্গে আছে পরিবেশ—সে পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিকূল। ফলে অপুষ্টির সঙ্গে যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মেশে, সেখানে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। শিশুদের কথা, গর্ভবতী মেয়েদের কথা একবার ভাবা যাক। এদের জন্যে এবং সকলের জন্যে প্রয়োজন যেমন পুষ্টির, তেমনি স্বাস্থ্যকর পরিবেশেরও।

শুধু খাদ্য নয়, বরং এভাবে বলা দরকার যে, পরিবেশ যেখানে দূষিত, দুর্গন্ধময়, সেখানে খাদ্যের উন্নতিতেও কিছু করা সম্ভব নয়।

তবু আমাদের পারিপার্শ্বিক এই অবস্থায় এবং খাদ্যের অপ্রতুলতায় রোগ প্রতিরোধের জীর্ণ-ধর্ম নিয়ে অনাহারে মৃত্যু হয় না—এমন কথা বলায় কী যুক্তি থাকতে পারে?

হাস্যকৌতুক

সম্রাট একদিন বললেন : ওহে বীরবল, এমন এক ব্যক্তিকে শহর থেকে ধরে আনো যে-ব্যক্তি একই সঙ্গে যেমনই অসমসাহসিক, তেমনি ভিতু। যদি না আনতে পারো তবে তোমার মৃত্যুদণ্ড।

কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। একদিকে সম্রাটের আজ্ঞা পালন, অন্যদিকে মৃত্যুভয়। বীরবল সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন।

পরদিন বীরবল রাজসভায় এলেন একটি তরুণী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। দরবারের সবাই অবাক। হতচকিত সম্রাট বললেন : এর মানে কী, বীরবল?

হুজুর, তবে শুনুন—বীরবল বললেন : এই মেয়েটি মাঝরাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত, সাপ-বাঘের ভয়, অন্ধকার পথঘাট—কিন্তু কিচ্ছু পরোয়া না করে একজনের কাছে যায়, যাকে এ-মেয়েটি ভালোবাসে। সশস্ত্র পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে নিজের লক্ষ্যে গিয়ে ঠিক পৌঁছয়। আবার এই মেয়েই যখন তার শোবার ঘরে বুড়ো ইঁদুরের গায়ে হঠাৎ পা দেয় রাত্তিরে—তখন মৃত্যুর ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলুন তো, এর চেয়ে সাহসীই বা কে, ভিতুই বা কে?

সম্রাট মুগ্ধ হলেন বীরবলের কথায়। সেদিন থেকে সম্রাট তাঁকে দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন।

গ্যেটে

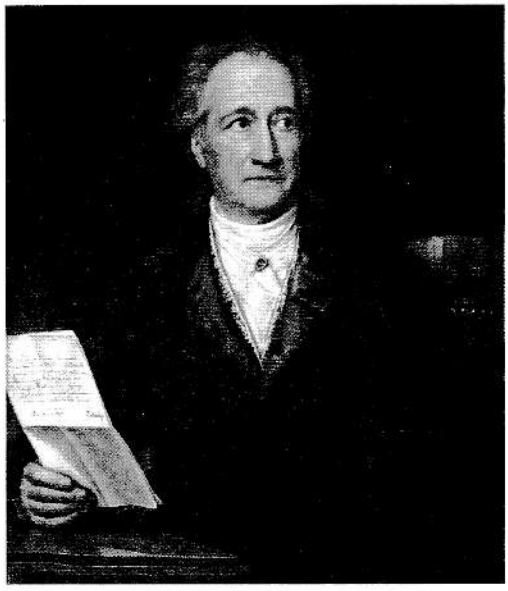

১৭৪৯ সনের ২৮ আগস্ট দিবা দ্বিপ্রহরে ফ্রাংকফুর্ট শহরে গ্যেটের জন্ম। জন্মলগ্নে বিভিন্ন গ্রহের অনুকূল সমাবেশ তাঁর জীবনে মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল, এ-কথা স্বয়ং বলেছেন গ্যেটে তাঁর আত্মচরিতে। বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই তাঁর জন্ম। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, দক্ষ শাসক, জার্মানসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ও প্রধানতম ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার।

গ্যেটের মা ছিলেন আনন্দের প্রতিমা। মায়ের সরল প্রকৃতি, সহৃদয় অন্তঃকরণ ও স্বাভাবিক বৈদগ্ধ্য তাঁর পুত্রের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যেটের পিতা ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। মা উদ্দীপ্ত করতেন পুত্রের কল্পনাশক্তিকে আর পিতা তাঁর বুদ্ধিকে।

যোহান ক্যাসপারের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পুত্র আইন শিক্ষালাভ করে একজন অধ্যাপক হয়। গ্যেটে কিন্তু দুটোর কোনোটার প্রতিই আকৃষ্ট হলেন না। পিতার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য ষোলো বছর বয়সে তিনি লাইপজিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আর নিজের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি পাঠ নিতেন পুঁথি থেকে নয়, জীবনগ্রন্থ থেকে।

গ্যেটের জীবন ও প্রতিভা দুই-ই অদ্ভুত রকমের। তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; সাত বছর বয়স থেকেই তিনি মানুষের ন্যায়বিচারে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ঐ বয়সেই তিনি ছয়টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—ইংরেজি, জার্মান, লাতিন, গ্রিক, ইতালীয় ও ফরাসি ভাষা।

জীবনধর্মের বাণীবাহক গ্যেটের জীবনের অন্তঃপুরে যে-কেউ প্রবেশ করবে সে দেখতে পাবে সেই জীবনের কী বিচিত্র বর্ণসমারোহ আর সেই প্রতিভার কী অনন্যসাধারণ উদ্ভাসন। ষোলো বছর বয়সে

তিনি একবার সংকটাপন্ন স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরই পরিণতি চরম নৈরাশ্য। আর সেই নৈরাশ্যের তাড়নায় অস্থির হয়ে তিনি লেখনী চালনা শুরু করেন তাঁর জীবনযন্ত্রণাকে ভাষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সাহিত্যকর্ম দ্বারা তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল বলেই না গ্যেটে তাঁর জীবন-প্রারম্ভে এই সংকল্প গ্রহণ করেন—'To convert my entire life into a work of art.' অর্থাৎ 'একটি মহৎ শিল্পকর্মে আমার জীবনকে রূপান্তরিত করব আমি।' এমন সংকল্প পৃথিবীতে খুব কম লোকেই গ্রহণ করেছেন।

গ্যেটে দেখতে ছিলেন অতি প্রিয়দর্শন। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা একটি নাটক। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বিবাহিত জীবনের ব্যভিচার। এই নাটক রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। ঐ বয়সের একটি ছেলের পক্ষে প্রবল যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা রচিত এই নাটকখানি অনেক পাঠকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল সেদিন। ক্রমে যৌবনে উপনীত হলেন গ্যেটে এবং সেইসঙ্গে তাঁর মধ্যে দেখা দিল যৌবনের ফেনিল মাদকতা। তখন যে-কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসত সেই-ই গ্যেটের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে পারত না। অসি চালনা এবং অশ্বারোহণে তিনি তো রীতিমতো দক্ষ ছিলেন, তার ওপর তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য সুকণ্ঠের অধিকারী। অনেকের ধারণা এমন সুকণ্ঠ নিয়ে কোনো ব্যক্তি তাঁর আগে বা পরে জার্মানিতে আর জন্মগ্রহণ করেনি।

আইনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন গ্যেটে এবং পিতার ইচ্ছানুক্রমে সুপ্রিমকোর্টে প্র্যাকটিসও আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আদালতের হালচাল দেখে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ের ওপর হয়ে উঠলেন বীতশ্রদ্ধ। অতঃপর সাহিত্যকে তিনি জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করলেন।

বাইশ বছর বয়সে প্রচণ্ড মানসিক বিক্ষোভের বশে গ্যেটে রচনা করলেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। হোমার ও শেক্সপিয়র, এই দুজনেই ছিলেন গ্যেটের প্রিয় কবি ও নাট্যকার এবং এঁদের রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বললেই হয়।

দুবছর পরে গ্যেটে রচনা করলেন The Sorrows of Worther নামে একটি উপন্যাস। সমগ্র ইউরোপ সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এই উপন্যাসখানি দ্বারা। জার্মানির জনসাধারণের ওপরও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই উপন্যাস।

পঁচিশ বছর বয়সেই গ্যেটে একজন পৃথিবীবিখ্যাত লেখক বলে গণ্য হলেন। ভাইমের আঠারো বছর বয়স্ক ডিউক প্রিন্স কার্ল আগস্ট গ্যেটেকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন ভাইমের রাজসভা অলংকৃত করার জন্য। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। তৎপরতার সঙ্গে তিনি সেই রাজ-আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন; তিনি ডিউকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হলেন। অতঃপর আরম্ভ হয় তাঁর জীবনে একটি নতুন অধ্যায়। সেই থেকে মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এই শহরটি ছিল গ্যেটের আবাসস্থল। শুধু আবাসস্থল নয়—তাঁর জীবনের যা-কিছু দুঃখকষ্ট, আশাবেদনা, সৌভাগ্য এবং মানসিক রূপান্তর তা সবই এইখানে অবস্থানকালেই সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাসাদের সন্নিকটে একটি মনোরম উদ্যানবাটিকায় ডিউকের এই তরুণ মন্ত্রীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই প্রাসাদেই দুইরকম কাজের মধ্যে অতিবাহিত হত তাঁর সময়—রাজনীতি ও কাব্যচর্চা। কেমন করে রাজ্যশাসন করতে হয়—মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াসের মতোই গ্যেটে এই বিষয়ে ডিউককে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। তাঁর জীবনের অর্ধশতাব্দীকালে এই ভাইমের হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সাহিত্যকেন্দ্র।

একাদিক্রমে দশ বছর চাকরি করার পর গ্যেটের মনে এল বিতৃষ্ণা। ডিউকের ব্যবহারের মধ্যে অনুরাগের অভাব লক্ষ করলেন তিনি। এইবার ইতালি তাঁকে আকর্ষণ করল। তিনি ইতালি ভ্রমণে বের হলেন। এই ভ্রমণ ছিল গ্যেটের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ফ্লোরেন্স দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি—এত আলো,এত রঙ তিনি জীবনে আর কোথাও দেখেননি। প্রস্ফুটিত নেবুফুলের সুবাসে তাঁর

মন হল প্রসন্ন, দেহ হল সুস্থ। ইতালির আকাশ বাতাস তাঁর চিত্তকে করে তুলল উদ্দীপ্ত ও সরস।

ইতালিতে দুবছর কাটল। গ্যেটের মানসলোকে দেখা দিল আর-একবার গভীর পরিবর্তন। তাঁর যেন নবজন্ম হল। তাঁর নিজের কথায়—'It was God, it was Nature.' এই প্রকৃতিকে তিনি বলেছেন চরম বাস্তবতা। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ এবং তার শিল্পসৃষ্টিও তাই। এই সময়েই তিনি এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন—'Great works of art are supreme works of Nature carried out in accordance with Nature's laws.' এইবার এই চরম সৃষ্টিকাজে তাঁর নিমগ্ন হওয়ার দিন এল।

মানুষের জীবনে যা-কিছু পরম কাম্য, তার সবই গ্যেটে লাভ করেছিলেন তাঁর জীবনের মধ্যবয়সে। স্নেহময়ী পত্নী, একটি পুত্র ও একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। ঊনচল্লিশ বছর বয়সে তেইশ বছর বয়সের একটি সুন্দরী তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন এবং এরই গর্ভে তাঁর পুত্রের জন্ম হয়।

ছ-বছর পরে তিনি কবি শিলারের সঙ্গে পরিচিত হন। গ্যেটের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ আর শিলারের পঁয়ত্রিশ। গ্যেটে-শিলারের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যেন একটি উজ্জ্বল কবিতা—এমন কবিতা বুঝি তাঁদের দুজনের একজনও রচনা করতে পারেননি। কিন্তু গ্যেটে-শিলারের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এগারো বছর। তারপর যখন শিলারের মৃত্যু হল, তখন বন্ধুবিয়োগে ব্যথিতচিত্ত গ্যেটেকে তাঁর রুদ্ধদ্বার পাঠকক্ষের মধ্যে শিশুর মতো কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তিকে এক চিঠিতে গ্যেটে লিখেছিলেন : আমার জীবনের অর্ধেকটা চলে গেছে।

গ্যেটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি গ্যেটে স্বয়ং। তাঁর চরিত্র যেন একটি নিখুঁত শিল্পরচনা। প্রচণ্ডভাবে অসুখী হলেও তাঁর জীবন যেন সাফল্যের জয়স্তম্ভ। দীর্ঘ পরমায়ু তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। তাঁকে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। যারা তাঁর প্রিয় ছিল, একে একে তাঁদের সকলের মৃত্যু হয়—তাঁর বন্ধুজন, তাঁর ভগ্নী, স্ত্রী এবং অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্র—সকলেই তাঁর চোখের সামনে একে একে জীবনের পরপারে চলে

যায়। কিন্তু গ্যেটের জীবনস্রোত আগের মতোই প্রবাহিত হতে থাকে—জীবনের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি অমর সংগীতে রূপায়িত করেন।

'ফাউস্ট' গ্যেটের অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি। দশ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আত্মচরিতের পরেই এই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। 'ফাউস্ট' নাট্যকাব্যখানি তিনি সারাজীবন ধরেই রচনা করেছিলেন; এর প্রথম খণ্ড লিখতে সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর আর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে পঁচিশ বছর। বিরাশি বছর বয়সে, মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে, গ্যেটে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে 'ফাউস্ট' রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর মাথার চুলগুলো তখন সব শাদা হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'এই শাদা চুলগুলোর তলায় আছে এটনা'। অবশেষে একদিন সেই এটনার অগ্ন্যুদ্গার দেখা গেল—গ্যেটে 'ফাউস্ট' রচনা শেষ করলেন কম্পিত হস্তে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্যের পরেই পাশ্চাত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'ফাউস্ট'।

'ফাউস্ট' আসলে একটি রূপকাশ্রিত মহাকাব্য। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে যার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হয়েছে অথচ জীবনের সার্থকতা কোথায় তা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এমন অতৃপ্ত দিব্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অভিভূত অস্বাভাবিক প্রকৃতির একজন আধুনিক মানুষের জীবনের সত্য অন্বেষণের সংগ্রামের কথা এই কাব্যময় নাটকে রূপায়িত হয়েছে। পণ্ডিত ফাউস্ট এইরকম একজন মানুষের প্রতীক। গ্যেটে এই চরিত্রের আধারে একটি জ্ঞানী অথচ অস্বস্তিপূর্ণ সত্যানুসন্ধানী অথচ সংশয়াচ্ছন্ন আধুনিক মানব-নায়কের কল্পনা করেছেন। 'ফাউস্ট' চরিত্র গ্যেটের নিজ চরিত্রেরই প্রতিফলন, কিন্তু প্রতিচ্ছবি নয়। জার্মানজাতির অন্তরের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই অতুলনীয় নাট্যকাব্যে।

২২ মার্চ, ১৮৩২। তাঁর পাঠকক্ষের একখানি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন অসুস্থ বৃদ্ধ কবি। চিরবিশ্রাম লাভের প্রতীক্ষায় রয়েছেন গ্যেটে। সারা বাড়িখানি ঘিরে তখন বিরাজ করছিল একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কবি আপন মনে উচ্চারণ করলেন : 'আলো, আরো আলো'। এই কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাপিত হল গ্যেটের জীবনের আলো—অসীম অনন্ত নিস্তব্ধতার পথে উধাও হয়ে গেল তাঁর জীবনের সংগীত। পেছনে রয়ে গেল সেই সংগীতের অনুরণন যার মধ্যে আজো ঝংকৃত হয়ে চলেছে গ্যেটের সীমাহীন মানবপ্রীতি আর তাঁর হৃদয়ের বিশাল মানবতা।

ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি নন শুধু; একালে যাঁদেরকে পরিপূর্ণ অর্থে বিশ্বমানব বলে অভিহিত করা যেতে পারে তিনি তাঁদেরই একজন। বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাস্রোতে অবগাহন করে তিনি হয়েছিলেন সম্পন্ন মানুষ। বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্ন তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন মানবজাতিকে। আজ আমাদের অতিপরিচিত 'বিশ্বসাহিত্য' শব্দটিও তাঁরই সৃষ্টি।

হাস্যকৌতুক

১ম বন্ধু : তা তোর চাকরিটা হল না কেন, দোস্ত?

২য় বন্ধু : নিউমোনিয়ার জন্য।

১ম বন্ধু : ইন্টারভিউর সময় নিউমোনিয়া হয়েছিল বুঝি?

২য় বন্ধু : না, না, নিউমোনিয়া বানান করতে বলেছিল। আমি পারিনি, তাই।

সুকুমার রায়

রাজার অসুখ

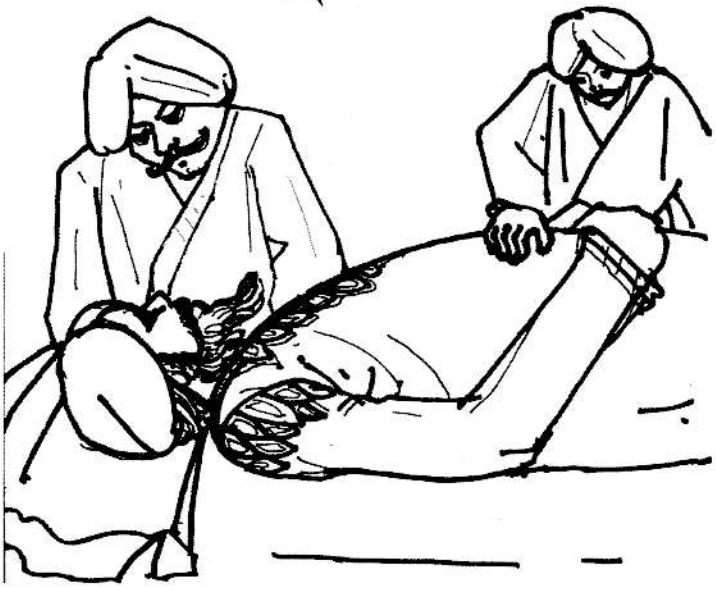

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে-দলে আসে আর দলে-দলে ফিরে যায়। অসুখটা যে কী তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজামশাই কেবলই বলেন : 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না। কত রকমের কত ওষুধ রাজামশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হল, কিন্তু অসুখের কোনো কিনারাই হল না।

তখন রাজামশাই গেলেন খেপে। তিনি বললেন : 'দূর করে দাও ওই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সবকিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।'

এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর-কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হল : তাই তো, শেষটায় কি রাজামশাই বিনাচিকিৎসায় মারা যাবেন?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল : 'অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমরা কি সেসব করতে পারবে?'

মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই বলল : 'কেন পারব না? খুব পারব। জান দিতে হয় জান দেব।'

তখন সন্ন্যাসী বলল : 'প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আনো যার মনে কোনো ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সবসময়ে সব অবস্থাতেই খুশি থাকে।'

সবাই বলল : 'তারপর?'

সন্ন্যাসী বলল : 'তারপর সেই লোকের গায়ের জামা যদি রাজামশাই একটা দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোশকে যদি এক রাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।'

সবাই শুনে বলল : 'এ তো চমৎকার কথা।'

তাড়াতাড়ি রাজামশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন : 'আরে, এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিলে কী? এইটা কারো মাথায় আসেনি? যাও, এখনি খোঁজ করে সেই হাসিঅলা লোকটার জামা আর তোশক নিয়ে এসো।'

চারদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় 'খোঁজ-খোঁজ' রব পড়ে গেল, কিন্তু সে-লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে : 'যার দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, সর্বদাই হাসিমুখ, সর্বদাই খুশি-মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না!' সবার মুখে একই কথা।

তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন : 'এদের দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।' এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে।

মন্ত্রী ভাবলেন : বাহ্, এই লোকটাকে তো বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে, ওর তো অনেক টাকাপয়সাও আছে দেখছি। তাঁহলে আর ওর দুঃখই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোশক চেয়ে নেওয়া যাক।

মন্ত্রীমশাই এইরকম ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা ভিখারি করেছে কী, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে। আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারিকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর তাই শুনে চারদিকের লোকেরা হো হো করে হাসছে। মানুষ যে এতরকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাশা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন : এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এই লোকটা কে হে?'

সে বলল : 'ও হচ্ছে গোবরা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোশমেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না।'

শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে আবার চললেন সেই লোকটির সন্ধানে। সারাদিন খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে-লোকের সন্ধান কোথাও মিলল না। এমনি করে দিনের-পর-দিন তিনি খোঁজ করেন আর দিনের-পর-দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলাগোছের বুড়োলোকের দেখা পেলেন।

লোকটার মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী বললেন : 'তুমি এত হাসছ কেন?'

সে বলল : 'হাসব না? পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে, গাছের পাতা সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এসব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে।'

মন্ত্রী বললেন : 'তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কি আর কোনো কাজকর্ম নেই?'

ফকির বলল : 'তা কেন থাকবে না? সকালবেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবার্তা এইসব তামাশা দেখে, আবার গাছতলায় এসে বসি। তারপর, যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমাই। কোনো ভাবনাচিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা!'

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন : 'যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কী করো?'

ফকির বলল : 'সেদিন তো কোনো ল্যাঠাই নেই। চুপচাপ পড়ে থাকি আর এইসব তামাশা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখোরে, গ্রাস তোলোরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে,—তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে, হাতমুখ মোছোরে। কত রকম কাণ্ড!'

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিকমতোন লোক পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন : 'তোমার গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পারো? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।'

শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল : 'আমার আবার জামা। এই সেদিন একটি লোক একটি শাল দিয়েছিল, তাও তো ছাই ভিখারিকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনোদিন।'

মন্ত্রী বললেন : 'তাহলে তো মহামুশকিল। যদিবা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোশকখানা দিতে পারো? কত দাম চাও বলো, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।'

এবারে ফকির হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ

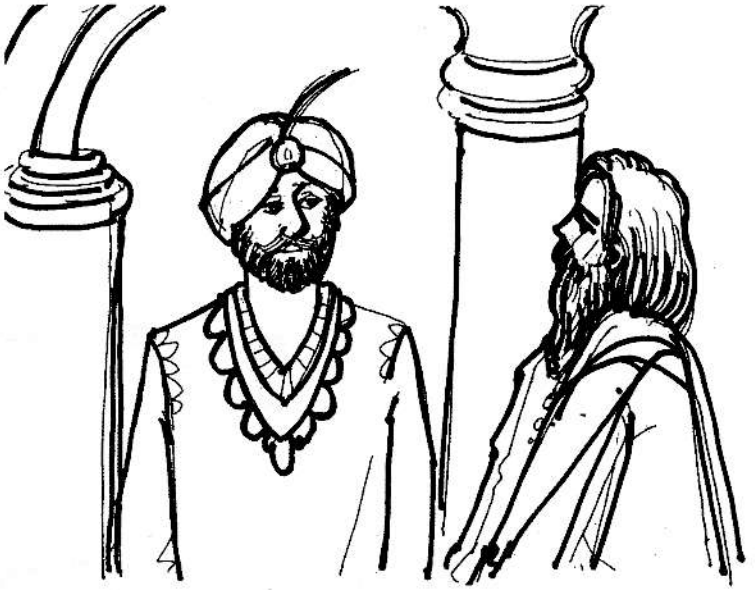

হেসে তারপর সে বলল : 'চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোশক আর গদি!'

মন্ত্রীমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন : 'জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল-বিছানাও সঙ্গে রাখো না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই?'

ফকির বলল : 'অসুখ আবার কী? অসুখ-টসুখ ওসব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।'

এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠ্যাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনলেন, শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল : এখন উপায় কী হবে? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফসকে।

সবাই বসে বসে এ-ওর মুখ চায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলে : 'নাহ্, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।'

ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন : 'আমি থাকি রাজার হালে, ভালো ভালো জিনিশ খাই, কোনোকিছুর অভাব নেই, লোকেরা সবসময়ে তোয়াজ করছেই—আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিচ্ছু নেই, জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়—সে কিনা বলে, অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?'

তার পরদিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্রমিত্র সবাইকে ডেকে বললেন : 'যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব, সভায় বস্‌গে যা। তোরা কেউ কিছু করতে পারলি না, এখন এই দ্যাখ্ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ-শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!'

আবেদ খান

তিন-এর খপ্পরে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট

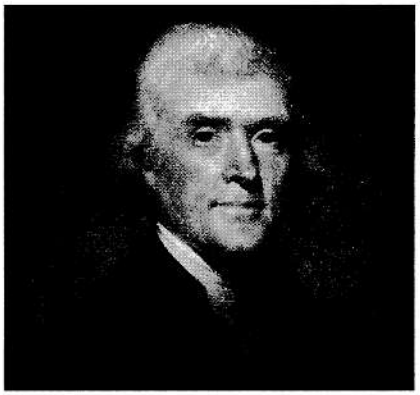

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্টের নাম জানো তোমরা? জানো নিশ্চয়, তবু আমিই বলে দিচ্ছি। তার নাম টমাস জেফারসন। তাঁর জীবনে তিন সংখ্যার প্রভাব ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। তোমরা একে একে মিলিয়ে নাও। টমাস জেফারসন ছিলেন আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, আর পিতামাতারও তৃতীয় সন্তান। তিনি তিনটি স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন, আর আমেরিকার স্বাধীনতার সনদও লিখেছিলেন ৩৩ বছর বয়সে। তিনি তৃতীয় কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ফ্রান্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জেফারসন ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনের মন্ত্রিপরিষদের তৃতীয় সদস্য এবং আমেরিকান দার্শনিক সমিতির তৃতীয় সভাপতি। ১৭৯৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেনও ঐ ৩ ভোটেই।

তিনি প্রধানত তিনটি জিনিস ঘৃণা করতেন : রাজাসংক্রান্ত বিষয়, কৌলিন্য এবং ধর্মান্ধতা। জীবনভর তিনি আরাধনাও করেছেন তিনটি শিল্পের : স্থাপত্য, অঙ্কনশিল্প এবং সঙ্গীত। নিজের সমাধিলিপিতে তিনটি জিনিস উল্লেখ থাকুক এটা তিনি চেয়েছিলেন। সেই তিনটি জিনিস হচ্ছে : স্বাধীনতার ঘোষণা, ভার্জিনিয়ার মূর্তি এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তার আদর্শও ছিল তিনটি : 'জীবন, মুক্তি এবং সুখের অন্বেষণ।' এই তিনটি আদর্শই তাঁকে আটলান্টিক সনদের ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

আর একটা কথা এখানে জেফারসন সম্পর্কে বলে রাখি। তাঁর মতো বহুমুখী প্রতিভার লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনোকালে জন্মগ্রহণ করেনি এবং করবেন কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। তিনি ছিলেন ৩৩ রকমের গুণের অধিকারী। এখানেও আবার সেই তিন সংখ্যার দৌরাত্ম্য। এবার মিলিয়ে নাও গুণগুলো। তিনি ছিলেন উদ্ভিদবিশারদ, সৈনিক, আইনজীবী, পর্যটক, শল্য-চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, কবি, অবিষ্কারক, রাজমিস্ত্রী, শিক্ষাবিদ, রসায়নবিদ, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রাণিবিদ্যাবিশারদ, প্রকৃতিবিদ, জীবাশ্মবিদ, ড্রাফট্‌সম্যান, শিল্পী, সার্ভেয়ার, অঙ্কবিশারদ, আবহাওয়া-বিজ্ঞানী, স্থপতি, ভাষাবিদ, চাকাওয়ালা গাড়ির নির্মাতা, সঙ্গীতজ্ঞ, কৃষিবিদ, ঘোড়সওয়ার, কূটনীতিবিদ, আইনকর্তা, মালী, পণ্ডিত, রাষ্ট্রনায়ক এবং ক্রীড়াবিদ।

তাঁর আবিষ্কৃত জিনিসগুলো হচ্ছে এক ধরনের লাঙ্গল, হাঁটার ছড়ি, ফোল্ডিং চেয়ার, পদব্রজে দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র, লেটার প্রেস, শণযন্ত্র প্রভৃতি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেগুলোর ব্যবহার চালু করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে অলিভ, চাল, মেরিনো ভেড়া, নাচুনে তারা, কোলকাতার শূকর এবং লিফ্‌ট।

আলফঁস দুদে

বালক-গোয়েন্দা

অনেকদিন আগেকার কথা।

প্যারি নগরীতে স্তেন নামে একটি ছেলে বাস করত। তার বয়েস তখন দশ কি বারো বছর হবে। রোগা-পটকা ছেলে। ফ্যাকাশে চেহারা। দেখে মনে হয়—রক্তশূন্যতায় ভুগছে। ছেলেটির মা ছিল না, বাপ ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। তখন তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু বৃদ্ধ হলে কী হবে, তাঁর চেহারা ছিল দশাসই। আর গোঁফজোড়া—এককথায় ভয়ঙ্কর! এহেন জাঁদরেল মানুষটি কিন্তু বড়ই সন্তানবৎসল ছিলেন। ছেলের কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে খুশিতে মন তাঁর ডগমগ করত। কোমল হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

জার্মানদের সঙ্গে ফরাসিদের যুদ্ধ চলছে তখন। জার্মানসৈন্যেরা প্যারি নগরী অবরোধ করে রেখেছে। সারাশহরে তখন চলছে অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

বৃদ্ধ সৈনিক মঁসিয়ে স্তেনের বাড়িসংলগ্ন ফলের বাগিচা তখন ফরাসিসৈন্যদের পেট্রোলের গুদামে পরিণত হয়েছে। প্যারি নগরীর স্কুল-কলেজ বন্ধ। পার্কে-পার্কে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ আর সাজ-সাজ রব।

জার্মানরা ফরাসিদের শত্রু।

শত্রুদের কথা উঠলেই মঁসিয়ে স্তেন গোঁফ বাঁকিয়ে এমন মুখভঙ্গি করেন যে তা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি জার্মানদের ঘৃণা করেন।

বড়দের কাছে যুদ্ধ আতঙ্কের বিষয় হলেও বালক স্তেন তাতে মজা পায়। স্কুল বন্ধ। কাজেই পড়াশোনাও শিকেয় উঠেছে। স্তেন তাই সারাদিন পথে-পথে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়। পার্কে গিয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখে, ব্যান্ডের বাজনা শোনে। কখনও বা ম্যাচ খেলা দেখতে যায়।

বাজি ধরে গ্যালোশ ম্যাচ খেলতে হলে অনেক টাকার দরকার হয়। বালক স্তেন অত টাকা পাবে কোথায়? সে তাই খেলা দেখে। তাতেই আনন্দ পায়।

নীল কোট-পরা একজন মোটা লোক খেলায় পাঁচটাকা করে বাজি ধরত। সে যখন দৌড়াত, তার পকেটের টাকাগুলো ঝনঝন করে বাজত। বালক স্তেন ভাবত—লোকটার কত টাকা! আহা, সে যদি ঐ মোটা লোকটার মতো বড়লোক হতে পারত, তাহলে কী মজাটাই না হত!

গভীর আগ্রহে স্তেন গ্যালোশ খেলা দেখছিল, এমন সময় একটি চকচকে টাকা গড়িয়ে এসে তার পায়ের গোড়ায় পড়ল। স্তেন যেই-না টাকাটি তুলে নিয়েছে, অমনি সেই মোটা লোকটি বলে উঠল : কী দেখছ খোকা অমন করে? প্রয়োজন থাকে তো বলো, গাদা-গাদা টাকা পাওয়ার উপায় বাতলে দিতে পারি।

স্তেন ভাবে—লোকটা ঠাট্টা করছে না তো? কিন্তু না, লোকটা সত্যিই তার কাছে এগিয়ে আসে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে বলে : আমার সঙ্গে যাবে, টাকা রোজগার করতে? চলো না, জার্মানদের ঘাঁটিতে গিয়ে কাগজ বিক্রি করে আসি। প্রতিবার যাওয়ার জন্যে ওরা তিরিশ টাকা করে পারিশ্রমিক দেবে। কেমন, রাজি তো?

এ-প্রস্তাবে স্তেন রেগে ওঠে। তার বাবা একজন স্বদেশপ্রেমিক সৈনিক। আর তাঁরই ছেলে হয়ে সে কিনা গুপ্তচরবৃত্তি করবে! না না, এ কখনোই হতে পারে না। রাগে, দুঃখে স্তেন পরের তিন-চারদিন আর খেলা দেখতে যায় না। বাড়িতেই বসে থাকে। কিন্তু মাঝে-মাঝে তার চোখের সামনে চকচকে টাকাগুলোর চোখ-ঝলসানো রূপ যেন ভেসে ওঠে। গ্যালোশ খেলার মাঠ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারে না স্তেন। আবার হাজির হয় খেলার মাঠে।

আবার সেই মোটা লোকটির খপ্পরে পড়ে। টাকার লোভ সামলাতে না-পেরে স্তেন মোটা লোকটির সেই আত্মঘাতী প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়।

পরদিন ভোরবেলা।

সূর্য ওঠার আগেই স্তেন বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। খবরের কাগজগুলো জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে মোটা লোকটির সঙ্গে রওনা হয়ে যায়। চলতে থাকে প্যারি-নগরীর সীমান্তের ওপারে জার্মানদের ঘাঁটি অভিমুখে।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই বন্দুকধারী এক ফরাসি প্রহরীর সম্মুখীন হয় তারা। তাকে দেখেই মোটা লোকটি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে থাকে : বাবা নেই আমার। মায়ের বড় অসুখ। ছোটভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে ওধারে মাঠের দিকে যাচ্ছি, যদি কিছু আলু কুড়িয়ে আনতে পারি, এই আশায়। দয়া করে যেতে দিন আমাদের।—এই বলে মোটা লোকটি কাঁদতে শুরু করে দেয়।

প্রহরী তার নিখুঁত অভিনয় ধরতে পারে না। দয়াপরবশ হয়ে তাদের ছেড়ে দেয়। দ্রুতপদে ওরা এগিয়ে চলে সমুখপানে।

প্যারি-নগরীর সীমানায় রেলপথ। রেলপথের ধারে গর্ত করে সেখানে ফরাসিসৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। তারা সেই সৈন্যদের সামনে গিয়ে পড়ল। মোটা লোকটা ঝানু অভিনেতা। আগের মতো সে একই কথা বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এখানকার অভিজ্ঞ মিলিটারি অফিসার অত সহজে ওদের ছাড়ল না। একের-পর-এক প্রশ্ন করে ওদের কথার সত্যতা যাচাই করতে লাগল।

এক বৃদ্ধ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব শুনে তিনিই ওদের ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করলেন। তরুণ মিলিটারি অফিসার বৃদ্ধ সার্জেন্টের ইচ্ছেয় বাধ সাধলেন না।

ওরা এবারে জার্মানসৈন্যদের ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছুল। স্তেন তখন কাঁপছে। শীতে নয়, লজ্জায় ও ভয়ে। একজন জার্মান সার্জেন্ট তাকে কাঁপতে দেখে আগুনের পাশে নিয়ে গিয়ে বসাল। বিস্কুট ও কফি খেতে দিল। মোটা লোকটি স্তেনকে নিজের ছোটভাই বলে পরিচয় দিল। তাতে করে স্তেনের

খাতির সেখানে আরও বেড়ে গেল।

সীমান্তের ওপারে ফরাসিসৈন্যদের কাছে ওরা শুনে এসেছিল যে, পরের দিন ফরাসিরা জার্মানদের অতর্কিতে আক্রমণ করবে। মোটা লোকটি সে-কথা শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিল। তাই-না শুনে জার্মান অফিসারেরা নিজেদের মধ্যে জার্মানভাষায় কীসব আলোচনা করতে লাগল। ইতিমধ্যে মোটা লোকটির নির্দেশে স্তেন তার জামার ভেতর থেকে খবরের কাগজের বান্ডিলটা বের করে সামনে রাখল। একজন জার্মানসৈন্য সেই বান্ডিলটা নিয়ে অন্যত্র সরে গেল। মোটা লোকটিকেও সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর মোটা লোকটি পকেটভর্তি টাকা নিয়ে সগর্বে ওদের ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এল। স্তেন নীরবে তার পিছু নিল। চলতে চলতে তার মনে হল—প্রবীণ এক জার্মান অফিসার তাকে যেন ডেকে বলছে : এ কী করলে...! লজ্জায়, ঘৃণায় স্তেন মুহূর্তের জন্যে সম্বিত হারাল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই মোটা লোকটির কথায় সে সম্বিত ফিরে পেল! 'স্তেন, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি নিজেদের এলাকায়। চলো, কিছু আলু কুড়িয়ে থলি বোঝাই করি।'

আলু কুড়িয়ে বিনাবাধায় ওরা ফরাসি এলাকা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দেখতে পেল—ফরাসিসৈন্যরা আক্রমণের জন্যে তখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। দলে-দলে ফরাসিসৈন্য এসে জমা হচ্ছে সীমান্তে—একটি প্রাচীরের পাশে।

সেই বৃদ্ধ ফরাসি সার্জেন্টের সঙ্গে ফিরবার পথেও ওদের দেখা হল। বৃদ্ধ ওদের পানে চেয়ে একটু হাসলেন। কিন্তু সে-হাসি স্তেনের বুকে যেন ছুরি বসিয়ে দিল। তার মনে হল, এখনই যদি সে চিৎকার করে জানিয়ে দিতে পারে যে, 'তোমরা জার্মানদের আক্রমণ কোরো না। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের এই গোপন খবর জানিয়ে দিয়ে এসেছি'—তাহলে মনটা হয়তো হালকা হয়। কিন্তু তারও কোনো উপায় নেই। ঘুণাক্ষরে এ-কথা প্রকাশ করলে তার সঙ্গী মোটা লোকটি তাকে গুলি করে মারবে। সেই ভয়ে স্তেন চুপ করে থাকল।

ওরা শহরের মধ্যে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে গিয়ে দুজনে টাকা সমানভাবে ভাগ করে নিল। চকচকে টাকাগুলো পেয়ে খুব খুশি হয় স্তেন। এবার সেও গ্যালোশ খেলতে পারবে ঐ টাকা দিয়ে। টাকা পেয়ে স্তেন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল যে, সে মস্তবড় একটা অপরাধ করেছে।

সঙ্গী মোটা লোকটি চলে গেল, স্তেন তখন একাই পথ চলতে লাগল। গন্তব্যস্থল—নিজের বাড়ি। যেতে-যেতে আবার তার মনের পরিবর্তন ঘটল। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে—এ-কথা মনে হতেই আত্মগ্লানিতে তার অন্তরাত্মা জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল। পথে লোক দেখে তার মনে হতে লাগল—সবাই বুঝি জেনে ফেলেছে তার গুপ্তচরবৃত্তির কথা। ঘৃণায় তারা বুঝি স্তেনের দিকে তাকাচ্ছে না।—এইসব ভাবতে-ভাবতে অবশেষে সে বাড়ি পৌঁছাল। বাড়িতে তার বুড়ো বাপ তখন ছিলেন না। স্তেন রুপোর টাকাগুলো তাড়াতাড়ি তার বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখল।

সন্ধ্যায় মঁসিয়ে স্তেন বাড়ি ফিরে এলেন খুশিমনে, দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকটি হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে ছেলেকে তিনি বলতে লাগলেন : জানিস বাছা, জার্মানদের হটিয়ে দেবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। তুই যদি বড় হতিস তাহলে আমাদের হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতিস। ঐ দ্যাখ্ খোকা, ঐ দুর্গেতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আজ এক বোঝাপড়ার দিন।

বালক স্তেনের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সে শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু চোখে তার ঘুম এল না। কানে ভেসে আসতে লাগল কামানের গর্জন। কল্পনায় তার চোখের ওপর ভেসে উঠল যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য। ফরাসিসৈন্যরা জার্মানদের আক্রমণ করতে গিয়ে দলে-দলে মার খাচ্ছে। কাতারে-কাতারে প্রাণ দিচ্ছে। সে ভাবতে লাগল—এতগুলো দেশভক্ত ফরাসি বীরের বিনিময়ে সে কী পেয়েছে? পেয়েছে সামান্য কিছু টাকা। হায় হায়, দেশপ্রেমিক পিতার পুত্র বলে সে এখন পরিচয়

দেবে কোন্ মুখে? সে যে দেশদ্রোহী—সবার ঘৃণার পাত্র! —দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল স্তেন। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

বৃদ্ধ পিতা এসে শুধালেন : কী হয়েছে বাছা?

স্তেন আর থাকতে পারল না।

হুমড়ি খেয়ে সে বাপের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। তার মাথার বালিশটি মাটিতে পড়ে গেল। বালিশের তলায় লুকিয়ে-রাখা টাকাগুলো ঝনঝন করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

উত্তেজনায় বৃদ্ধ সৈনিক গর্জে উঠলেন : এ কী স্তেন, তুমি টাকা চুরি করেছ?

বালক তখন সবিস্তারে তার গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনী বাপকে শোনাল। দোষ স্বীকার করে মনের ভার অনেকটা কমাল।

কঠোর হয়ে বৃদ্ধ সৈনিক ছেলের কথাগুলো শুনলেন। তারপর মুখ ঢেকে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সে-দৃশ্য দেখে বালক স্তেন অভিভূত হয়ে ডাকতে লাগল : বাবা, বাবা...।

বৃদ্ধ সে-ডাকে কোনো সাড়া না-দিয়ে টাকাগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন। তারপর টোটাভরা বন্দুকটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার সময় বলে গেলেন : যাই, এই টাকাগুলো ওদের ফেরত দিয়ে আসি। দেখতে দেখতে বৃদ্ধ সৈনিক মঁসিয়ে স্তেন ফরাসিসৈন্যদের মাঝে মিশে গেলেন। আর ফিরে এলেন না।

হাসান হাফিজ

তুলনা

ছোট এক ঘাসফুল এবং গোলাপ
পাশাপাশি একসাথে আছে বহুদিন,
ঘাসফুল ভালো করে চোখেই পড়ে না
গোলাপ বাহারি খুবই পাপড়ি রঙিন।
ঘাসফুল গোলাপের রঙ রূপ দেখে—
বলে 'তুমি অপরূপা ঠিক যেন রানী,
উপচানো সৌরভ মিষ্টিমধুর
মন উদাসীন করা, সে-কথা তো জানি।
সবাই আপন করে তোমাকেই চায়
রূপ গুণ সুবাসের কী তারিফ করে—
মালা, তোড়া, ফুলদানি কিংবা খোঁপায়
তোমাকে সাজিয়ে রাখে যত্নে আদরে।'
গোলাপের মুখ কালো, উত্তরে বলে :
'সত্যি বলেছ বটে কিন্তু কি জানো?
আমার জীবন খুবই অল্পদিনের
এতে সুখ নেই মোটে, সে-কথা কি মানো?
আমাকে যদি-বা কেউ না-ও ছেঁড়ে তবু
ঝরে আমি পড়বই জেনো নিশ্চয়,
বহুকাল বেঁচে-থাকা কত-না মজার
আমার কপালে সেটা ঘটবার নয়।
তুমি কী যে সুখে আছ, পাও না তা টের
তোমাকে ছেঁড়ে না কেউ বাঁচো বহুদিন—
একইভাবে ফুটে থাকো বাগানের কোলে
মরণ অবধি তুমি সতেজ, নবীন।'

[খ্যাতিমান হয়ে অল্পদিন বাঁচার চেয়ে সাধারণভাবে অনেকদিন বেঁচে থাকা সৌভাগ্যের ব্যাপার।]

এ. কে. বজলুল করিম

ইতিহাস কথা কও

অক্টোবর বিপ্লব

কেউ কেউ বলেন গণিতের সঙ্গে ইতিহাসের চিরন্তন বিরোধ। এ কথাটি ঠিক নয়। অক্টোবর বিপ্লবের কথাই ধর না কেন?

১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরে হয়েছিল এই মহান বিপ্লব। কিন্তু কেউ বলতে পারো কেন এই অক্টোবর বিপ্লব বছরের পর বছর পালিত হচ্ছে ৭ নভেম্বর? এর পেছনেও রয়েছে অঙ্কের এক যাদুকরী রহস্য!

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। কিন্তু জুলিয়ান ক্যালেন্ডার-এ বছরের মাপ ধরা হতো ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। প্রতি ৪ বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনের লীপ ইয়ার গণনা করে এ হিসাবটা ঠিক রাখা হত।

ওতে কিন্তু প্রায় ১১ মিনিটের তফাত রয়ে গেল। ঐ তফাতটুকু বাড়তে বাড়তে ১৫৮২ সাল নাগাদ ১০ দিন হয়ে দাঁড়াল। পোপ গ্রেগরীর আদেশে ঐ বছরের ৫ অক্টোবরকে ১৫ অক্টোবর গণনা করে রোমান ক্যাথলিক ক্যালেন্ডার সংশোধন করা গেল। ইংল্যান্ডে ছিল অ্যাংগলিকান চর্চ। তাঁরা মানল না পোপের এই ফরমান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৭৫২ সালে তারাও সংশোধন করে নিল নিজেদের ক্যালেন্ডার ১১ দিন বাড়িয়ে। কিন্তু রাশিয়া এই অগ্রগতির সাথে তাল না মিলিয়ে জুলিয়ান পদ্ধতিতেই চলছিল। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন ক্ষমতায় এসে আদেশ দিলেন ক্যালেন্ডার

চলবে গ্রেগরীর হিসেবে। কিন্তু ততদিনে তফাত বেড়ে গিয়ে ১৩ দিনে দাঁড়িয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব ঘটেছিল ২৫ অক্টোবর। লেনিনের আদেশে ১৩ দিন বাড়িয়ে সেটাই দাঁড়াল ৭ নভেম্বর।

পলাশীর যুদ্ধ

এবার এসো পলাশীর যুদ্ধে। এখানে কি নেই গণিতের খেলা? আছে বৈ কি! পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে, রোজ বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেদিন হিজরি তারিখ ছিল কত? এ বিষয়ে খুব কম লোকই খবর রাখে। একটু হিসাব কষলে দেখা যাবে যে সেদিন ছিল ৫ সাওয়াল, ১১৭০ হিজরির কাছাকাছি, মানে ঈদুল ফিতরের মাত্র কয়েক দিন পরে।

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জন্য একটি অতি পবিত্র দিন। ঐ দিনের পরেও উৎসব চলতে থাকে আরও কয়েক দিন। ঐ সময় মুসলমান মাত্রই মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি থেকে বিরত থাকে। এমন সময় সৈন্যরা মনমানসিকতায় যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত থাকে। ক্লাইভ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পরে ভাগীরথী অতিক্রম করে পলাশী প্রান্তরে এসে হানা গাড়ল।

বাকি ইতিহাস সকলেরই জানা! মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজকে পরাজয় মেনে নিতে হল; আর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য, চিরদিনের জন্য না হলেও, দু'শ বছরের জন্য অস্তমিত হল।

চাঁদে অবতরণ

বেশি দিনের কথা নয়। ঢাকা শহরেই ছিল দুই বন্ধু; দুজনাই ছিল দারুণ তার্কিক। দুজনাই বিজ্ঞান-ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা পড়ত। আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আনন্দ পেত। ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে মানুষ প্রথম অবতরণ করল চাঁদে। এই দিনটি ছিল মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা। যেদিন নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রাখল সে দিনটিকে জগৎময় Universal Holiday ঘোষণা করতে হবে : এ বিষয়ে তারা দুজনেই এক মত।

কিন্তু বাধ সাধল শেষে তারিখটা নিয়েই। প্রথম বন্ধু বলল, এটা হবে ২০ জুলাই; সমর্থনে সে দেখাল নিউজউইক, টাইম ও অন্যান্য আমেরিকান পত্রপত্রিকা। দ্বিতীয় বন্ধু বলল ওটা হবে ২১ জুলাই। সমর্থনে সে এ দেশের পত্রপত্রিকা হাজির করল। তারিখ নিয়ে দুজনার ভীষণ তর্ক। ঝগড়ার আর শেষ হয় না।

শেষে তারা প্রফেসরের শরণাপন্ন হল। প্রফেসর বললেন, তোমরা দুজনেই ঠিক বলছ, আবার দুজনেই ভুল করছ। যা পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকার জন্য ২০ জুলাই, সেটাই আবার পূর্ব গোলার্ধের এশিয়া, ইউরোপ ইত্যাদির জন্য ২১ জুলাই। অবশ্য মহাজাগতিক গণিতে ২০ জুলাই আর ২১ জুলাই'র মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই।

বাংলা সন

সম্রাট আকবর প্রজার মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রাজ্য শাসন করে গেছেন। কিন্তু এর উপরেও তিনি একটা কাজ করেছেন, যার জন্য তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেটা হচ্ছে বাংলা সনের প্রবর্তন। আকবরের আমলে এ দেশে প্রচলিত ছিল হিজরি সন। হিজরি বছর মোটামুটি ৩৫৪ দিনে। যার জন্য এ সন প্রতিবছরই ইংরেজি সন থেকে ১১ দিন পিছিয়ে পড়ে। মোটামুটি ১ মাস পিছিয়ে পড়ে প্রতি ৩ বছরে। ধরা যাক, রমজানের রোযা রেখেছি ভরা বর্ষায়, কিন্তু ৩ বছর পর দেখা যাবে রোজা রাখতে হচ্ছে দারুণ গ্রীষ্মে।

সবাই জানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে কৃষকের ঘরে ঘরে যথেষ্ট ধান, চাল। ঐ সময়টা খাজনা আদায় করা হয়, তবে বেজায় ঝকমারি। যেমন ধরো, ঠিক করে দেয়া হল, খাজনা আদায় হবে বসন্তকালে। তবে ৬ বছর পরে সময় গড়িয়ে দাঁড়াবে শীতকালে, ১২ বছর পরে হেমন্তকালে, ১৮ বছর পরে শরৎকাল।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ সালে (মোতাবেক ৯৬৩ হিজরি)। সম্রাট আদেশ দিলেন তখন থেকেই বছর চলবে সৌর সন হিসাবে অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে। এর ফলে ১১ দিন পিছিয়ে যাওয়া বন্ধ হল। এই ভাবেই জন্ম নিল বাংলা সন, যা এ দেশে এখনও চালু আছে।

যে সময় থেকে এ পরিবর্তন করা হয়েছে তখন ইংরেজি সাল ছিল ১৫৫৬; আর নতুন বাংলা সন ছিল ৯৬৩। এ দুয়ের মধ্যে ছিল ৫৯৩ বছরের ব্যবধান। লক্ষ্য করে দেখ, এখনও বাংলা এবং ইংরেজি সালে সেই ৫৯৩ বছরের ব্যবধান বজায় আছে।

হাস্যকৌতুক

একদিন সম্রাট প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা বীরবল, যুদ্ধের সময় কোন্ অস্ত্রটা সবচেয়ে কাজে লাগে বল তো?

বীরবল জবাব দিলেন : উপস্থিত বুদ্ধি, সম্রাট।

সম্রাট বললেন : আমাদের কাছে বহু সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাদের কাছে উপস্থিত বুদ্ধির দাম কতটুকু?

কিন্তু আমার বিশ্বাসই এই, সম্রাট। যুদ্ধের সময় উপস্থিত বুদ্ধিটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। আপনি বরং পরীক্ষা করে দেখুন।

বেশ, কালকেই পরীক্ষা করব।

পরদিন সম্রাট তাঁর রাজধানীর একটি সংকীর্ণ পথে এক দুর্ধর্ষ পাগলা হাতিকে ছেড়ে দিলেন, এবং বীরবলকে ডেকে বললেন : এই পথ দিয়ে তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে।

বীরবল তো ভয়ে তখনই আধমরা। কিন্তু সম্রাটের আদেশ, অমান্য করলেই তো গর্দানটি যাবে। উপায় নেই, এবার বুঝি সত্যিই পাগলা হাতির তলায় পৈতৃক প্রাণটা দিতে হল।

বীরবল সেই গলির মধ্যে ঢুকে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। ওদিক থেকে তখন সেই পাগলা হাতি ছুটে আসছে। উপায়! পালানো তো চলবে না, আর একটি মুহূর্ত,—ওই এসে পড়ল,—আর রক্ষা নেই—গেল, গেল—

হঠাৎ বীরবলের চোখে পড়ল গলির একপাশে শুয়ে আছে এক মস্ত কুকুর। চক্ষের পলকে ছুটে গিয়ে সেই কুকুরটার পেছনের পাদুটো হিঁচড়ে টেনে বীরবল তাকে ছুড়ে দিলেন হাতির শুঁড়ের উপর। কুকুরটা ছিটকে গিয়ে আঁকড়ে ধরল হাতির শুঁড়, এবং এমন কামড়ে দিল সেই শুঁড়ে যে, হাতিটা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

সেই সুযোগে বীরবল হাতির নজর এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সম্রাটের কানে উঠল এই সংবাদ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বীরবলের এই আত্মরক্ষা অতি বিস্ময়কর। পরাজিত সম্রাট বীরবলকে তাঁর সর্বপ্রধান পরামর্শদাতার আসনে বসালেন।

মোবারক হোসেন খান

হাসন রাজা

১২৬১ বাংলা সাল। পৌষ মাস। সুনামগঞ্জের লক্ষ্মীণশ্রী গ্রাম। ৭ পৌষের এক শুভলগ্নে জন্ম নিলেন হাসন রাজা। পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ও মা হুরমত জাহানের কোল আলো করে এল তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র-সন্তান দেওয়ান হাসন রেজা চৌধুরী।

তখন ইংরেজ আমল। দেশ পরাধীন। হাসন রাজার পিতা দেওয়ান আলী রেজা চৌধুরী ছিলেন জমিদার। তাঁদের পূর্বপুরুষদের পদবি ছিল দেওয়ান। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁরা এই উপাধি লাভ করেন। আলী রেজার আমল থেকেই তাঁরা 'দেওয়ান' উপাধি লিখতে শুরু করেন।

হাসন রাজা ছোটবেলা থেকে খুব দুরন্ত ছিলেন। সারাদিন হৈচৈ করতেন। কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়তেন। কখনো শিকারে যেতেন। তাঁর জীবন ছিল বন্ধনহীন। লাগামহীন। পড়াশোনা মোটেই করতেন না।

হাসন রাজা বড় হতে লাগলেন। বলগাহীনভাবেই তাঁর জীবন কাটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মারা গেলেন তাঁর বৈমাত্রেয় বড়ভাই দেওয়ান উবায়েদুর রেজা। তিনি রামপাশায় থাকতেন। মাঝেমধ্যে লক্ষ্মীণশ্রীতে আসতেন। বড়ভাইয়ের মৃত্যুতে বেশ আঘাত পেলেন হাসন রাজা। তারপর চল্লিশ দিনও যায়নি, মারা গেলেন তাঁর পিতা দেওয়ান আলী রেজা চৌধুরী।

হাসন রাজার এক নতুন জীবন শুরু হল। তিন লাখ বিঘা জমি। সে এক এলাহি কাণ্ড। জমিদারির মধ্যে ডুবে গেলেন হাসন রাজা। দুর্দান্ত বালক হাসন এক দুর্ধর্ষ জমিদারে পরিণত হলেন।

হাসন রাজা পাখি ভালোবাসতেন। কুড়া ছিল তাঁর প্রিয় পাখি। তাঁর হাতি ছিল। তিনি ঘোড়া পুষতেন। তাঁর দুটো প্রিয় ঘোড়ার নাম ছিল জং বাহাদুর আর চান্দমুশকি। তিনি নৌকাভ্রমণ ভালোবাসতেন। মোট কথা, তিনি বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠলেন। শৌখিনতার পেছনে তাঁর সময় কাটতে লাগল। আনন্দবিহারে সময় কাটানোই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি প্রজাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। অত্যাচারী নিষ্ঠুর রাজা হিশেবে চিহ্নিত হয়ে উঠলেন।

হাসন রাজা দাপটের সঙ্গে জমিদারি চালাতে লাগলেন। কিন্তু একদিন রাজাকে অন্যরকম দেখা গেল। তাঁর চোখেমুখে অস্থিরতা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। তাঁর প্রিয় কুড়াপাখিটি সবসময় খাঁচায় বদ্ধ থাকত। তিনি স্বপ্ন দেখলেন : আল্লাহ স্বয়ং কুড়াপাখির ছলে খাঁচায় বসে রয়েছেন। এ স্বপ্ন হাসন রাজাকে ভীষণ ব্যাকুল করে তুলল। তাঁর সকল চিন্তাভাবনা, প্রার্থনা, তপস্যা সবই বুঝি স্বপ্নে-দেখা খোদার মতোই তাঁর বন্দি হয়ে গেল। হাসন রাজা পথের দিশা খুঁজতে লাগলেন। এক বাউলের কথায় হাসন রাজা পথের নির্দেশ পেলেন।

হাসন রাজার মনের দুয়ার খুলে যেতে লাগল। তাঁর চরিত্রে এল সৌম্যভাব। বিলাসপ্রিয় জীবন তিনি ছেড়ে দিলেন। ভুলত্রুটিগুলো শুধরাতে শুরু করলেন। জমকালো পোশাক ছেড়ে দিলেন। শুধু বহির্জগতে নয়, তাঁর অন্তর্জগতেও এল এক বিরাট পরিবর্তন। এতদিনের রাজকীয় ঐতিহ্য তাঁর কাছে মাথা নত করল। বিষয়-আশয়ের প্রতি তিনি নিরাসক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের মধ্যে এল একধরনের উদাসীনতা, একধরনের বৈরাগ্য। সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেয়া হয়ে উঠল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। প্রিয় কুড়াপাখির তদারক করতেন। আর সকল কাজের উপরে ছিল গান-রচনা। তিনি আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হলেন। তাঁর সকল ধ্যানধারণা গান হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। সেই গানে তিনি সুরারোপ করতেন। গান রচনার ভেতর দিয়ে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ ঘটাতে লাগল। তাঁর অস্থির মনের কোণে বাসা বাঁধল একটা শান্ত-নিবিড় মন। একটা ঘর-পালানো মন। একটা বৈরাগী মন। আর তাঁর গানের ভেতর তিনি যে-বৈরাগ্যের কথা বলেছেন তা ছিল আল্লাহর প্রেমেরই পরিণতি।

হাসন রাজা ছিলেন গানের স্রষ্টা। সুরের স্রষ্টা। মরমী কবি। তিনি গানের ভেতর দিয়ে আল্লাহকে খুঁজেছেন। সৃষ্টিকর্তার দর্শনলাভের আকুলতা ফুটে উঠেছে তাঁর গানে। তিনি গানের ভেতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অদৃশ্য সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। হাসন রাজার গানের মধ্যেই এই উপলব্ধিকে খুঁজে পাওয়া যায় বলেই তাঁর গানগুলো মরমী গান। আর তাঁর চিন্তাভাবনা মরমী দর্শন।

গান রচনার সময় হাসন রাজা দীনদুনিয়া ভুলে যেতেন। নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকত না। তিনি যেন অন্য কোনো দুনিয়ায় চলে যেতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের মতোন নতুন গান রচিত হয়েছে ততক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। নতুন করে সুর দিতে শুরু করতেন। আর এভাবে কোনো গানের সুর দিতে দিনের-পর-দিন চলে যেত।

১৯২২ সাল। নভেম্বর মাস। বাংলা তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৯। হাসন রাজা মৃত্যুবরণ করলেন। এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন বাউল রাজা হাসন রাজা।

ভিনদেশী এক বীরবল : নাসিরুদ্দীন হোজ্জা

দিনের কাজকর্ম সেরে একদিন বিকেলে নাসিরুদ্দীন আপনমনে বাড়ি ফিরছিল। তার পেছনে আসছিল অপরিচিত আরেকটা লোক। কিছু বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সে লোকটা নাসিরুদ্দীনের মাথার পেছনে একটা চাঁটি মেরে বসল। বিস্মিত নাসিরুদ্দীন হোজ্জা তার দিকে কট্‌মট্‌ করে ফিরে চাইল। ফিরে চাইতেই লোকটা মাফ চেয়ে বলে উঠল : বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই। আমি মনে করেছিলাম আমার এক বন্ধু। বেয়াদবি মাফ করবেন ভাই সায়েব।

হোজ্জা কিন্তু তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। ভয়ানক রেগে সে লোকটিকে টানতে টানতে কাজীর কাছে নিয়ে হাজির করল।

এই লোকটি ছিল কাজীসাহেবের বন্ধু। কিন্তু তা হলে কী হবে, বিচার তাঁকে করতেই হবে। উভয় পক্ষের কথা শুনে তিনি লোকটিকে বললেন : গণ্যমান্য লোকের মাথায় চাঁটি মারা ভয়ানক অপরাধ। হোজ্জার এ মানহানির জন্যে তুমি তাকে এক আনা জরিমানা দেবে, এই তোমার সাজা। এরকম কাজ আর কখনো করবে না।

লোকটা পকেট হাতড়ে বলল : তা বেশ। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখছি একটা পয়সাও নেই। মেহেরবানি করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি গিয়ে বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসি। এই বলে লোকটি চলে গেল, হোজ্জা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক কাজীর কাছে বসে থাকবার পরেও লোকটি ফিরে এল না। হোজ্জা তখন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই কাজীর মাথায় মস্ত এক চাঁটি মেরে বলল : আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না কাজীসাহেব। গণ্যমান্য লোকের মাথায় চাঁটি মারার জরিমানা তো এক আনা। লোকটা পয়সা নিয়ে এলে তার ঐ এক আনা আপনি নিয়ে নেবেন। আমি যাই।

এই বলে সে চলতে আরম্ভ করল। কাজী সাহেব কী আর করবেন, চাঁটি খেয়ে অবাক হয়ে হোজ্জার দিকে চেয়ে রইলেন।

বিধর্মী

জ্যাক লন্ডন

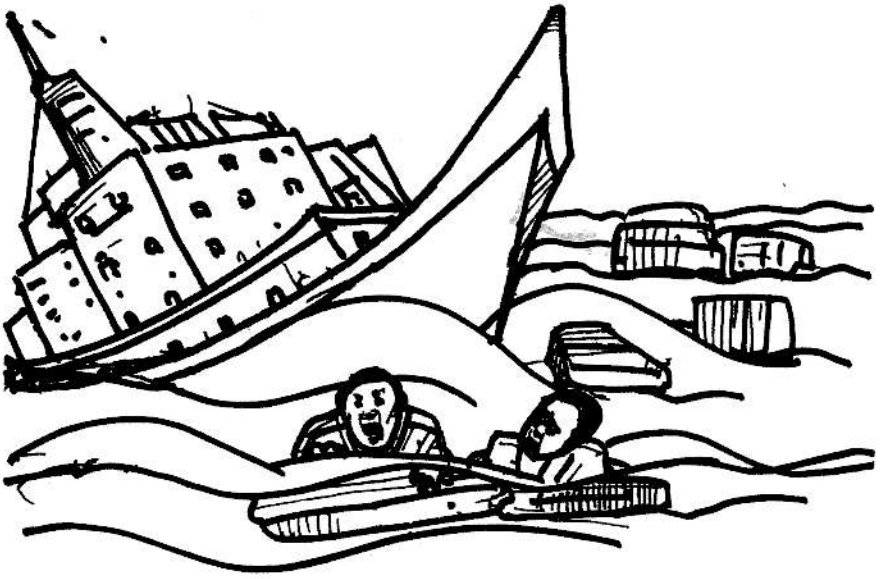

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। যদিও একই জাহাজে আমরা সেই ঝড় থেকে রেহাই পেয়েছিলাম,তবু প্রথম তার ওপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল দুই মাস্তুলঅলা জাহাজটি আমাদের পায়ের নিচে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর। জাহাজের ওপরে অন্যান্য কানাকা মাল্লার সঙ্গে আমি হয়তো তাকে দেখে থাকব কিন্তু 'পেটি জেন'-এর অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে তার কথা মনে করে রাখবার দরকার পড়ে নি। আট-দশজন কানাকা নাবিক, শ্বেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন, মেট এবং মালবাবু আর কেবিনের ছয়জন যাত্রী ছাড়াও পঁচাশি জনের মতো পমোতান আর তাহিতিয়ান নারী-পুরুষ-শিশু আরোহী নিয়ে 'পেটি জেন' রঙ্গিরোয়া থেকে যাত্রা করেছিল। এদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কারবারি বাক্স, শোবার মাদুর ছিল। কম্বল আর কাপড়চোপড়তো ছিলই।

পমোতায় মুক্তো সংগ্রহের মৌসুম শেষ হয়েছে। সবাই ফিরে যাচ্ছে তাহিতিতে। আমরা ছ'জন কেবিনযাত্রী মুক্তোর কারবারি—মুক্তোর ক্রেতা। আমাদের মধ্যে আছে দুজন আমেরিকান, আহ্‌চুন নামে একজন চীনা (এমন শ্বেতাঙ্গ চীনা আমি কখনো দেখি নি), একজন জার্মান, একজন পোলান্ডীয় ইহুদি আর আমি—সব মিলে একেবারে আধডজন।

এবারকার মৌসুমটা ছিল লাভজনক। কি আমরা, কি পঁচাশি জন ডেক আরোহী, কারোরই কোনো অভিযোগ নেই। সবাই ভালো কারবার করেছে। একটু বিশ্রাম নিতে জাহাজ থামবে পাপিতিতে। সেখানে কিছু সময় আনন্দে কাটানোর আশায় সবাই আগ্রহে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

বাস্তবিকই, জাহাজটি মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই করা হয়েছিল। 'পেটি জেন'-এর ক্ষমতা সত্তর টন।

কিন্তু তার ওপর যত লোক উঠেছে, সত্যি বলতে কি, তার দশ ভাগের এক ভাগ বহন করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। পাটাতনের নিচের জায়গাটা নারকেলের শুকনো শাঁস আর ঝিনুকে ঠাসাঠাসি করে বোঝাই করা, একতিল ফাঁক নেই। দোকানঘরটাও ঝিনুকেই ভর্তি। মাল্লারা যে কিভাবে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটাই ভাববার মতো। ডেকের ওপরে নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই। গরাদ ধরে ধরে অবলীলায় তাদেরকে ওঠানামা করতে হচ্ছে।

রাত্রিবেলা মাল্লারা ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপর দিয়েই হেঁটে গেছে। কী বলব, সেই ডেকের ওপর আবার শুয়োরছানা, মুরগির বাচ্চা আর সকরকন্দের বস্তাও রাখা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটা আপাত ফাঁকা জায়গায় ডাবের মালা আর কলার ছড়ি সাজিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের এবং প্রধান পালের টানার মধ্যে উভয় দিকেই নিচু করে অনেকগুলো দড়ি টাঙানো হয়েছে যাতে সামনে পালদণ্ড ঘুরতে বাধা না পায়। আর এই সব দড়ির প্রত্যেকটাতে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ ছড়ি করে কলা ঝুলছে।

আমাদের যাত্রাপথ নিরুপদ্রব নয় বলেই মনে হল, যদিও দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু বইলে আমরা দু-তিনদিনেই সে পথ অতিক্রম করতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ হল না। প্রথম পাঁচ ঘণ্টার পর দশ-বারোবার দমকা হাওয়া দিয়ে সেই বাণিজ্য বায়ু দূরে হারিয়ে গেল। তারপর একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল অবারিত প্রকৃতি। সমস্ত রাত এবং পরবর্তী সমস্ত দিন ধরে একটা গুমোট নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। এ সেই চোখ-ধাঁধানো স্বচ্ছ গুমোট প্রকৃতি—যার দিকে তাকানোর কথা ভাবলেই মাথা ধরে যায়।

দ্বিতীয় দিন একজন মারা গেল। ইস্টার দ্বীপের অধিবাসী ছিল লোকটা। সে মৌসুমের শ্রেষ্ঠ লেগুন-ডুবুরিদের একজন। জানতে পারলাম তার গুটিবসন্ত হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণাতেই এল না, আমাদের জাহাজে এই রোগটা কী করে আসতে পারে। কারণ, রঙ্গিরোয়া থেকে যখন আমরা যাত্রা করি তখন সেখানকার উপকূল অঞ্চলে এই রোগের কোনো প্রামাণ পাই নি। তবু সেই বসন্তেই একজন মরল এই জাহাজে এবং আরো তিনজন আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিয়েছে।

করার কিছুই ছিল না। না আমরা রোগীদেরকে আলাদা রাখতে পারছিলাম, না তাদের কোনো সেবা করতে পারছিলাম। সার্ডিন মাছের মতো গাদাগাদি করে আছি সবাই, ঐ অবস্থায় পচে মরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। প্রথম লোকটা মারা যাবার পর যে রাত এল সে রাতের পরেও আমরা কিছু করতে পারলাম না। সে রাতেই মেট, মালবাবু, সেই পোলান্ডীয় ইহুদি এবং চারজন দেশীয় ডুবুরি তিমি শিকারের বিরাট একটি ডিঙিতে করে সরে পড়ল। পরে তাদের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন অবশ্য অবশিষ্ট সব ডিঙ্গা ফুটো করে অকেজো করে দিল। ফলে আমরা সেখানেই রয়ে গেলাম।

পরের দিনই মারা গেল দুজন, তার পরদিন তিনজন, তারপর সেই সংখ্যা লাফিয়ে আটে উঠল। আমরা যে কীভাবে স্থির থাকতে পারলাম ভাবতে আশ্চর্য লাগে। নেটিভদের কথাই ধরা যাক; আতঙ্কে ওদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, বোবা হয়ে গিয়েছিল ওরা। জাহাজের ফরাসি ক্যাপ্টেন—নাম ওদোঁজে—ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল। অন্তত দুশো পাউন্ড ওজনের তার বিরাট মাংসল বপু, দেখতে দেখতেই তা সে থলথলে চর্বির একটি কম্পমান স্তূপে রূপান্তরিত হল।

সেই জার্মান ভদ্রলোক, আমি আর আমেরিকান দুজন মিলে সব কটা স্কচ-হুইস্কির বোতল কিনে এনে প্রচুর মদ খেতে লাগলাম। মাতাল হয়ে বাঁচার প্রয়াস! প্রয়াসটা সুন্দর—ভাবটা এমন আমরা যদি মদে ডুবে থাকতে পারি তাহলে প্রতিটি বসন্তের জীবাণু আমাদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে অঙ্গার হয়ে যাবে, এতে অবশ্য কাজও হল। অবশ্য ক্যাপ্টেন ওদোঁজে কিংবা আহ্‌চুন কেউই সে রোগে আক্রান্ত হয় নি। ফরাসি ক্যাপ্টেন তো মোটেই মদ খেত না, আর আহ্‌চুন সারাদিনে মাত্র একবার।

ঋতুটা সুন্দর। উত্তরায়নগামী সূর্য ঠিক মাথার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছাড়া কোনো হাওয়া নেই! পাঁচ মিনিট থেকে আধঘণ্টা স্থায়ী এই দমকা বাতাস তীব্রভাবে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয় এবং আমরা ভিজতে থাকি। তারপর আবার মেঘের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সূর্য বেরিয়ে আসে। প্রতিটা ঝটকার পরে প্রখর রৌদ্রের তাপে ভেজা পাটাতন থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ ওঠে।

ভাপটা অস্বস্তিকর। লক্ষ লক্ষ জীবাণুভর্তি মৃত্যুর দূত যেন। সেই ভাপ কোনো মুমূর্ষু কিংবা মৃতের লাশের ওপর দিয়ে উঠতে দেখলে আমরা আরেকবার বেশ করে পান করে নিই। তাছাড়া, যখনই ওরা জাহাজের চারদিকে জড়ো হওয়া হাঙরগুলোর মুখে লাশ ছুঁড়ে ফেলে তখনই পানের মাত্রা চড়িয়ে দেওয়াটা আমরা নিয়মসিদ্ধ করে নিয়েছি।

এমনিভাবে এক সপ্তাহ চলল। একসময় হুইস্কি ফুরিয়ে গেল। জিনিসটা সত্যিই ভালো ছিল, নইলে আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না। ওটাই আমার মতো একজন নির্জীব মানুষকে সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আসার উদ্যম দিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্যু অতিক্রম করে মাত্র দুজন লোকই শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সেই ছোট্ট কাহিনীটা বর্ণনা করলে কথাটা আপনিও মানবেন। দুজনের একজন সেই বিধর্মী। আমি যখন তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম তখন ক্যাপ্টেন ওদোঁজে ও-নামেই তাকে ডাকল। যাক, এবার আগের কথায় ফিরি।

সপ্তাহ শেষ। হুইস্কি ফুরিয়ে গেছে। মুক্তোর কারবারিরা নির্জীব হয়ে ঝিমোচ্ছে। আমি কেবিনের সরু করিডোরে ঝুলন্ত ব্যারোমিটারের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি। পমোতানে এর স্বাভাবিক স্থিতি ছিল ২৯.৯০তে। এরমধ্যে আমরা ২৯.৮৫ থেকে ৩০.০০ এমনকি ৩০.০৫-এর মধ্যে পারদের ওঠানামা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ২৯.৬২তে পারদ নেমে আসতে দেখলে স্কচ-হুইস্কিতে বসন্তের জীবাণু পুড়িয়ে-নেয়া সবচাইতে মাতাল ব্যক্তিরও মাথা ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। আমি তাই দেখলাম।

ক্যাপ্টেনর ওদোঁজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেদিকে। তাকে শুধু জানালাম ব্যাপারটা। সেও কয়েক ঘণ্টা ধরে পারদের নেমে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করল। অবশ্য করবার ছিল সামান্যই। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন সেই সামান্যটুকুই ভালোভাবে সমাধা করল। ছোট পালগুলো নামিয়ে ঝড়ের জন্যে সব পাল নিয়ন্ত্রিত মাপে গুটিয়ে আনল এবং 'লাইফ লাইন' হাতের কাছে ছড়িয়ে নিয়ে বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বাতাস আসার পরই ভুল করে বসল ক্যাপ্টেন। বাতাসের মুখে পালের ওপর নির্ভর করেই গতি ফিরিয়ে নিল। বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকলে এবং সরাসরি ঝড়ের মধ্যে না পড়লে সামনের বাধা অতিক্রমের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ফলবতী হত।

কিন্তু হাওয়ার বেগের ক্রমোন্নতি আর তার সঙ্গে তাল রেখে ব্যারোমিটারে পারদের ক্রমাবনতি আমাকে স্পষ্ট ধারণা দিল যে আমরা সরাসরি ঝড়ের মুখেই আছি। ক্যাপ্টেনকে বললাম : জাহাজ ঘুরিয়ে বাতাসের অনুকূলে চালিয়ে দাও; তারপর ব্যারোমিটারে পারদের নেমে আসা বন্ধ হয়ে গেলে ঢেউ কেটে রওনা হওয়া যাবে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিল এবং তর্ক করতে করতে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো খিঁচিয়ে উঠল, তবু তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়ল না একটুও। সব চাইতে দুঃখ পেলাম এজন্যে যে মুক্তোর কারবারিদের কাউকেই আমার সমর্থনে পেলাম না। আমি জানতাম তারা সন্দেহ করছে, আমি সমুদ্র আর সমুদ্রের পথঘাট সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানি কিনা? ঠিকই তো, একজন যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চেয়ে এ-ব্যাপারে বেশি জ্ঞান আমার কী করে থাকতে পারে?

বাতাসের বেগের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও ভয়ঙ্করভাবে ফুলে ফুলে উঠল। 'পেটি জেন' যেভাবে প্রথম তিনটি উত্তাল তরঙ্গ পেরিয়ে এসেছিল তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বাইচের ছোট্ট নৌকার মতো বিশাল জলরাশির আঘাতে প্রথমে সে ছিটকে গেল। প্রথম তরঙ্গের ধাক্কাটা তো তাকে একেবারে

ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। নারী আর শিশু, কলা আর ডাব, শূকরছানা আর বাক্স-পেটরা, রোগী আর মুমূর্ষু সব একসঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ফুঁসে ওঠা জলরাশিতে ভেসে গেল। 'লাইফ লাইনে'র সাহায্য নিতে পারল শুধু শক্তসমর্থ কজনা।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রবল দাপটে 'পেটি জেনে'র ডেক দুপাশের গরাদ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে গেল। পেছনটা ডুবে গেল জলের মধ্যে। সামনের গলুই উঁচিয়ে উঠল আকাশের দিকে। দুর্দশাগ্রস্ত জীবন আর মালপত্র সবই পেছন দিয়ে সমুদ্রে গড়াতে লাগল। এ যেন মানুষেরই একটা দলাপাকানো প্রপাত। কেউ সামনে মাথা দিয়ে, কেউ পা দিয়ে, কেউ আড়াআড়ি একের ওপর এক ঘুরপাক খেতে খেতে গড়িয়ে আসতে লাগল। যাঁতা খেতে খেতে, মোচড়াতে মোচড়াতে, হুমড়ি খেতে খেতে ওরা গড়াগড়ি খেল। বার বার তারা মুষ্টি করে চেপে ধরতে চাইল ঝুলন্ত রশি, কিন্তু শরীরের ওজনে তা শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

একজনকে দেখলাম উঠে এসে গুঁতো খেল খোলের শক্ত পাটাতনের খাঁজে—একসঙ্গে মাথায় আর কাঁধে। একটা ডিমের মতো ভেঙে গেল তার মাথাটা। ধাবমান তরঙ্গের রূপটা আমি দেখতে পেলাম! লাফিয়ে উঠে গেলাম কেবিনের ছাদে এবং সেখান থেকে মূল বাদামের মাস্তুলের খোলে। আহ্‌চুন এবং দুজন আমেরিকানের একজন আমাকে অনুসরণ করছিল কিন্তু আমি ওদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলাম। আমেরিকানটা একটা কুটোর মতো জাহাজের পেছন দিয়ে ভেসে গেল। আহ্‌চুন জাহাজ চালানোর চাকার একটি শিক ধরে ঝুলতে লাগল। কিন্তু সেখানে পেটি বাঁধা একজন বারোটাঙ্গার মেয়েমানুষ (চলতি ভাষায় এদের 'ওয়াহিন' বলে)—ওজনে অন্তত আড়াইশো পাউন্ড হবে—আহ্‌চুনের মুখোমুখি হয়ে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল হালের কানাকা নাবিককে।

লাশ আর তরঙ্গের প্রবল স্রোত কেবিন আর গরাদের মধ্যবর্তী মাল নামানোর ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ স্রোতের গতি খোলের দিকে ঘুরে গেল। 'ওয়াহিন', আহ্‌চুন আর সেই হালের মাল্লা—সব একসঙ্গে ভেসে গেল সমুদ্রে। আমি নিশ্চিত দেখলাম গরাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাবার সময় আহ্‌চুন আমার দিকে হতাশ দার্শনিকের মতো তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল।

তৃতীয় তরঙ্গ—তিনটের মধ্যে বৃহত্তম সে তরঙ্গ; অবশ্য আমাদের আর বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারল না। যখন ঢেউটা এল তখন সবাই মৃত্যুর কথাই ভাবছে। ডেকের ওপর প্রায় ডজনখানেক অর্ধনিমগ্ন, অর্ধচেতন মানুষ খাবি খেতে খেতে গড়াচ্ছে কিংবা বুকে হেঁটে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অবশিষ্ট নৌকা দুটোর ভগ্নাবশেষের মতোই তারা খোলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল। অন্যান্য মুক্তো কারবারিদের সঙ্গে আমি ঢেউ আসার বিরতিতে পনেরজনের মতো নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে কেবিনে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা তাদের কোনো উপকারেই লাগল না।

আর বাতাস? বাতাস যে এত বেগে বইতে পারে আমার সব অভিজ্ঞতা একসঙ্গে করেও তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এর কোনো বর্ণনা দেয়া যায় না। নিশীথ রাত্রির দুঃস্বপ্নকে কি কেউ বর্ণনা করতে পারে? ঝড়টাও ছিল তেমনি দুঃস্বপ্নের মতো। সে বাতাস আমাদের শরীর থেকে সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে গেল। আমি বলি না এসব বিশ্বাস করুন; আমি যা দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম তাই শুধু বলছি। মাঝে মাঝে আমিও এখন সে সব কিছু বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। তবু আমি তার মধ্যে পড়েছিলাম এবং এটাই আসল কথা। সে বাতাসের মুখোমুখি পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না। সে যেন এক মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব। তবে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল এই যে, সে বাতাসের বেগ বেড়ে গেল এবং এবং ক্রমাগত বাড়তেই লাগল।

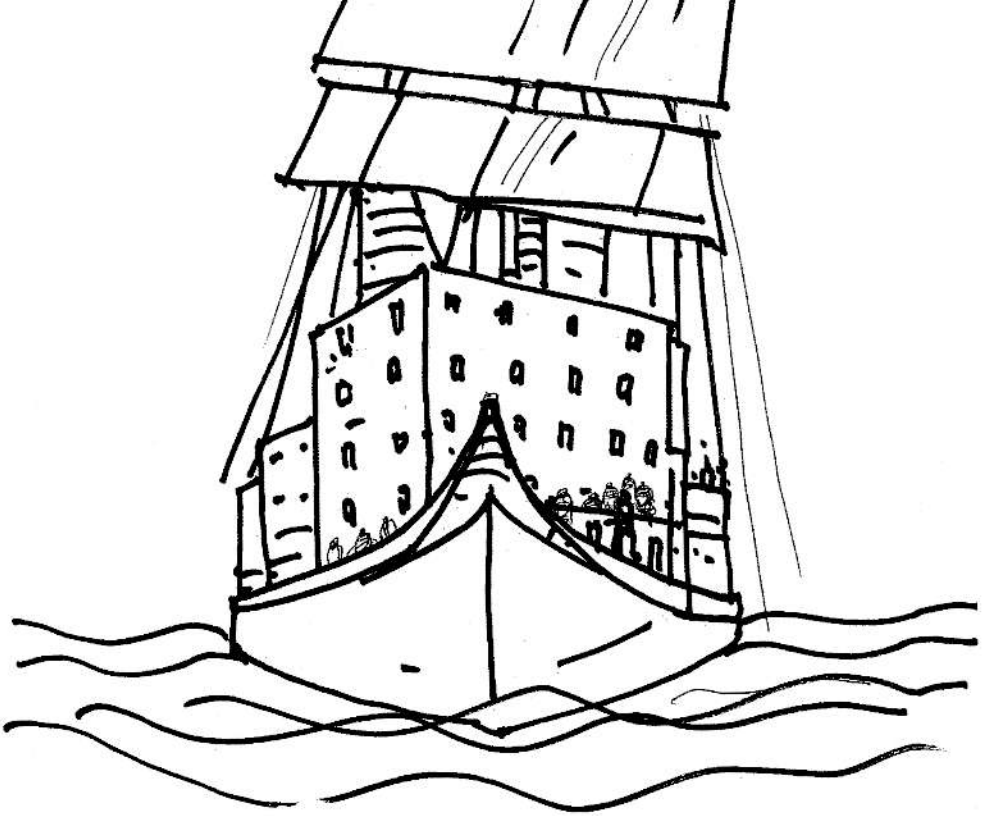

ধরুন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন বালু এবং সেই বালু ঘণ্টায় নব্বই, একশো, একশো কুড়ি মাইল কিংবা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি বেগে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়ে চলেছে। আরো মনে করুন সে বালু অদৃশ্য, সূক্ষ্ম কিন্তু তাতে বালুর স্বাভাবিক ভার ও ঘনত্ব বিদ্যমান। এই সমস্ত কিছু ভাবুন, তাহলেও হয়ত সেই বাতাসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারবেন।

হয়ত বালু দিয়ে তার সঠিক উপমা দেওয়া গেল না। মনে করুন, কাদা—অদৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম কিন্তু কাদার মতোই ভারী কিছু। না, এ তার চেয়েও বেশি। মনে করুন, বায়ুর প্রতিটি পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে সে কাদার স্তূপ। এখন ভাবুন সেই কাদার স্তূপের ঘনত্বের বিপুল চাপ কেমন হতে পারে। না, এ আমার কল্পনার বাইরে। ভাষার সাহায্যে জীবনের সাধারণ অবস্থা হয়তো ব্যক্ত করা যায়, কিন্তু সেই ভয়াবহ ঝড়ের প্রবল বেগের কথা কোনোভাবেই ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে না।

তবে শুধু একটু বলব—যে সমুদ্রতরঙ্গ প্রথমে স্ফীত হয়ে ফুঁসে উঠেছিল, ঝড়ের হাওয়ার আঘাত তার মাথা নামিয়ে নিল। আরো মনে হল, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তকে সমগ্র জলরাশি শুষে নিয়ে বাতাসের জায়গা দখল করতে যেন শূন্যে ছুঁড়ে মারছে।

আমাদের পালের ক্যানভাস অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'পেটি জেন' জাহাজে ক্যাপ্টেন ওদোঁজের একটা অদ্ভুত নোঙর ছিল। সাউথ সির জাহাজগুলোতে আমি এ ধরনের নোঙ্গর কোনোদিন দেখি নি। ত্রিকোণ একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। মুখে বিরাট একটা লোহার বালা লাগানো—তাতে লাগাম-মুখটা সব সময় খোলা থাকে। সেই নোঙরের সঙ্গে ঘুড়ির মতো লাগাম বাঁধা—যাতে সহজেই সেটা জল কেটে যেতে পারে, ঝুড়ি যেমন করে বাতাস কেটে আকাশে ওঠে তেমনিভাবে। অবশ্য এই কেটে চলার একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। জাহাজের সঙ্গে একটা লম্বা দড়িতে বাঁধা নোঙরটা সমুদ্রতলের একটু নিচে খাড়া হয়ে থাকত। ফলে সেই ঝড়ের তরঙ্গের মুখে 'পেটি জেন' গলুই উঁচিয়ে চলতে লাগল।

ঝড়ের মুখে না পড়লে আমাদের কিছুই হত না। ঝড় আমাদের পালের ক্যানভাসগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গেল, মাস্তুলগুলোর মাথা থর থর করে কাঁপিয়ে জাহাজ চালানোর যন্ত্রটার সঙ্গে রীতিমতো খেলা শুরু করে দিল। তবু আমরা হয়তো ভালোভাবেই আসতে পারতাম কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু এগিয়ে এসে আমাদের বোধহয় চারদিক থেকে বেঁধে ফেলল। আমি যেন খেই হারিয়ে ফেললাম। পঙ্গুর মতো নিঃসাড় হয়ে পড়লাম আমি, বাতাসের বেগ আর চাপ অনুভবের সব ক্ষমতা চলে গেল। মনে পড়ে সেই আবর্ত থেকে যখন চূড়ান্ত আঘাত এসে লাগল তখন আমি সব আশা ছেড়ে দিয়ে মরতেই চলেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধাক্কাটা এল অন্যভাবে। টের পেলাম একটা দম আটকানো থমথমে ভাব। অনুভব করলাম আমাদের চারপাশে, নিশ্বাস নেবার মতোও হাওয়া যেন নেই কোথাও। ফলে মড়ার মতো পড়ে থাকা ছাড়া উপায় রইল না।

সেই ভয়ঙ্কর চাপের মধ্য থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করলাম। তারপর হঠাৎ একসময় বাতাসের চাপ কমে গেল। মনে আছে তখন কি দেহ বিস্তার করে চারদিকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল আমার। মনে হল আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করেছে, মুহূর্তের অবকাশে অবাধ্য গতিতে উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। কিন্তু এমন অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না। আমাদের ওপর তখন ধ্বংস নেমে আসছে।

বাতাসে চাপ না থাকায় সমুদ্রের জল ফুলে উঠল। লাফাতে লাগল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এগিয়ে এল। ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের জলরাশি যেন উড়ে যেতে চায় আকাশের মেঘের কাছে। জলের বালতির তলা থেকে কর্ক ছেড়ে দিলে যেমন ছিটকে ওঠে তেমনি ছিটকে উঠছে ঢেউগুলো। কোনো নিয়ম নেই, কোনো স্থিতি নেই সেই ফাঁকা, উন্মুক্ত সমুদ্রতরঙ্গের। কমপক্ষে আশি ফুট উঁচু হয়ে আসছে। এ যেন তরঙ্গই নয়। মানুষের দেখা কোনো তরঙ্গের মতোই নয়।

এক-একটি ঢেউ যেন এক-একটি জলের কিংবা কাদার আছড়ে পড়া স্তূপ। হ্যাঁ, বিশাল স্তূপ—আশি ফুট উঁচু। আশি! না, তারও বেশি হবে। আমাদের মাস্তুলের চেয়েও উঁচু। ক্ষিপ্রগতি, বিস্ফোরক, প্রমত্ত। যখন খুশি তখনই ঊর্ধ্বে উঠে যেখানে খুশি সেখানে ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ছে। পরস্পরকে আঘাত করছে। দুটি ঢেউ প্রবল বেগে পরস্পরের দিকে ছুটে এসে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে কিংবা সংঘর্ষের পর সহস্র প্রপাতের মতো দুদিকে ছিটকে পড়ছে।

সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মহাসমুদ্রকে কল্পনা করাও কঠিন। এ যেন একটা ভ্রান্তি, বার বার মনকে বিভ্রমে ফেলে। এ যেন এক ঘোর অরাজকতা, এ যেন নরকের অতলস্পর্শ গহ্বরে উন্মত্ত সমুদ্রের বিপুল বিক্ষোভ!

আর সেই 'পেটি জেন' জাহাজ? আমি বলতে পারব না। পরে সেই বিধর্মী বলেছিল, সেও জানে না 'পেটি জেনে'র কথা। হয়তো ভেঙে গেছে। খুলে পড়েছে তার সারা শরীর। হয়তো কোনো ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আঘাত খেয়েছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে তখন প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছি। একরকম ডুবেই গিয়েছিলাম আমি। এ অবস্থায় যে কী করে রক্ষা পেলাম মনে করতে পারছি না। তবে আমার মনে আছে, যখন নিজের চোখে 'পেটি জেন'কে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম তখন আমার ভেতর থেকে সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা করতে বিলম্ব করলাম না কিন্তু তাতে কোনো আশার আলো দেখলাম না। আবার বাতাস বইতে শুরু করল। ঢেউগুলোকে তখন ছোট আর নিয়ন্ত্রিত মনে হল। আমি বোধহয় তখন সেই কেন্দ্র পার হয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশত আশপাশে কোনো হাঙর ছিল না। যে হিংস্র অতৃপ্ত দস্যুর দল আমাদের মৃত্যুতরীটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল আর লাশগুলো দিয়ে রসনা নিবৃত্ত করছিল, প্রবল পরাক্রান্ত সেই ঝড় এসে ছিন্নছিন্ন করে

তাদেরও কোথাও অদৃশ্য করে দিয়েছে।

ঠিক দুপুরের দিকে 'পেটি জেন' ধ্বংস হল। তার প্রায় দু'ঘণ্টা পর আমি ভাসতে ভাসতে তার পাটাতনের একটা কাঠ ধরতে সক্ষম হলাম। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তখন। কাঠটাকে দুহাতে চেপে ধরে আছি কোনোমতে। যে কোনো মুহূর্তে ফসকে যাবার সম্ভাবনা। লেজের মতো এক টুকরো দড়ি আটকানো ছিল কাঠটাতে। বুঝতে পারলাম এভাবে একদিন অন্তত বেঁচে থাকতে পারব, অবশ্য এর মধ্যে যদি হাঙর এসে না পড়ে। ঘণ্টা তিনেক কিংবা তারও একটু পর, আমি যখন কাঠটাকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছি এবং শেষ পর্যন্ত চলবার শক্তি অর্জনের জন্যে চোখ বুঁজে প্রাণপণে শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করছি আর মাঝে মাঝে নিশ্বাস বন্ধও করছি যাতে বেশি করে নিশ্বাস নিতে গিয়ে গভীর জলে ডুবে না মরি, তখন মনে হল আমি যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাস এবং সমুদ্র দুই-ই শান্ত। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার থেকে বিশ ফুটেরও কম দূরে আরেকটা কাঠের টুকরোয় ভাসছে ক্যাপ্টেন ওদোঁজে আর সেই বিধর্মী। কাঠটাকে পুরোপুরি দখল করার জন্যে দুজনেই যুদ্ধ করছে, বিশেষ করে ফরাসিটা তো রীতিমতো হাতপা ছুঁড়তে শুরু করেছে।

'এই কালো কুত্তা!' ফরাসি ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠেই কানাকার মুখে মারল এক লাথি। ওদোঁজের গায়ে কিছুই ছিল না, শুধু পায়ে একজোড়া জুড়ো, তাও ভারী ব্রোজান। বিধর্মীটার মুখে সেই ব্রোজানের লাথি খুব জোরেই লেগেছিল। একসঙ্গে মুখে এবং চিবুকে আঘাত পেয়ে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমি চাচ্ছিলাম বিধর্মীটা এর প্রতিশোধ নিক। কিন্তু ইতোমধ্যেই সে শান্তভাবে সাঁতরিয়ে দশ ফুট ব্যবধানে চলে গেছে। যখনই সমুদ্রের ঢেউ তাকে কাছে ঠেলে আনে তখনই ফরাসিটা কাঠটাকে শক্ত করে চেপে ধরে জোড়া পায়ে কানাকাকে লাথি মারতে থাকে। প্রতিবার লাথি মারবার সময় সে মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে—'বেটা বিধর্মী, কালো ভূত!'

'এই সাদা জানোয়ার, মুহূর্তের মধ্যে ওখানে গিয়ে আমি তোমাকে ডুবিয়ে মারতে পারি শয়তান!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ও পর্যন্ত গেলাম না, তার একমাত্র কারণ আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। সাঁতরানোর কথা মনে হতেই মাথা ঘুরে উঠছিল। তাই কানাকাকেই নিজের কাছে ডেকে এনে আমারই কাঠের একটা অংশ ওকে ছেড়ে দিলাম। ওর নাম ওটু। আমাকে বলার সময় উচ্চারণ করল : ও-টু-উ। নিজের আরো পরিচয় দিয়ে বলল যে সে সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের সর্বপশ্চিমে অবস্থিত বোরাবোরার অধিবাসী। পরে শুনলাম যে সে-ই আগে কাঠটা ধরেছিল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে নিজেই ক্যাপ্টেন ওদোঁজেকে একটা অংশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওদোঁজে তাকেই লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে।

এমনিভাবে ওটু আর আমি একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সে যোদ্ধা ছিল না, যোদ্ধার কোনো গুণই তার মধ্যে আমি দেখতে পাই নি। বড় মিষ্টি, বড় নম্র স্বভাবের লোক ছিল ওটু। ভালোবাসার একটি সার্থক প্রতিমূর্তি সে অথচ লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। একজন রোমান সৈনিকের মতোই সুঠাম তার দেহ। অবশ্য যোদ্ধা না হলেও সে কাপুরুষ ছিল না কোনো কালেই। সিংহের মতো বলিষ্ঠ তার মন। পরবর্তীকালে সে এমন মারাত্মক মারাত্মক কাজ করেছে যা করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। সে যোদ্ধা ছিল না, সব সময় হাঙ্গামাও এড়িয়ে চলত। কিন্তু আমি দেখেছি বিপদ এলে সে কখনো পিছু হটত না। তখন আমরা 'ওয়্যার শোল' জাহাজে। ওটু একদিন তুমুল লড়াই বাধিয়ে বসল। আমি কোনোদিন ভুলব না বিল কিংকে কী মারটাই না সে দিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল জার্মানদের সামোয়া দ্বীপে। আমেরিকান নৌবাহিনীতে বিল কিং ছিল শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। পশুর মতো হিংস্র বিপুলকায় একটা মানুষ যেন একটা আস্ত গরিলা। সব সময় হুড়োমি, রূঢ় ব্যবহার আর মাঝে

মাঝে কায়দামাফিক আঁতেঘাতে ঘুষি মারা তার স্বভাব। সে-ই প্রথম হাঙ্গামা শুরু করল। ওটুকে পরপর দুবার লাথি মেরে ফেলে দিল। তার সাথে লড়বার প্রয়োজন বোধ করবার আগে আরেকবার সে ওটুকে আঘাত করল। বোধহয় ওদের লড়াই চার মিনিটও টিকল না। এর মধ্যেই বিল কিং-এর বুকের চারটা পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে, একটা হাত ভেঙেছে, কাঁধের ওপর একটা হাড় খুলে গেছে। ওটু মুষ্টিযুদ্ধের কোনো বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি জানত না। সে জানত শুধু কী করে লোক শায়েস্তা করতে হয়। তাতেই এপিয়া সৈকতে বিল কিংকে এমন শায়েস্তা করেছিল যে সুস্থ হয়ে উঠতে তার তিন মাস সময় লেগেছিল।

কিন্তু আমি যেন আমার গল্পের আগে আগে চলছি। আমরা দুজনে কাঠটা ভাগাভাগি করে নিলাম। মাঝে মাঝে আমরা পালা বদল করে একজন চুপ করে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিই আর একজন গলা পর্যন্ত জলে ডুবে থেকে শুধু হাত দিয়ে ঠেলতে থাকি কাঠটা। দুইদিন দুই রাত্রি ধরে বহু কষ্টে পালা করে করে কখনো জলে ডুবে, কখনো কাঠে শুয়ে আমরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। শেষের দিকে আমি একরকম ভুল বকতেই শুরু করলাম। মাঝে মাঝে শুনতাম ওটুও তার মাতৃভাষায় বিড়বিড় করে কী সব বকছে। সারাক্ষণ জলে থেকে থেকে সারা শরীর একেবারে শিথিল-সিক্ত হয়ে পড়েছিল বলে তীব্র পিপাসাতেও আমরা কাহিল হই নি। জিভে সমুদ্রের লোনা জলের স্বাদ আর পিঠে সূর্যের রোদ মিলে যেন এক বিচিত্র অনুভবের আবর্তে ডুবে ছিলাম।

অবশেষে ওটুই আমার জীবন রক্ষা করেছে। সমুদ্র থেকে বিশ ফুট দূরে এসে নারকেল গাছের দুটি পাতার ছায়ায় সৈকতের বালুর ওপরেই আমি শুয়ে পড়লাম। ওটু ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার পাশে। সে-ই আমাকে ধরে এনে এখানে শুইয়ে দিয়েছে। গাছের পাতা পেড়ে এনে প্রখর রোদ আড়াল করে দিয়েছে। ওটু আমার পাশেই শুয়েছিল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম, আমার চারপাশে এক শীতল রাত্রি বিরাজমান। আকাশে অসংখ্য তারাভরা সুন্দর শীতল রাত্রি।

তাকাতেই দেখি ওটু একটা ডাব কেটে আমার ঠোঁটের কাছে ধরে আছে।

'পেটি জেন' জাহাজের আমরা দুজনেই কেবল বেঁচেছি। কাপ্টেন ওদোঁজে হয়তো এতক্ষণে সমুদ্রের সাথে সংগ্রাম করতে করতে চিরকালের জন্যে শান্ত হয়ে পড়েছে। কদিন পর দেখলাম তীরের কাছ দিয়ে তার কাঠটা একা একা ভেসে যাচ্ছে। আমি আর ওটু এক সপ্তাহ সেই প্রবালদ্বীপে নেটিভদের সঙ্গে থাকলাম। তারপর এক ফরাসি ক্রুজার আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে তাহিতিতে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যেই আমরা নাম বদলের পর্বটা শেষ করে ফেলেছিলাম। সাউথ সি অঞ্চলে এমনি নাম বদলের পর্ব দুটি মানুষকে রক্তের সম্বন্ধের চেয়েও বেশি ভ্রাতৃত্ববোধে আপন করে তোলে। উদ্যোগটা আমিই নিয়েছিলাম। আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব শুনে ওটু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠল।

'চমৎকার হল।' তাহিতির ভাষায় সে বলল, 'আমরা দুই দিন একসঙ্গে মৃত্যুর মুখে বন্ধু হয়েই তো ছিলাম।' 'কিন্তু মৃত্যু আমাদের কাছে হেরে গেছে।' আমি হেসে বললাম।

'তুমি একটা সাহসিকতার কাজই করেছ বটে, মাস্টার,' সে উত্তর দিল, 'তাই মৃত্যু আর কিছু করতে সাহস পেল না।'

'তুমি আমাকে মাস্টার বলে ডাকলে কেন?' আমি ব্যথিত হয়েছি এভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা তো নাম বদল করেছি। তোমার কাছে আমি ওটু আর আমার কাছে তুমি চার্লি। তোমার ও আমার মধ্যে চিরকালের জন্যে তুমি হবে চার্লি আর আমি ওটু হয়ে রইব। এই তো আমাদের জীবনের রীতি। তারপর আমরা যেদিন মরে যাব—মৃত্যুর পর আবার যদি এমন হয় যে আমরা ওই তারা আর আকাশের পারে কোনোখানে জীবন ফিরে পাই, তাহলে সেদিনও তুমি আমার কাছে চার্লি আর আমি তোমার কাছে ওটু হয়েই থাকব।'

'ঠিক বলেছ, মাস্টার, তুমি ঠিক বলেছ।' আনন্দে তার চোখ দুটো চক চক করে উঠল। 'আবার সেই সম্বোধন?' আমি রেগে উঠে বললাম।

'তাতে কী আছে!' সে বলে চলল, 'ওগুলো তো কেবল আমার মুখের কথা, কিন্তু আমি 'ওটু'র কথা সর্বদা স্মরণ রাখব। যখনই নিজের কথা ভাবব তখনই তোমার কথা মনে করব। যখনই লোকে আমাকে নাম ধরে ডাকবে, তোমার কথা আমার মনে পড়বে। ওই তারা আর আকাশের পারেও তুমি চিরকাল আমার কাছে ওটু হয়ে থাকবে। এবার হল তো, মাস্টার?'

আমি হাসি গোপন করে বললাম, 'হয়েছে।'

পাপিতিতে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে এক ছোট্ট জাহাজে চড়ে নিজের দ্বীপ বোরাবোরাতে চলে গেল। আমি পাপিতির তীরে তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। ছয় সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর একদিন সে ফিরে এল। তাকে পেয়ে ভালো লাগল ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হলাম তাকে ফিরে আসতে দেখে। সে আমার কাছে তার স্ত্রীর কথা বলেছিল। বলেছিল যে সে তার স্ত্রীর কাছেই ফিরে যাচ্ছে। স্ত্রীর সাথেই সে তার অবশিষ্ট জীবনটা কাটাবে, দূর সমুদ্রযাত্রায় সে আর কোনোদিন বের হবে না।

'তুমি কোথায় যেতে চাও, মাস্টার?' আমাদের প্রথম আলিঙ্গনের পর সে প্রশ্ন করল। আমি কাঁধ ঝাঁকি দিলাম। প্রশ্নটা বড় শক্ত। বললাম, 'গোটা বিশ্বে, সমগ্র পৃথিবীতে, সমস্ত সাগরে, সাগরের সবগুলো দ্বীপে যাব আমি।'

'আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।' অবলীলায় বলল সে, 'আমার স্ত্রী মারা গেছে।'

আমার নিজের কোনো ভাই ছিল না। অপরের অনেক ভাই দেখেছি, কিন্তু আমার ওটুর মতো ভাই আর কার থাকতে পারে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সে নিছক ভাই-ই ছিল না, সে

ছিল আমার কাছে বাবার মতো, মা'র মতো। আমি জানি শুধু ওটুর জন্যেই আমি একটি সহজ উন্নত জীবন কাটাতে পেরেছি। অন্য কারো পরোয়া করি না, কিন্তু ওটুর সামনে আমাকে খুব সহজভাবে চলতে হত।

শুধু তারই জন্যে আমি বেপরোয়া জীবনযাপন করতে সাহস পাই নি। সে আমাকে তার আদর্শ করে রেখেছিল; তার পবিত্র অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে সে আমাকে মহান করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে অধঃপতনের তীরে দাঁড়িয়ে নরকের কলঙ্কের মাঝে ডুবে যেতে বসেছি, কিন্তু ওটুর ভাবনাই আমাকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আমাকে নিয়ে তার যে গর্ব সে গর্ব আমার মধ্যে এসে আমাকেও কেমন অহংকারী করে তুলত। যা কিছু তার সেই অহংকারকে ক্ষুণ্ন করে তেমন কিছু না করাটা শেষ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অমোঘ নীতিতে পরিণত হল।

কিন্তু স্বভাবতই আমার প্রতি তার সঠিক মনোভাব আমি সরাসরি বুঝে উঠতে পারলাম না। সে আমার কোনো কাজেরই সমালোচনা করত না। আমাকে কোনো কিছুতেই বাধা দিত না। ক্রমে তার চোখে আমি যেন একটা পবিত্র সম্মানীয় কিছু হয়ে উঠলাম। আমার সকল কাজে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ না রাখলে তার মনে যে আঘাত লাগে ধীরে ধীরে তা বুঝতে পারলাম।

সতের বছর আমরা একসঙ্গে থেকেছি। ওটু এই সতের বছর আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমি ঘুমোলে সে জেগে জেগে আমাকে পাহারা দিয়েছে। অসুস্থ কিংবা আহত হলে সে আমার সেবা করেছে। আমার জন্যে লড়াই করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছে। এক সঙ্গে আমরা হাওয়াই থেকে সিডনি হেড, টেরেস স্ট্রেইট থেকে গ্যালাপাগোস—গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটা ঘুরেছি। নিউ হেব্রিডস এবং লাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে একেবারে পশ্চিমে যাত্রা করে লুইসিয়াডস, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড, নিউ হ্যানোভার পর্যন্ত ব্ল্যাকবার্ডে যোগ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। গিলবার্টস, সান্তাক্রুজ এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিন তিনবার আমরা জাহাজডুবিতেও পড়েছি।

আমরা উপার্জন করেছি প্রচুর। যেখানেই আমরা মুক্তো বা ঝিনুক, নারকেলের শাঁস বা ফলের রস, সামুদ্রিক কচ্ছপ কিংবা চড়ায় আটকানো জাহাজের ভাঙা অংশের কারবারে একটি ডলার মুনাফারও আশা দেখেছি, সেখানেই আমরা নেমেছি। ব্যবসা করেছি। কেনাবেচা করে লাভবান হয়েছি।

পাপিতি থেকেই এর শুরু। যখন সে বলল আমার সাথে সেও সমুদ্রে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরবে তখন থেকেই এই কারবারের আরম্ভ। তখন পাপিতিতে একটা ক্লাব ছিল। সেখানে মুক্তোর ব্যাপারী, সাধারণ ব্যবসায়ী, জাহাজের ক্যাপ্টেন, সাউথ সি অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লোকগুলো এসে দেদার মদ খেত আর জুয়া খেলত। গভীর রাত পর্যন্ত আমিও সেই ক্লাবে থাকতাম। অবশ্য ভয় হত, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি নিরাপদে ঘরে ফিরেছি কিনা দেখতে ওটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করত।

প্রথমে ওর দিকে চেয়ে হাসতাম; পরে একটু তিরস্কারই করলাম। তারপর একদিন স্পষ্ট করে বলেই দিলাম যে তার ওসব অযথা সেবাযত্নের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আমি ক্লাব থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতাম না। সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ করেই তাকে একদিন দেখে ফেললাম। এখনো সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এখন আমি কী করতে পারি? আমি তো জানি, আমি কী করছি।

অবিবেচকের মতো আমি আরো বেশি রাত করতে লাগলাম। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির রাতে, এমনকি হাসিতামাশার হুল্লোড়ের মধ্যেও, সেই আমবনের ফাঁক দিয়ে ওটু যে আমার ওপর কড়া নজর রাখছে। সে যেন জোর করে আমার মাথায় এসে ঢুকত। যথার্থই ওটু আমাকে ভালো মানুষ করে তুলেছে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে সহজ হয়ে উঠতে পারছে না। খ্রিস্টানদের সাধারণ নৈতিকতার কোনো জ্ঞানই তার নেই। বোরাবোরার সবাই খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে ওটুই শুধু বিধর্মী। দ্বীপের

অধিবাসীদের মধ্যে সে-ই একমাত্র অবিশ্বাসী। ঘোর বস্তুবাদী মানুষ সে। বিশ্বাস করে তার মৃত্যুর পরে সবই শেষ হয়ে যাবে। ন্যায্য ব্যবহার ও সমমর্যাদাবোধের প্রতি সে চরম আস্থাশীল। তার মতে সংকীর্ণতা, হীনম্মন্যতা নরহত্যার মতো ঘোরতর অপরাধ। আমার ধারণা অধঃপতিত মানুষের চেয়ে একজন হত্যাকারীকেই সে বেশি সমীহ করত।

আমার কথাই বলি। জীবনের জন্যে ক্ষতিকারক কোনো কাজ করতে সে আমাকে বার বার নিষেধ করেছে। জুয়া খেলায় সে অবশ্যি কোনো দোষ দেখত না কারণ সে নিজেই একজন পাকা জুয়াড়ি।

'কিন্তু রাত জাগা তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।' সে আমাকে বুঝিয়ে বলত, 'আমি দেখেছি অনেক লোক নিজের শরীরের যত্ন না নেওয়ায় জ্বরে ভুগে মরেছে।'

সে নিজেও একেবারে মাদকতাবর্জিত ছিল না। স্যাঁতস্যাঁতে নৌকায় কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে সেও কড়া মাত্রার টিপ টিপ চড়াত। মদেও তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে নয়। সে দেখেছে সারাজীবন অপর্যাপ্ত স্কচ হুইস্কি টেনে টেনেই কতজন মারা গেছে, একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেছে কেউ কেউ।

ওটু সব সময়েই মনে মনে আমার কল্যাণ কামনা করত। সব সময় আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করত। আমার প্রতি পরিকল্পনাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত এবং তাতে আমার চেয়েও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত। আমার কাজে তার এই অসীম, আগ্রহের অর্থ আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না, তখন সে গণকের মতো আমার কাজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা বলে দিত। পাপিতিতে একবার ঘটেছিল এরকম। আমি আমারই দেশের এক প্রবঞ্চক ব্যবসায়ীর অংশীদার হয়ে গুয়ানা যাত্রার বন্দোবস্ত করেছিলাম। আগে জানা ছিল না যে লোকটা একটা উঁচুদরের প্রবঞ্চক। পাপিতির কোনো শ্বেতাঙ্গও সঠিক জানত না। ওটুও প্রথম জানত না, কিন্তু যখন দেখল আমি ধীরে ধীরে সেই ঠগটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি তখন সে আমার কিছু বলার অপেক্ষা না করেই তার খপ্পর থেকে আমাকে সরিয়ে এনেছিল। সমুদ্রের দূর কিনার থেকে নেটিভ নাবিকের দল তাহিতির বন্দর এসে হাজির হত, সন্দিগ্ধ ওটু তাদের মধ্যে গিয়ে সবরকম খোঁজখবর সংগ্রহ করে নিজের মনের সন্দেহকে নিশ্চিত করে ফেলত। সেই র‍্যান্‌ডলফ্ সাগরের কাহিনীটা সত্যিই চমকপ্রদ! ওটু যখন গল্পটা আমাকে প্রথম শোনাল আমার তো বিশ্বাসই হল না। তারপর আমি যখন সেই জলপথে বাড়ি আসতে চাইলাম, ওটু কোনো কথা না বলে শুধু সম্মতি জানাল এবং প্রথম জাহাজে উঠেই অকল্যান্ড যাত্রা করল।

একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে প্রতি কাজে ওটুর নাক গলানো প্রথমে আমার বিরক্তির কারণ ছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওটু স্বার্থশূন্য লোক। প্রথমে না হলেও পরে আমাকে তার জ্ঞানবুদ্ধির মহত্ত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। আমার ব্যবসার প্রতিটি সুযোগের মুহূর্তে সে তার দৃষ্টি সজাগ রাখত—শুধু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণই নয়, সে ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশি তথ্য জেনে নিয়ে সে আমাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করত, যথার্থই আমার চেয়ে আমার স্বার্থের ব্যাপারে খেয়াল তার মনে অনেক বেশি থাকত। আমার মধ্যে ছিল যৌবনের অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। ডলার উপার্জন করার চাইতে রোমান্স করার এবং সারারাত চুল্লির পাশে আরাম করার চাইতে অ্যাডভেঞ্চারের দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি। এমন অবস্থায় আমাকে একটু দেখাশোনা করবার কেউ থাকায় ভালোই হয়েছিল। আমি জানি সেদিন আমার জীবনে যদি ওটু না আসত তাহলে আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না।

তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অনেক উদাহরণ আছে। পমোতাসে মুক্তোর কারবার করতে যাবার আগে থেকেই ব্ল্যাক বার্ডিং-এর কিছু অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমি আর ওটু তখন সামোয়ার সৈকতে। সেই সৈকতের মাটিতেই তখন আস্তানা গাড়তে হয়েছিল আমাদের। এর পরপরই একটা ব্ল্যাক বার্ড

ব্রিগেডে রিক্রুটার হবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। ওটুও আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ছয় বছর ধরে বিভিন্ন জাহাজে আমরা মেলানেশিয়ার ঘন জঙ্গলগুলো ঘুরে বেরিয়েছিলাম। দ্বীপের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ওটু সব সময় আমার নৌকার দাঁড় টানত। দ্বীপ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করার নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে জাহাজের রিক্রুটারকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হত। জাহাজটা তীরের কয়েকশো ফুট দূরে জলের ওপর দাঁড় প্রস্তুত রেখে ভেসে থাকত।

সেই অবস্থায় একদিন হাল খোলা রেখেই কারবারের মালপত্র নিয়ে আমি নৌকা থেকে নেমে পড়তেই, ওটু তখন দাঁড় টানার জায়গা ছেড়ে পেছন দিকটার পাটাতনের কাছে গিয়ে বসল। সেখানে ক্যানভাসের আবরণের নিচে একটা উইঞ্চেস্টার রাইফেল হাতের কাছে প্রস্তুত। নৌকার মাল্লাটাও সশস্ত্র। তার কাছে ক্যানভাসের নিচে বন্দুকের মতোই স্নিডার লুকানো ছিল। দ্বীপের সেই কোঁকড়ান চুলঅলা অসভ্যদের যখন আমি কুইন্সল্যান্ডের চাষের কাজে যাবার জন্য তর্ক করে করে বোঝাচ্ছিলাম, ওটু তখন কড়া পাহারা রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে চাপা কণ্ঠে ডেকে ওই অসভ্যদের সন্দিগ্ধ আচরণ আর নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। কখনো কখনো রাইফেলের ক্ষিপ্র আওয়াজ করে সে আমাকে সতর্ক করে দিত—সেটাই পয়লা হুঁশিয়ারি। অসভ্যদের আক্রমণের ভয়ে যখন নৌকার দিকে ছুটে যেতাম ওটু তার দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে রাখত আমাকে নৌকাতে তুলে নেবার জন্য। আমার মনে আছে, একবার, সান্টানায় নৌকো থেকে কেবল তীরে নেমেছি অমনি অসভ্যরা আমাদের আক্রমণ করল। আমাদের সাহায্য করতে জাহাজটা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ওটা এসে পৌঁছবার আগেই অসভ্যরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ওটু একলাফে তীরে নেমে আমাদের কারবারের সব মাল বের করে দুহাতে ছড়াতে লাগল—সেই তামাকের পাতা, চকচকে পাথরের মালা, লোহার বড় বড় কুঠার, সুন্দর বাঁটঅলা চাকু, নকশা করা কাপড়—সব।

অসভ্যরা ওগুলো দেখে পাগল হয়ে গেল। লুটপাট শুরু করে দিল। আর সেই সুযোগে আমরা

নৌকায় উঠে নির্বিঘ্নে চল্লিশ ফুট দূরে সরে গেলাম। এতে লাভ হয়েছিল বেশ। পরবর্তী চার ঘণ্টার মধ্যে আমি সেখান থেকেই তিরিশ জন শ্রমিক সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

যে ঘটনাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা ঘটেছিল মালাইতায়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চলে মালাইতার অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি অসভ্য। কিন্তু নেটিভদের দেখে যে রকম বন্ধুভাবাপন্ন মনে হল তাতে আমরা কী করে বুঝব যে একটা শ্বেতাঙ্গের মাথা কেনার জন্যে ওরা দুই বছর ধরে চাঁদা তুলে টাকা জমাচ্ছে? এখানকার সব ভিক্ষুকই মাথা শিকার করে বেড়ায়। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গের মাথা পেলে তো কথাই নেই; যে মাথাটা আনতে পারবে চাঁদার সব টাকা সে-ই পাবে। আমি আগেই বলেছি ওদের দেখলে এমনিতে বেশ বন্ধু বলে মনে হত। সেদিন আমি তীরে নৌকা রেখে প্রায় একশো গজ দূরে ওদের দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওটু আমাকে প্রথমেই সাবধান করেছিল। তখন তার কথায় কান না দিয়ে পরে অনুতাপ করেছি।

মনে আছে, হঠাৎ একটা জলাভূমির ঝোপের ভিতর থেকে বৃষ্টির মতো বর্শার ঝাঁক ছুটে এল আমার দিকে। অন্তত ডজনখানেক আমার গায়ে এসে বিঁধল। আমি ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু একটা বর্শা আমার গোড়ালিতে এসে বিঁধতেই আমি পড়ে গেলাম। অসভ্যগুলো প্রকাণ্ড সব কুঠার হাতে আমার মাথা কাটার জন্যে ছুটে আসতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ মানুষের মাথা কেটে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। সেই বিভ্রান্তির মধ্যে বালুর ওপরে একবার এদিক একবার ওদিক পড়ে গিয়ে কোনোমতে কুঠারের কোপ থেকে নিজেকে কয়েকবার রক্ষা করলাম।

ওটু সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত। শায়েস্তা করতে সে জানে। কেমন করে যেন ওটু একটা ডাণ্ডা যোগাড় করেছিল। শত্রুর একেবারে কাছ থেকে যুদ্ধ করতে রাইফেলের চেয়েও ডাণ্ডা বেশি কাজে আসে। সে বুদ্ধি করে ওদের দলের ভিতর ঢুকে গেল যাতে ওরা বর্শা ছুঁড়তে না পারে। কুঠারগুলোও আর কোনো কাজে এল না। ওটু আমার জন্যেই যুদ্ধ করছিল। সত্যিই ওটু অসভ্যদের ওপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্যভাবে সে লাঠিটা চালাতে লাগল। বাড়ি লেগে ওদের মাথাগুলো পাকা কমলালেবুর মতো ফেটে যেতে লাগল। তারপর অসভ্যগুলোকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে তার হাতের ওপর তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। তখনই প্রথম আঘাত এসে লাগল তার গায়ে। যখন এসে নৌকাতে উঠল তখন দেখলাম ওটুর গায়ে চারটে বর্শা লেগেছে। উইনচেস্টার রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে আর এক-একটি গুলিতে এক-একটি করে অসভ্যের প্রাণ শেষ করতে লাগল। তারপর আমরা জাহাজে এসে উঠলাম এবং ডাক্তার ডাকা হল।

সতের বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এই দীর্ঘকাল ধরে আসলে সে-ই আমাকে গড়ে তুলেছে। সে না থাকলে এতদিনে আমি বড়োজোর একজন মালবাবু অথবা রিক্রুটার হতাম কিংবা এক টুকরো স্মৃতি হয়ে থাকতাম শুধু।

'টাকা সব খরচ করে ফেলছ। তারপর আবার বেরিয়েছ; আরো টাকা পাচ্ছ।' সে একদিন বলছিল, 'টাকার উপায় করা এখন সোজা। কিন্তু তুমি যখন বুড়ো হবে তখন তোমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। তুমি তখন আর বাইরেও বের হতে পারবে না, আর টাকাও উপার্জন করতে পারবে না। আমি জানি মাস্টার। তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের জীবনযাত্রাপ্রণালী আমার সব জানা আছে। ঐ যে দেখ সৈকতে কত বুড়ো; এককালে তারাও যুবক ছিল। তোমার মতো তারাও একদিন প্রচুর টাকা কামিয়েছে। কিন্তু আজ তারা বুড়ো হয়ে গেছে, আজ তারা নিঃস্ব। তোমাদের মতো যুবকের পথ চেয়ে বসে থাকে ওরা—তীরে এলে তোমাদের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মদ কিনে খাবে।

'ওই যে কালো ছেলেটা, ওতো একটা ক্রীতদাস। চাষের কাজ করানোর জন্যে ওকে ওরা ধরে এনেছে। কঠোর পরিশ্রম করে! অথচ বছরে মাত্র বিশ ডলার পায়। ওভারসিয়ার সাহেবটা তো কোনো

কাজই করে না। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে শুধু ছেলেটার কাজ তদারক করে। আর তারই জন্যে সে পায় বছরে বারোশো ডলার। আমি জাহাজের একজন নাবিক। আমি পাই মাসে পনেরো ডলার। তাও পাই কারণ আমি একজন ভালো নাবিক এবং খুব পরিশ্রম করি তাই। ক্যাপ্টেনের মাথার ওপরে জোড়া চাঁদোয়া! বড় বড় বোতল থেকে সে বিয়ার খায়। কোনোদিন তাকে আমি একটা দাঁড় ধরতে বা একটা রশি টানতে দেখি নি। তাও সে পায় মাসে দেড়শো ডলার। আমি একজন সামান্য নাবিক আর সে জাহাজের ক্যাপ্টেন! মাস্টার, তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পারলে খুব ভালো করতে।'

ওটু আমাকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। প্রথম জাহাজে সে আমার দ্বিতীয় মেট হয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং সেই সময় আমি তার ওপরে কোনো আদেশ জারি করলে সে তাতে আমার চেয়েও বেশি গর্বিত হত।

ওটু বলে চলল, 'ক্যাপ্টেন বেশি মাইনে পেলেও জাহাজটা কিন্তু তারই দায়িত্বে থাকে। এক মুহূর্তও সে তার দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি পায় না। জাহাজের মালিকই বেশি টাকা আয় করে। মালিক তার চাকরবাকর নিয়ে তীরে বসে থাকে আর টাকা বাড়িয়ে চলে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা জাহাজ কিনতে অন্তত পাঁচ হাজার ডলারের দরকার। তাও আবার পুরনো জাহাজই কিনতে হবে ও টাকায়।' আমি বাধা দিয়ে বললাম। 'পাঁচ হাজার ডলার সঞ্চয় করার আগেই তো আমি বুড়ো হয়ে যাব।'

'শ্বেতাঙ্গদের টাকা উপার্জন করার তো সহজ পথই আছে।' তীরের কাছেই নারকেল গাছে ঘেরা সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ওটু।

সে সময়টা আমরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। গুয়াডেল ক্যানালের পূর্বতীর ধরে শ্বেত বাদামের পশরা সংগ্রহ করছি।

'নদীর এ মুখ থেকে আরেক মুখের দূরত্ব দুমাইল।' ওটু বলতে লাগল, 'ঐ সমতল ভূমিটা পেছনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন আর এক আধলাও দাম নেই। কিন্তু কে জানে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর লোকে ঐ জায়গাটুকুই অনেক দামে কিনবে। নোঙর ফেলতে খুব সুবিধে এখানে। বড় বড় জাহাজ একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে পারে। তুমি মাত্র দশ হাজার আঁটি তামাকের পাতা, দশ বোতল মদ আর আন্দাজ একশো ডলার দামের একটা স্লিডার দিয়ে বুড়ো সর্দারের কাছ থেকে চার মাইল বিস্তৃত এই জমিটা কিনে নিতে পার। তারপর কমিশনারকে বলে দলিল ঠিক করে নিয়ে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর চড়া দামে জায়গাটা বিক্রি করে দিয়ে একটা জাহাজের মালিক হয়ে যেতে পার।'

আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। সে যা বলেছিল তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। তবে দুবছরে নয়, তিন বছর লেগেছিল। তারপর এল গুয়াডাল ক্যানালের তৃণভূমি কেনার পালা। সামান্য টাকায় সরকারের কাছে থেকে নশো নিরানব্বই বছরের জন্যে বিশ হাজার একর জমি ইজারা পেলাম। আমি সর্বমোট নব্বই দিন সে ইজারা ভোগ করেছি। তারপর এক কোম্পানির কাছে অর্ধেক লাভে বিক্রি করে দিয়েছি। এসব কাজে ওটু ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সুযোগ গ্রহণ করত। তার জন্যেই মাত্র একশ পাউন্ডে ডনকাস্টারের নিলাম ধরে সমস্ত খরচা বাদে তিন হাজার পাউন্ড লাভ পেয়েছিলাম। সাভাইয়ের আবাদ এবং উপলুর কোকোর কারবারের দিকে সে-ই আমাকে চালিত করেছিল।

আগের মতো আমরা আর অত সমুদ্রযাত্রায় বেরুতাম না। আমি তো অনেকদিন সংসারী হয়ে গেছি। বিয়ে করেছি। আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু ওটু? আগের সেই ওটুই রয়ে গেছে! তেমনি মন্থর গতিতে বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করে। অফিসে যায়। মুখে সেই কাঠের পাইপ। গায়ে এক শিলিং-এর একটা শার্ট চার শিলিং-এর 'লাভা লাভা' কোমরের সঙ্গে জড়ানো। আমি তাকে

দিয়ে টাকা খরচ করাতে পারতাম না। তার কাছে আমার ঋণ একমাত্র অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দিয়ে পরিশোধ করবার উপায় ছিল না। ঈশ্বর জানেন, সে ভালোবাসা আমরা সকলেই পুরোপুরি দিয়েছিলাম তাকে। আমার ছেলেমেয়েরা তাকে পুজো করত!

ছেলেমেয়েগুলোকে তো সে-ই প্রথম বাস্তব পৃথিবীর পথে পা ফেলতে শেখাল। প্রথম হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে সব শিক্ষাই তো তারা পেল ওটুর কাছে। ওদের অসুখ হলে সে পাশে বসে থেকে সেবা করত। এক এক করে ওরা যখন একটু বড় হল তখন ওটু ওদের নিয়ে চলল ঐ লেগুনের পারে। ওদের জলে নামতে শিখিয়ে রীতিমতো উভচর করে তুলল। মাছের জীবনযাত্রাপ্রণালী আর মাছ ধরার কায়দাগুলো সে এমন করে ওদের শেখাল যে আমি কোনোদিনই ওসব জানতাম না। জঙ্গলেও একই ব্যাপার। সাত বছরের টম বনবিদ্যায় এমন পণ্ডিত হয়ে উঠবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ছ'বছরের মেরি অকাতরে সেই খাড়া পাহাড়টার মাথায় উঠতে শিখল। আমি দেখেছি বলিষ্ঠ লোকেরাও সেই পাহাড়ে উঠতে হাজার বার দম নিত। আর ছোট্ট ফ্রাঙ্কটা যখন ছ'বছরে পড়ল, আঠার ফুট জলের নিচে থেকে পয়সা কুড়িয়ে আনতে তার কোনোই কষ্ট হত না।

'বোরাবোরায় আমার স্বজনরা সবাই খ্রিস্টান। তারা আমার মতো বিধর্মীকে দেখতে পারে না। আমিও বোরাবোরার খ্রিস্টানদের দেখতে পারি না।' একদিন আমার অনেক কথার উত্তরে সে এগুলো বলল। আমি চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে কিছু টাকা খরচ করাতে। টাকাগুলো তো তারই। বলেছিলাম, আমাদেরই একটা জাহাজে করে সে একবার তার নিজের দ্বীপ থেকে ঘুরে আসুক। চেয়েছিলাম, ওর জন্যে একটা বিশেষ সমুদ্রযাত্রা হোক এবং অমিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা নজির হয়ে থাকুক।

জাহাজগুলো সে সময় আইনত আমার একার নামে থাকলেও আমি 'আমাদের জাহাজ' কথাটাই বলতাম। কী প্রচেষ্টাই না করেছি তাকে অংশীদার করার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওটু বলল, 'পেটি জেন' ডোবার পর থেকেই তো আমরা অংশীদার হয়ে গেছি। এর পরেও যদি তোমার মন চায় তাহলে ঠিক আছে, আইনসঙ্গতভাবেই আমি তোমার অংশীদার হব। দেখ, আমার কোনো কাজ নেই অথচ কত খরচ। মদ, পাইপ, খাওয়াদাওয়া এগুলোতে অনেক টাকা খরচ হয়। মাছ ধরা তো বড়লোকদের রীতিমতো শখের ব্যাপার। বড়শি আর সুতোর কী দাম! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমাদের আইনসঙ্গতভাবেই অংশীদার হতে হবে। আমার যখন টাকা লাগবে, অফিসের হেড ক্লার্কের কাছ থেকে তা নেব।'

কাগজপত্র সব পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এক বছর পরেই আমি অভিযোগ করতে বাধ্য হলাম। 'চার্লি, তুমি একটা পাজি ভণ্ড। এক নম্বরের কৃপণ।' আমি বললাম 'দেখ, আমার অংশীদার হিসেবে এবছর তোমার লভ্যাংশ হয়েছে কয়েক হাজার ডলার। এই দেখ হেডক্লার্ক আমার কাছে হিসেব পাঠিয়েছে। এতে লেখা আছে যে তুমি সারা বছরে কোম্পানির কাছ থেকে মাত্র সাতাশি ডলার বিশ সেন্ট নিয়েছ।'

'আরো পাব নাকি?' সে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

'আরে বললাম তো, হাজার ডলার।'

আমার কথা শুনে যেন মুক্তির আশ্বাসে মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তাহলে ভালোই হল। দেখছ তো, হেডক্লার্ক আমাদের কী কড়া হিসাবে রাখে। যখন আমার লাগবে তখন টাকা চাইবই। একটি সেন্ট হারালেও চলবে না। আর যদি হারায়, হেডক্লার্কের মাইনে থেকে আদায় করব।' মাঝখানে একটু দম নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই শেষের কথাটুকু সে বলল।

পরে জানতে পারলাম ওটু আমার নামে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আমেরিকান কনসালের

দায়িত্বে নিরাপদে রেখে দিয়েছে। ক্যাথুরাসদের দিয়ে সে নিজে উইল লিখিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এবার সমাপ্তি ঘনিয়ে এল। সমস্ত মানবসম্পর্কের ক্ষেত্রেই একদিন সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। সেই সলোমন দ্বীপপুঞ্জে, যৌবনের দুর্বল দিনগুলোতে যেখানে বেপরোয়া সব কাজকর্ম করেছি, সেখানে আর একবার আমরা এলাম অবসর কাটাতে। অবশ্য সুযোগ করে নিয়ে ফ্লোরিডা দ্বীপে আমাদের জমিটা আর বলীগিরিবর্তে মুক্তো পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখবার ইচ্ছাও ছিল। কিউরিয়ো সংগ্রহের আশায় আমরা সাভুতে অবস্থান করছিলাম।

সাভু হাঙরের লীলাক্ষেত্র। সংলগ্ন জলরাশির বিস্তারে তারা কেলি করে বেড়ায়। মৃতদেহের সৎকার করতে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অসভ্যরা সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এত বড় প্রলোভনও ওদের লীলাক্ষেত্র ছেড়ে আসতে উৎসাহিত করে না। আমার ভাগ্যই বলতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই ছোট্ট একটা দেশি ডিঙায় করে আসছিলাম। ডিঙাটা উল্টে গেল। আমি ছাড়াও তাতে বার জন কোঁকড়া চুলঅলা নেটিভ ছিল। আমরা ডিঙাটা ধরে ঝুলছিলাম। জাহাজটা তখনো একশো গজ দূরে। একটা নৌকা পাঠানোর জন্যে ডাকাডাকি শুরু করলাম আর তখনই একটা নেটিভ আর্তনাদ করে উঠল। ডিঙার যে প্রান্তটা সে আঁকড়ে ধরেছে সে দিকটা সমেত কী যেন তাকে বার বার নিচের দিকে টানছে। তার হাতটা অবশ হয়ে গেল। সে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি হাঙর তাকে নিয়ে গেছে।

বাকি তিনজন নেটিভ জলের মধ্যে থেকে ডিঙার তলার ওপরে উঠে আসতে চাইল। আমি চেঁচিয়ে নিষেধ করলাম, গাল দিলাম, সবচেয়ে কাছে যে ছিল তাকে একটা ঘুষিও বসিয়ে দিলাম। কিন্তু তাই কি শোনে। তখন ওরা আতঙ্কে অন্ধ হয়ে গেছে। ডিঙাটা কোনোমতে ওদের একজনের ভার সইতে পারত। কিন্তু তিনজনের ভারে কাত হয়ে ঘুরে গেল আর ওরা জলেই ছিটকে পড়ল আবার।

আমি ডিঙাটা ছেড়ে দিয়ে জাহাজের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। ভাবলাম ইতোমধ্যেই নৌকাটা এসে আমাকে উদ্ধার করে নেবে। নেটিভদের একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। আমরা বার বার জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে হাঙর দেখতে দেখতে, নীরবে, পাশাপাশি সাঁতরাতে লাগলাম। ডিঙাটার পাশে যে লোকটা ছিল তার আর্তনাদ শুনে বুঝলাম তাকেও হাঙর পেয়েছে। জলের মধ্যে তাকিয়েছিলাম; দেখলাম একটা বিরাট হাঙর আমার নিচ দিয়ে চলে গেল। সম্পূর্ণটাই দেখলাম। পুরোপুরি ষোল ফুট লম্বা হবে হাঙরটা। আমার পাশের নেটিভটার পেট আর কোমর কামড়ে ধরল সেটা। তারপর তাকে দূরে নিয়ে চলল। যেতে যেতে হতভাগা বেচারা হাত, মাথা, কাঁধ, জলের ওপরে ছুঁড়তে ছুঁড়তে হৃদয়বিদারী চিৎকার করতে লাগল। কয়েকশো ফুট তাকে এভাবে নিয়ে গিয়ে জলের নিচে টেনে নিল হাঙরটা।

ঐটাকেই শেষ যূথভ্রষ্ট হাঙর মনে করে আমি প্রাণপণ সাঁতরাতে লাগলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটা এল। জানি না, এটাই সেই হাঙর কিনা যেটা কিছুক্ষণ আগে ঐ নেটিভদের আক্রমণ করেছিল, নাকি অন্য কোনোখান থেকে ভক্ষণ সেরে-আসা আরেকটা হাঙর। যেটাই হোক, অন্যগুলোর মতো অত ক্ষিপ্র নয় এটা। আমি আগের মতো জোরে সাঁতার কাটতে পারছি না। উদ্যমের অধিকাংশ দিয়ে হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। সে যখন আমাকে প্রথম আক্রমণ করল আমি তখন তার ওপর নজর রেখে চলেছিলাম। ভাগ্যক্রমে দুহাতে তার নাক চেপে ধরলাম। তাই তার ভারে তলিয়ে যেতে যেতেও তাকে তফাৎ রাখতে সক্ষম হলাম। পরিষ্কার দেখলাম ও ঘুরে এল এবং চারপাশে ঘুরতে লাগল। দ্বিতীয়বার একই কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেলাম। তৃতীয়বারের আক্রমণটা উভয়ের কারণেই ফসকে গেল। আমার হাত তার নাকের ওপর পড়তেই সে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তখন শিরিষ কাগজের মতো তার খরখরে চামড়ার ঘর্ষণে কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত আমার হাতের চামড়া (আমার গায়ে তখন হাতাছাড়া একটা গেঞ্জি মাত্র) একেবারে উঠে গিয়েছিল।

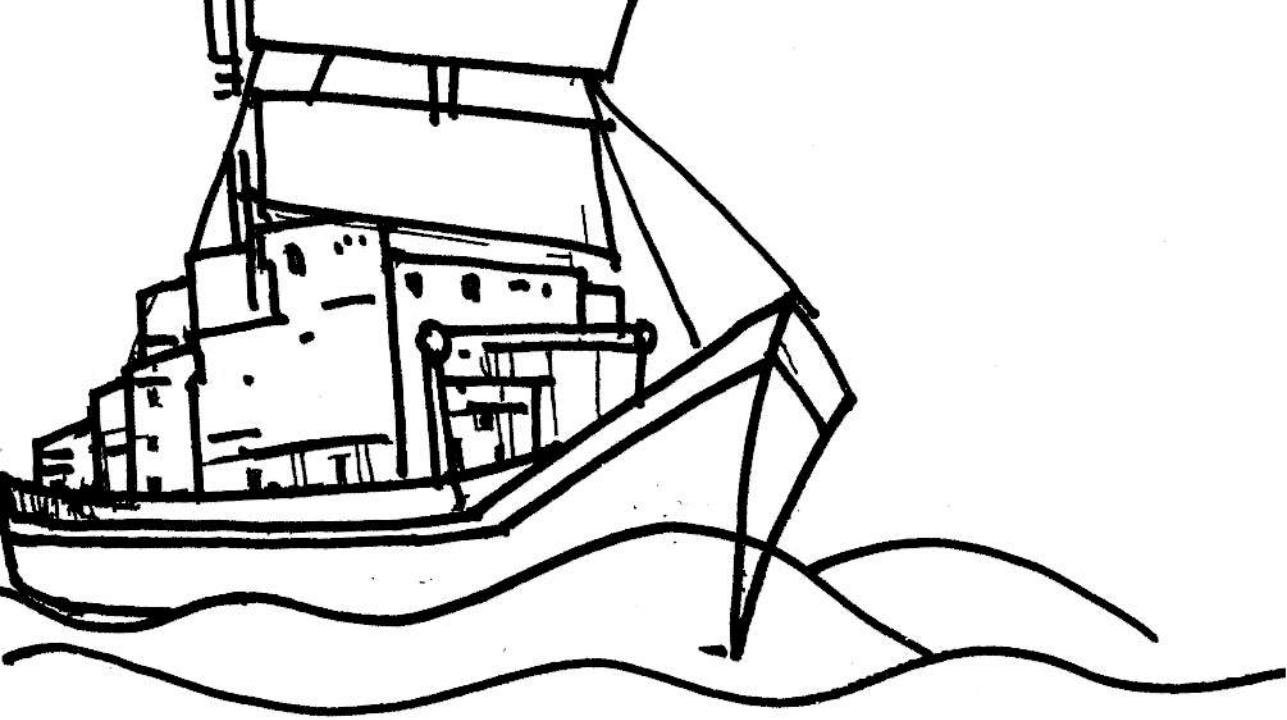

ইতোমধ্যে আমি সম্পূর্ণ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। সব আশা ছেড়ে দিলাম। জাহাজটা তখন দুশো ফুট দূরে। আমি জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে লক্ষ্য করছিলাম হাঙরটা আরেকটা আক্রমণের কৌশল আঁটছে। এমন সময় একটা পিঙ্গল বর্ণ শরীর আমাদের মাঝখানে ভেসে এল। সে আর কেউ নয়, ওটু।

'জাহাজের দিকে সাঁতরে যাও, মাস্টার।' সে এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটা একটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, 'হাঙরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ওরা আমার ভাই।'

তার কথামতো আস্তে আস্তে সাঁতরে চললাম। নিজেকে আমার আর হাঙরের মাঝখানে রেখে ওটুও সাঁতরাতে লাগল। এবং বার বার হাঙরটার আক্রমণ বিফল করে দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলল।

মিনিট খানেক পরেই ওটু আমাকে বুঝিয়ে বলল, 'ডিঙি নামানোর মাচনটা সরিয়ে নিয়ে জাহাজ থেকে ওরা দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দিচ্ছে।' তারপর সে আরেকটা আক্রমণ প্রতিহত করতে ডুব দিল।

প্রায় এসে গেছি। জাহাজটা আর মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে। কিন্তু আমি যেন আর নড়তে পারছিলাম না। ওরা জাহাজ থেকে আমাদের দিকে রশি নিক্ষেপ করছে কিন্তু প্রতিবারই তা আমার নাগালের বাইরে যাচ্ছে। ওদিকে হাঙরটা তেমন কোনো আঘাত না পেয়ে আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। বহুবার সে আমাকে ধরবার উপক্রম করল কিন্তু প্রতিবারই বিপর্যয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ওটু এসে আমাকে বাঁচাল। আত্মরক্ষার সকল সুযোগ উপেক্ষা করে ওটু আমাকেই আগলে রাখল।

'বিদায় চার্লি, আর পারলাম না।' অতিকষ্টে উচ্চারণ করলাম।

বুঝতে পারলাম আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এক্ষুণি হয়তো হাত-পা ছেড়ে তলিয়ে যাব।

কিন্তু ওটু আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'তোমাকে একটা নতুন খেলা দেখাব, হাঙরটাকে আমি বিতৃষ্ণ করে দিচ্ছি।'

সে আমার পেছন দিকে সরে গেল। হাঙরটা সেখান থেকেই আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

'আরেকটু বাঁদিকে যাও। জলের ওপরে একটা রাশি ভাসছে বাঁয়ে, মাস্টার, আরেকটু বাঁয়ে।' পরক্ষণেই সে আবার বলে উঠল।

আমি দিক পরিবর্তিত করে অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। আমার সমস্ত চেতনা তখন লুপ্তপ্রায়। দড়িটা আমার হাতে ঠেকতেই জাহাজ থেকে ওদের উল্লাস কানে এল। আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ওটুকে পেলাম না। পরক্ষণেই সে ভেসে উঠল। দুটো হাতই কব্জি থেকে কাটা। কাটা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

'ওটু! সে কোমল আন্তরিক সুরে ডাকল।

তার কম্পিত কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিক ভালোবাসা ধ্বনিত হল, তার দৃষ্টিতেও দেখলাম তারই প্রতিফলন। এখন, কেবল এখনই, আমাদের দীর্ঘ সঙ্গীজীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে সে আমাকে এ নামে ডাকল।

তার কণ্ঠে শেষবার উচ্চারিত হল, 'বিদায়, ওটু!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টানে সে নিচে তলিয়ে গেল। আমাকে টেনে তুলল ওরা জাহাজের ওপরে। ক্যাপ্টেনের হাতের ওপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

এমনিভাবে বিদায় নিল ওটু। সে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলেছিল; শেষ মুহূর্তে সে-ই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে গেল। ঝড়ের গর্ভে যাকে পেয়েছিলাম, হাঙরের গর্ভে তাকে হারালাম। নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের সতেরটি বছর আমরা একত্রে অতিবাহিত করেছি। একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন পিঙ্গলবর্ণ মানুষের মধ্যে এমন নিবিড় বন্ধুত্ব হয়তো পৃথিবীর আর কোনো দুটি মানুষের জীবনেই সম্ভব হয় নি। ঈশ্বর যদিও তাঁর উচ্চাসন থেকে জীবজগতের সামান্য কুটাটির পতনও লক্ষ্য করে থাকেন তবু তাঁর রাজ্যে বোরাবোরা দ্বীপের এই বিধর্মী ওটু বুঝি বিদায় নিল সকল লক্ষ্যের অগোচরে।

আলোকিত মানুষ চাই
বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার

গ্রামীণফোন

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841802287406